Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education as a TEXT BOOK FOR CLASS IX Vide Notification No. TB/74/IX/PS/12 and also Board's letter No. 10367/G dated 24. 11. 75

প্রাকৃতি বিজ্ঞান

[পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন]

নবম শ্রেণী

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত এম্. এস্-সি.

সিটি কলেজের পদার্থবিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক; উচ্চমাধ্যমিক 'পদার্থবিজ্ঞান', 'প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় পদার্থবিজ্ঞান', 'ত্রি-বার্ষিক পদার্থবিজ্ঞান' প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক।

ও

শ্রীসমর গুহ এম্. এস্-সি.

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপক, প্রাক্তন অধ্যাপক বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজ, জগন্নাথ কলেজ, উচ্চ মাধ্যমিক 'প্রাথমিক রসায়ন', 'নেতাজীর মত ও পথ' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা।

বুক সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড

২, রামনাথ বিশ্বাস লেন : কলিকাতা-৯

সূচীপত্র

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গোড়ার কথা

পদার্থ বিজ্ঞান

রসায়ন

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গোড়ার কথা
(COMMON TOPICS)

প্রথম পরিচ্ছেদ

মাপের একক ও পদ্ধতি
(Units and systems of measurement)

1.1. প্রাকৃতিক রাশি (Physical quantity) :

যাহার পরিমাপ সম্ভব তাহাকেই বলা হয় রাশি (quantity)। যেমন, একটি কাঠের টুকরার ওজন আছে আমরা বুঝতে পারি এবং তুলাযন্ত্র (balance) দ্বারা সেই ওজন মাপিতে পারি। কাজেই বস্তুর ওজনকে বলা যাইবে একটি রাশি। কোন ঘটনা কিছু সময় ধরিয়া ঘটিলে ঘড়ির সাহায্যে আমরা সেই সময় মাপিতে পারি। কাজেই 'সময়'-কে আমরা বলিব একটি রাশি। কোন ঘরের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতা একটি স্কেল বা ফিতা দিয়া মাপিতে পারি। সুতরাং দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতাকে আমরা বলিব রাশি। পদার্থবিজ্ঞান অধ্যয়নকালে এই রকম আরো অনেক রাশির কথা আমরা জানিতে পারি। যেমন—আয়তন, ভর গতিবেগ (velocity), ত্বরণ (acceleration), তড়িৎ-প্রবাহ ইত্যাদি। পদার্থবিজ্ঞানের অন্তর্গত এই রাশিগুলিকে প্রাকৃতিক রাশি বলা হয়।

সংজ্ঞা : পরিমাপযোগ্য যে-কোন প্রাকৃতিক বিষয়কেই **প্রাকৃতিক রাশি** বলা হয়।

1.2. মাপের একক সমূহ (Units of measurement) :

কোন একটি রাশির পরিমাপ বুঝাইতে গেলে তাহার একটি সুবিধাজনক পরিমাণকে নির্দিষ্ট মান (standard) ধরিয়া সমপ্রকার রাশির মাপ লওয়া হয়। ঐ নির্দিষ্ট মানকে মাপের **একক** (unit) বলে। যেমন, একটি ঘর 20 ফুট লম্বা বলিলে সহজেই ঘরটির দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে ধারণা হয়। এখানে দৈর্ঘ্য একটি রাশি এবং উহার পরিমাপের জন্য 'ফুট'-কে একক হিসাবে ধরা হইয়াছে।

যদি বলা যায় আমি অনেক চাউল কিনিলাম, তাহা হইলে ঠিক কতটা চাউল সে সম্বন্ধে কিছুই বোঝা যায় না। কিন্তু যদি বলি 20 কিলোগ্রাম চাউল কিনিলাম, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ চাউলের পরিমাণ বোঝা যায়। এখানে 'কিলোগ্রাম'-কে একক হিসাবে ব্যবহার করিয়া চাউলের ভর-কে (mass) বুঝানো হইল।

তেমনি, যদি বলা হয় ট্রেনটি বোম্বাই হইতে কলিকাতা পৌঁছিতে অনেক সময় লইতেছে, তাহা হইলে **সময়** সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা হইল না। সঠিক বলিলে বলিতে হইবে 30 ঘণ্টা কি 40 ঘণ্টা ইত্যাদি। অর্থাৎ সময়ের পরিমাপ করিতে একক হিসাবে এখানে ঘণ্টাকে ব্যবহার করা হইল।

এইভাবে দেখা যায়, প্রত্যেক রাশির পরিমাপের জন্য এক একটি এককের প্রয়োজন। একক বিহীন পরিমাপের কোন অর্থ নাই। তাহা হইলে প্রশ্ন উঠিবে যে, পদার্থবিজ্ঞানে ত' হাজার হাজার রাশির কথা আছে। উহাদের কি হাজার হাজার একক আছে? সৌভাগ্যক্রমে দেখা গিয়াছে যে, রাশি অসংখ্য হইলেও মাত্র তিনটি রাশির একক ঠিক করিয়া লইলে বাকী সব রাশির একক উহা হইতেই পাওয়া যাইবে। এই তিনটি রাশি হইল (1) **দৈর্ঘ্য** (2) **ভর** এবং (3) **সময়**। এই তিনটি রাশির একক পরস্পরের উপর নির্ভরশীল নহে। ইহাদের একক-কে বলা হয় '**প্রাথমিক** বা **মূল** (fundamental) **একক**। অন্যান্য রাশির একক—যাহা এক বা একাধিক মূল একক হইতে গঠন করা যায়—তাহাদের বলা হয় **লব্ধ** (derived) একক।

সংজ্ঞা: যে তিনটি রাশির একক পরস্পরের উপর নির্ভরশীল নহে এবং যে তিনটি রাশির একক হইতে অন্যান্য রাশির একক গঠন করা যায় তাহাদের মূল বা প্রাথমিক একক বলে।

এক বা একাধিক মূল একক হইতে অন্যান্য যে-সকল একক গঠন করা যায় তাহাদের লব্ধ একক বলে।

1.3. এককের বিভিন্ন পদ্ধতি (Different systems of units):

উপরোক্ত তিনটি মূল একক-কে প্রকাশ করিবার প্রধানত দুইটি পদ্ধতি আছে।

(1) **সি. জি. এস.** অথবা ফ্রেঞ্চ অথবা মেট্রিক পদ্ধতি (C. G. S. or French of Metric system):

'সি' শব্দটি বুঝাইতেছে সেন্টিমিটার→দৈর্ঘ্যের একক।
'জি' " " গ্রাম→ভরের একক।
'এস' " " সেকেণ্ড→সময়ের একক।

(2) **এফ. পি. এস্.** অথবা বৃটিশ পদ্ধতি (F.P.S. or British system):

এখানে 'এফ্' শব্দটি বুঝাইতেছে ফুট→দৈর্ঘ্যের একক।
'পি' " " পাউণ্ড→ভরের একক।
'এস্' " " সেকেণ্ড→সময়ের একক।

এই পদ্ধতি বিশেষ করিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যে ব্যবহৃত হয়।

আজকাল, এম্, কে, এস্, (M.K.S.) নামে আর একটি পদ্ধতি ব্যবহার করা হইতেছে। এই পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের একক মিটার (M), ভরের একক কিলোগ্রাম (K) এবং সময়ের একক সেকেণ্ড (S).

1.4. দৈর্ঘ্যের একক :

সেন্টিমিটার : সি, জি, এস্, পদ্ধতি অনুযায়ী দৈর্ঘ্যের একক হইল সেন্টিমিটার।

ফ্রান্সের আন্তর্জাতিক বুরো অফ ওয়েটস্ অ্যাণ্ড মেজারস-এ (International Bureau of Weights and Measures) রক্ষিত একটি প্লাটিনাম-ইরিডিয়াম দণ্ডের (যাহার তাপমাত্রা 0° সেন্টিগ্রেড) উপর দুইটি নির্দিষ্ট দাগের অন্তর্বর্তী দূরত্বকে বলা হয় এক **মিটার** (Metre)। সেন্টিমিটার হইল মিটারের একশত ভাগের একভাগ। খুব ছোট দৈর্ঘ্য বা খুব বড় দৈর্ঘ্য মাপিবার জন্য সেন্টিমিটারের ভগ্নাংশ ও গুণিতাংশ করা হইয়াছে। এখানে তাহার হিসাব দেওয়া হইল। এই ভগ্নাংশ বা গুণিতাংশ লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে ইহারা সর্বদা দশ ভাগ বা দশ গুণ। সি, জি, এস্, পদ্ধতির ইহা একটি বিশেষ সুবিধা।

10 মিলিমিটার (mm.)	= 1 সেন্টিমিটার (cm.)
10 সেন্টিমিটার	= 1 ডেসিমিটার
10 ডেসিমিটার	= 1 মিটার (m.)
10 মিটার	= 1 ডেকামিটার
10 ডেকামিটার	= 1 হেক্টোমিটার
10 হেক্টোমিটার	= 1 কিলোমিটার

ফুট : এফ্, পি, এস্ পদ্ধতি অনুযায়ী দৈর্ঘ্যের একক হইল ফুট।

লণ্ডনের বৃটিশ এক্সচেকারের (British Exchequer) অফিসে রক্ষিত একটি ব্রোঞ্জ দণ্ডের উপর (যাহার তাপমাত্রা হইল 62° ফারেনহাইট) দুইটি নির্দিষ্ট দাগের অন্তর্বর্তী দূরত্বকে বলা হয় এক গজ। এক ফুট এক গজের তিন ভাগের এক ভাগ। ছোট এবং বড় দৈর্ঘ্য মাপিবার জন্য ফুটের যে ভগ্নাংশ ও গুণিতাংশ করা হইয়াছে, তাহা এইরূপ :

1 মাইল	= 1760 গজ
1 গজ	= 3 ফুট
1 ফুট	= 12 ইঞ্চি

মনে রাখিবে,

1 ইঞ্চি = 2·54 সেন্টিমিটার

1 মিটার = 1·0936 গজ=3937 ইঞ্চি

1 কিলোমিটার = 0·612 মাইল।

1.5. আয়তনের একক :

দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা প্রত্যেকটি 1 cm. হইলে ঐ আয়তনকে সি, জি, এস্, পদ্ধতি অনুযায়ী আয়তনের একক বলা হয় [চিত্র 1]। ইহা এক ঘন সেন্টিমিটার (1 cubic centimetre বা 1 c.c.) নামে পরিচিত।

1cm.

1cm.

চিত্র 1

তেমনি দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা প্রত্যেকটি 1 ফুট হইলে ঐ আয়তনকে এফ. পি. এস্. পদ্ধতি অনুযায়ী আয়তনের একক ধরা হয়। ইহাকে বলা হয় এক ঘন ফুট (1 cubic foot অথবা 1 cu. ft.)।

আয়তনের পরিমাপ :

বহু সুষম কঠিন বস্তুর (solid figures) দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা মাপিলেই
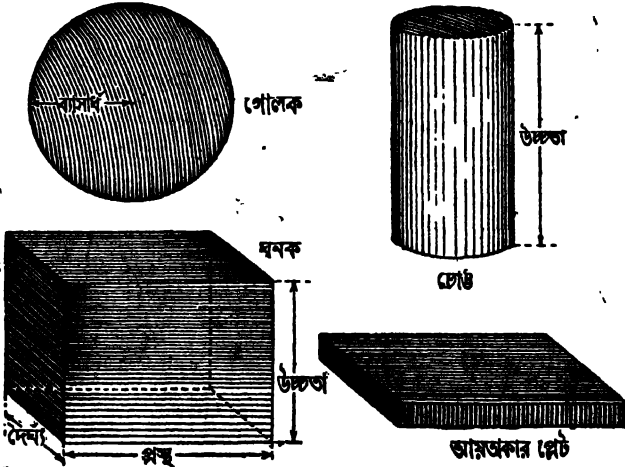
চিত্র 2

বস্তুটির আয়তন হিসাব করা যায়। এখানে (চিত্র 2) কয়েকটি সুষম আকৃতিবিশিষ্ট বস্তুর আয়তনের সূত্র দেওয়া হইল।

আয়তাকার প্লেটের আয়তন = দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা

ঘনক (cube)-এর ,, = দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা = (দৈর্ঘ্য)^3

গোলকের আয়তন = $\frac{4}{3}\pi r^3$ (r = ব্যাসার্ধ এবং π = 3·14)।

খাড়া গোলমুখ (right circular) চোঙের আয়তন = গোল প্রান্তের ক্ষেত্রফল × উচ্চতা।

উদাহরণ : একটি ধাতব গোলকের ব্যাস 6 সেন্টিমিটার হইলে, উহার আয়তন কত ?

উ। আমরা জানি, গোলকের আয়তন $=\frac{4}{3}\pi r^3$

এক্ষেত্রে $r=\frac{6}{2}=3$ cm.

কাজেই, গোলকের আয়তন $=\frac{4}{3}\times 3{\cdot}14\times(3)^3=113$ cc. (প্রায়)।

সি. জি. এস্. পদ্ধতিতে **লিটার** (litre) নামক আর একটি এককের দ্বারা আয়তন প্রকাশ করা হয়। বিশেষত, তরল পদার্থের বেলায় এই একক ব্যবহৃত হয়।

1 লিটার = 1000 ঘন সেন্টিমিটার

তেমনি, এফ. পি. এস্. পদ্ধতিতে তরলের আয়তন প্রকাশ করিবার জন্য **'গ্যালন'** (gallon) একক ব্যবহৃত হয়।

1 গ্যালন = 62°F তাপমাত্রায় 10 lb জলের আয়তন = 0·61 ঘনফুট (প্রায়)।

আবার, 1 ঘনফুট = 6·25 গ্যালন (প্রায়)।

মনে রাখিবে, 1 গ্যালন = 4·54 লিটার (প্রায়)।

তরলের আয়তন মাপিবার জন্য ঘন সেন্টিমিটার (cc.) দাগ কাটা একপ্রকার আয়তন মাপক চোঙ (measuring cylinder) ব্যবহার করা হয়। 3 (ক) নং চিত্রে এইরূপ একটি চোঙ দেখানো হইল। ঐ চোঙ দ্বারা তরলের আয়তন পরিমাপ করিবার সময় সর্বদা তরলের বাঁকানো পৃষ্ঠ (curved surface) যে পাঠ
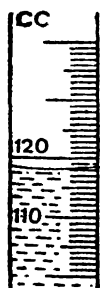
CC
120
110

চিত্র 3 (খ)

250
200
100
50

চিত্র 3 (ক)

দিবে তাহা লইতে হইবে। 3 (খ) নং চিত্রে তরলের বাঁকানো পৃষ্ঠ 118·5 c.c. দাগের সহিত মিশিয়াছে। অতএব চোঙের ভিতরকার তরলের আয়তন 118·5 c.c.

1.6. ভরের একক :

সংজ্ঞা : বস্তুর ভর বলিতে ঐ বস্তুতে কতটা পরিমাণ জড় পদার্থ (matter) আছে তাহাই বুঝায়। যেমন, একটি লোহার বলে যতখানি লোহা আছে তাহাই বলটির ভর।

গ্র্যাম : সি. জি. এস্. পদ্ধতি অনুসারে ভরের একক **গ্র্যাম**। প্যারিসে রক্ষিত প্ল্যাটিনাম-ইরিডিয়াম সংকর ধাতু নির্মিত চোঙাকৃতি একটি খণ্ডের ভরকে বলা হয় **কিলোগ্র্যাম**। গ্র্যাম কিলোগ্র্যামের হাজার ভাগের এক ভাগ।

সাধারণভাবে এক ঘন সেন্টিমিটার জলকে 4° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় রাখিলে উহার ভরকে এক গ্র্যাম ধরা হয়।

নিম্নে গ্র্যামের ভগ্নাংশ ও গুণিতাংশ দেওয়া হইল :

10 মিলিগ্র্যাম (mgm.)	=1 সেন্টিগ্র্যাম
10 সেন্টিগ্র্যাম	=1 ডেসিগ্র্যাম
10 ডেসিগ্র্যাম	=1 গ্র্যাম (gm.)
10 গ্র্যাম	=1 ডেকাগ্র্যাম
10 ডেকাগ্র্যাম	=1 হেক্টোগ্র্যাম
10 হেক্টোগ্র্যাম	=1 কিলোগ্র্যাম (kgm.)
100 কিলোগ্র্যাম	=1 কুইণ্টাল (quintal)
10 কুইণ্ট্যাল	=1 মেট্রিক টন

পাউণ্ড : এফ্. পি. এস্. পদ্ধতি অনুযায়ী ভরের একক হইল **পাউণ্ড** (lb)। ওয়েষ্টমিনষ্টারের স্ট্যাণ্ডার্ড অফিসে রক্ষিত নির্দিষ্ট একখণ্ড প্লাটিনামের ভরকে পাউণ্ড ধরা হয়। এফ্. পি, এস্ পদ্ধতিতে ভরের অন্যান্য যে-সকল একক প্রচলিত আছে তাহা নিম্নে বলা হইল :

16 ড্রাম	=1 আউন্স (oz)
16 আউন্স	=1 পাউণ্ড (lb)
28 পাউণ্ড	=1 কোয়ার্টার
4 কোয়ার্টার	=1 হন্দর (Cwt)
20 হন্দর	=1 টন।

কাজেই, 1 টন $=20\times4\times28=2240$ পাউণ্ড।

মনে রাখিবে, 1 পাউণ্ড = 453·59 গ্রাম = 0·4536 কিলোগ্রাম
1 কিলোগ্রাম = 2·204 পাউণ্ড।

1.7. পদার্থের ঘনত্ব (Density of a substance) :

ভারী বা হাল্কা বস্তু বুঝাইতে গিয়া আমরা অনেক সময় বলি "তুলার মত হাল্কা" বা "লোহার মত ভারী" ইত্যাদি। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে সমআয়তন বিভিন্ন দ্রব্যের ভর বিভিন্ন। যে বস্তুর ভর বেশী তাহা ভারী এবং যে-বস্তুর ভর কম তাহা হাল্কা।

সংজ্ঞা : কোন পদার্থের একক আয়তনে যতখানি ভর থাকে তাহাকে ঐ পদার্থের ঘনত্ব (density) বলা হয়। যদি কোন পদার্থের আয়তন হয় V এবং ভর হয় M তাহা হইলে উহার ঘনত্ব, $D = \frac{M}{V} = \frac{\text{বস্তুর ভর}}{\text{বস্তুর আয়তন}}$

ঘনত্বের একক (Units of density) :

সি. জি. এস্. একক : যদি এক ঘন সেন্টিমিটারে এক গ্রাম ভর থাকে তাহা হইলে পদার্থটির ঘনত্বকে সি. জি. এস্. পদ্ধতি অনুযায়ী ঘনত্বের একক ধরা হয় এবং উহাকে গ্রাম প্রতি ঘন সেন্টিমিটার এককে প্রকাশ করা হয়।

পরিষ্কার জলকে 4^0 সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় রাখিলে উহার ঘনত্ব সি. জি. এস্. পদ্ধতি অনুযায়ী এক একক ঘনত্বের সমান অর্থাৎ উহা 1 গ্রাম প্রতি ঘন সে. মি.।

এফ. পি. এস্. একক : যদি এক ঘনফুটে এক পাউণ্ড ভর থাকে তাহা হইলে পদার্থটির ঘনত্বকে এফ্. পি. এস্. পদ্ধতি অনুযায়ী ঘনত্বের একক ধরা হয় এবং উহাকে পাউণ্ড প্রতি ঘনফুট এককে প্রকাশ করা হয়।

এক ঘনফুটে যতখানি জল ধরে তাহার ভর হইল 62·5 পাউণ্ড। সুতরাং এফ্. পি. এস্. পদ্ধতি অনুযায়ী জলের ঘনত্ব হইল 62·5 পাউণ্ড প্রতি ঘনফুট।

একথা **মনে রাখিতে হইবে,** কোন পদার্থের সি. জি. এস্. পদ্ধতি অনুযায়ী যে-ঘনত্ব, এফ্. পি. এস্. পদ্ধতি অনুযায়ী সে-ঘনত্ব হইবে না। সুতরাং পদার্থের ঘনত্ব বলিলেই তাহার যথোপযুক্ত একক উল্লেখ করিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি বলা হয় রূপার ঘনত্ব 10·5 তাহা হইলে ঠিক বলা হইল না। বলিতে হইবে, রূপার ঘনত্ব 10·5 গ্রাম/ঘন সে. মি.।

এফ্. পি. এস্ পদ্ধতি অনুযায়ী রূপার ঘনত্ব 10·5 নয়; ইহা 10·5 × 62·5 পাউণ্ড/ঘন ফুট।

উদাহরণঃ একটি লোহার টুকরার ভর 740 গ্র্যাম এবং আয়তন 100 ঘন সে. মি.; লোহার ঘনত্ব নির্ণয় কর।

উ। এস্থলে, M=740 গ্র্যাম, V=100 ঘন সে. মি.

$$\therefore D=\frac{M}{V}=\frac{740}{100}=7{\cdot}4 \text{ গ্র্যাম/ঘন সে. মি.}$$

1.8. সময়ের একক ঃ

নিজ অক্ষের চতুর্দিকে পৃথিবীর পরিভ্রমণের জন্য আমরা সূর্যকে আকাশের পূর্ব হইতে পশ্চিম দিকে যাইতে দেখি। সূর্য কোনও স্থানের মধ্য রেখাকে (meridian) পরপর দুইবার অতিক্রম করিতে যে সময় লয় তাহাকে এক **সৌরদিন** (solar day) বলে। কয়েকটি কারণে বৎসরের সব সময় এই সৌরদিন ঠিক সমান থাকে না; একটু করিয়া পরিবর্তন করে। এক বৎসরের গড় লইলে যাহা হয় তাহাকে **গড় সৌরদিন** (mean solar day) বলা হয়। এই গড় সৌরদিনের 24 ভাগের এক ভাগকে বলা হয় এক ঘণ্টা। এক ঘণ্টার 60 ভাগের এক ভাগকে বলা হয় এক মিনিট এবং মিনিটের 60 ভাগের এক ভাগকে এক সেকেণ্ড। অর্থাৎ, 24 ঘণ্টা=1 গড় সৌরদিন; 60 মিনিট=1 ঘণ্টা; 60 সেকেণ্ড=1 মিনিট। অথবা, 1 সেকেণ্ড $=\frac{1}{24\times60\times60}=\frac{1}{86400}$ গড় সৌরদিন

সংজ্ঞা ঃ এফ্. পি. এস্. ও সি. জি. এস্. উভয় পদ্ধতিতে সময়ের একক গড় সৌর সেকেণ্ড (mean solar second) বা সংক্ষেপে '**সেকেণ্ড**' এবং ইহা গড় সৌরদিনের $\frac{1}{86400}$ অংশ।

1.9. মেট্রিক বা দশমিক (Decimal) পদ্ধতির সুবিধা :

সি. জি. এস্. বা মেট্রিক পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্য বা ভরের একক লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবে, যে-কোন একক তাহার পরবর্তী নিম্ন এককের দশগুণ বা তাহার অগ্রবর্তী উচ্চ এককের দশ ভাগের এক ভাগ। এই কারণে মেট্রিক পদ্ধতিকে **দশমিক** পদ্ধতিও বলা হয়। এই পদ্ধতির একটি মস্ত সুবিধা এই যে এক একক হইতে অন্য এককে যাইতে হইলে দশমিক বিন্দু সরাইলে চলিবে; গুণ বা ভাগের প্রয়োজন নাই। যেমন, 593·21 মিটার =59321 সেন্টিমিটার=0·59321 কিলোমিটার ইত্যাদি। কিন্তু এফ্. পি. এস্. পদ্ধতিতে এই সুবিধা নাই। যেমন 3 গজ=3×3=9 ফুট=9×12 =108 ইঞ্চি=$\frac{3}{1760}$ মাইল ইত্যাদি। তাছাড়া দৈর্ঘ্য, আয়তন ও ভরের

একক মেট্রিক পদ্ধতিতে সুবিধাজনকভাবে সংশ্লিষ্ট। যথা 1 ঘন সেন্টিমিটার জলের ওজন 1 গ্র্যাম। কিন্তু 1 ঘনফুট জলের ওজন 1 পাউণ্ড নয়, 62·5 পাউণ্ড।

এই সকল কারণে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র দশমিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হইতেছে। আমাদের দেশে বিগত 1957 খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস হইতে দশমিক পদ্ধতিতে মুদ্রা প্রচলিত হইয়াছে এবং 1961 খ্রীষ্টাব্দ হইতে ওজনও দশমিক পদ্ধতিতে প্রচলিত হইয়াছে।

দৈর্ঘ্য, ভর এবং সময়ের পরিমাপ

Measurement of length, mass and time)

1.10. দৈর্ঘ্যের পরিমাপ :

সাধারণত দৈর্ঘ্য মাপিবার জন্য আমরা যে যন্ত্র ব্যবহার করি উহার নাম **স্কেল** (scale)। একটি এক মিটার লম্বা পাতলা কাঠের বা ধাতব পাতের নিম্নার্ধে সেন্টিমিটার এবং সেন্টিমিটারের ভগ্নাংশ মিলিমিটারে দাগ কাটা এবং
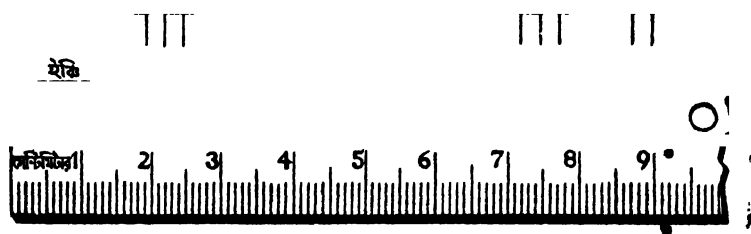
চিত্র 4

উপরার্ধে ইঞ্চি এবং ইঞ্চির দশমাংশে দাগ কাটা যন্ত্রের নাম স্কেল [চিত্র 4]। স্কেল অনেক সময় শুধু সেন্টিমিটারে ও মিলিমিটারে দাগ কাটা থাকে। তখন উহাকে বলা হয় **মিটার স্কেল**। আবার শুধু ইঞ্চি এবং ইঞ্চির দশমাংশে দাগ কাটা থাকিলে বলা হয় **ফুট-রুল**।

স্কেলের ব্যবহার ঃ ধরা হউক, AB লাইনের দৈর্ঘ্য স্কেল দিয়া মাপিতে হইবে [চিত্র 4 (ক)]। স্কেলকে এমনভাবে ধরিতে হইবে যে দাগ কাটা

পাশ AB লাইনের সহিত লম্বালম্বিভাবে মিশিয়া যায়। *A* প্রান্ত কোন একটি পূর্ণ সংখ্যার (ধরা যাউক 1 সেন্টিমিটার) সহিত মিলাইয়া অপর প্রান্তের পাঠ লইতে হইবে। মনে কর, *B* প্রান্ত 8·9 এবং 9 সে. মি-এর মাঝে কোথাও আছে। এইরূপ হইলে, *B*-প্রান্তের পাঠ লইবার সময় চোখের আন্দাজের (eye-

চিত্র 4 (ক)
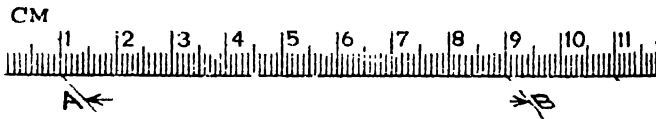
estimation) সাহায্যে 1 মিলিমিটারকে দশভাগে ভাগ করিয়া দেখিতে হইবে এবং ঐ হিসাবে *B*-প্রান্তের পাঠ লইতে হইবে। ধরা যাউক, ঐ হিসাব মত *B*-প্রান্তের পাঠ 8·99 সে. মি। তাহা হইলে,

$$AB \text{ লাইনটির দৈর্ঘ্য} = B \text{ প্রান্তের পাঠ} - A\text{-প্রান্তের পাঠ}$$
$$= 8{\cdot}99 - 1 = 7{\cdot}99 \text{ সে. মি.}$$

এইরূপ আরো কয়েকবার পাঠ লইয়া উহাদের গড় নির্ণয় করিলে *AB* লাইনের দৈর্ঘ্য পাওয়া যাইবে। ঐরূপ ইঞ্চি স্কেলের সাহায্যে পরিমাপ লইলে, *AB* লাইনের দৈর্ঘ্য ইঞ্চিতে পাওয়া যাইবে।

চিত্র 4 (খ)

পাঠ লইবার সময় যে-প্রান্তের পাঠ লওয়া হইতেছে তাহার প্রতি লম্বভাবে (vertically) দৃষ্টিপাত করিতে হইবে, নতুবা পাঠে দৃষ্টি-ভ্রম (parallax) জনিত ত্রুটি আসিতে পারে। 4 (খ) নং চিত্রে দেখা যাইতেছে যে আনতভাবে দৃষ্টিপাত করিলে ভুল পাঠ পাওয়া যাইবে; কিন্তু লম্বভাবে দৃষ্টিপাত করিলে নির্ভুল পাঠ পাওয়া যাইবে।
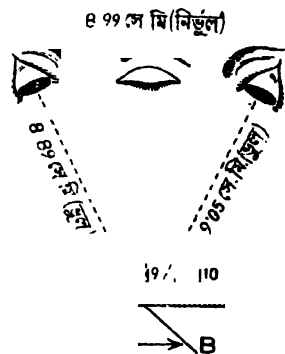
1.11. ভরের পরিমাপ :

বিভিন্ন দ্রব্যের ভর মাপিবার বিভিন্ন উপায় আছে। সাধারণত ভর মাপিবার জন্য পরীক্ষাগারে যে-যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তাহার নাম সাধারণ তুলা (common balance)। এই তুলার সাহায্যে কতকগুলি প্রমাণ বাটখারার (standard weights) সহিত তুলনামূলক ভাবে কোন দ্রব্যের ভর নির্ণয় করা হয়। হাটে-বাজারে দোকানীরা যে দাঁড়িপাল্লা ব্যবহার করে তাহা এই যন্ত্রের সরল রূপ। নিম্নে পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত তুলার প্রধান অংশের বিবরণ দেওয়া হইল [চিত্র 5 (ক)]।
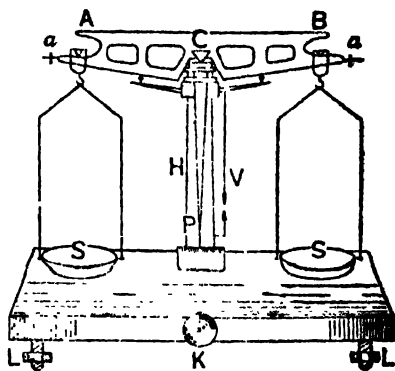
সাধারণ তুলা
চিত্র 5 (ক)

(ক) **তুলাদণ্ড** (balance beam) : ইহা একটি লম্বা দণ্ড (AB)। এই দণ্ডের ঠিক মাঝখানে একটি অ্যাগেট্ (খুব শক্ত মূল্যবান পাথর) অথবা ইস্পাত নির্মিত ক্ষুরধার (knife-edge) ত্রিভুজাকৃতি টুকরা (C) শক্তভাবে আটকানো থাকে। এই টুকরাটি একটি ছোট অ্যাগেট প্লেটের উপর রাখা থাকে এবং অ্যাগেট প্লেটটি একটি খাড়া স্তম্ভ (pillar) H এর ভিতর হইতে ঢুকানো একটি দণ্ডের (rod) উপর সংযুক্ত। K-চাবি ঘুরাইলে দণ্ডটি উপরে বা নীচে নামিতে পারে। উপরে উঠাইলে C-এর উপর রক্ষিত তুলাদণ্ড C-এর ক্ষুরধারের উপর দোল খাইবে এবং নীচে নামাইয়া রাখিলে তুলাদণ্ড স্থির থাকিবে। C-এর ঐ ধার-কে বলা হয় আলম্ব (fulcrum)।

(খ) **সূচক** (pointer) : ইহা একটি সরু কাঁটা (P) তুলাদণ্ডের ঠিক মাঝখানে লম্বভাবে আবদ্ধ। যখন তুলাদণ্ড দোল খায় তখন সূচকও দুলিতে থাকে এবং সূচকের সূচালো প্রান্ত (pointed end) স্কেলের গা ঘেঁষিয়া চলাচল করে। তুলাদণ্ড স্থির থাকিলে সূচকের সূচালো প্রান্ত স্কেলের 0-দাগের সহিত মিশিয়া থাকে।

(গ) **তুলাপাত্র** (Scale pan) : S এবং S দুইটি সমান ওজনের পাত্র দণ্ডের A এবং B প্রান্ত হইতে দুইটি ষ্টিরাপ (stirrup) দ্বারা ঝুলানো থাকে। বাম পাশের পাত্রে পরিমেয় দ্রব্য রাখিয়া ডানদিকের পাত্রে প্রমাণ বাটখারা রাখিতে হয়।

(ঘ) **স্ক্রু-ওজন** (Screw-weight) : দণ্ডের A এবং B প্রান্তে দুইটি স্ক্রু (a,a) লাগানো আছে। তুলাপাত্র খালি থাকিলে তুলাদণ্ড যদি অনুভূমিক না থাকে তাহা হইলে ঐ স্ক্রু দুইটি ঘুরাইয়া তুলাদণ্ড অনুভূমিক করিতে হয়।

(ঙ) **ওলন দড়ি** (Plumb line) : প্রত্যেক তুলার সহিত একটি ওলন দড়ি (V) থাকে। ইহার সাহায্যে স্তম্ভ H ঠিক খাড়া আছে কি-না বোঝা যায়।

(চ) **ওজনের বাক্স** (Weight box) : যদিও বাক্সটি তুলার সংলগ্ন কোন অংশ নয়, তথাপি তুলার সাহায্যে ভর মাপিতে এই বাক্সের প্রয়োজন। 5(খ) নং চিত্রে এই বাক্সের ছবি দেখানো হইল। এই বাক্সের বিভিন্ন খাপে বিভিন্ন ওজনের প্রমাণ বাটখারা সাজানো থাকে। যেমন 100 গ্র্যাম, 50 গ্র্যাম 100 মিলিগ্র্যাম, 20 মিলিগ্র্যাম ইত্যাদি। খাপ হইতে বাটখারা তুলিয়া তুলা-পাত্রে রাখিবার জন্য একটি চিমটা (forceps) বাক্সের সহিত দেওয়া থাকে।

কোন দ্রব্যের ভর মাপিবার সময় তুলাযন্ত্র হাওয়া দ্বারা যাহাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয় তাহার জন্য যন্ত্রকে একটি কাচের বাক্সের মধ্যে রাখা হয়।
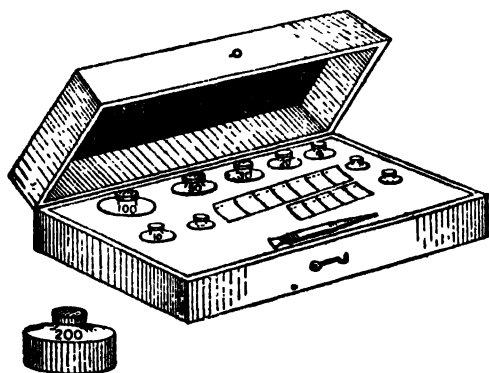
চিত্র 5 (খ)

সাধারণভাবে তুলার ব্যবহার : তুলার যদি কোন রকম ত্রুটি না থাকে তবে সাধারণভাবে বস্তুর ভর মাপিবার জন্য নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করা হয়। প্রথমে পাটাতনের তলায় স্ক্রু (L,L) ঘুরাইয়া পাটাতনকে অনুভূমিক করিতে হইবে। তখন ওলন-দড়ি ঠিক খাড়াভাবে

ঝুলিতে থাকিবে। এই অবস্থায় K চাবি ঘুরাইয়া AB দণ্ডকে একটু উর্ধ্বে তুলিলে সূচক C-দণ্ডের উভয় পার্শ্বে সমানভাবে দুলিবে। যদি সমানভাবে না দোলে তবে স্ক্রু-ওজন (a, a) ঘুরাইয়া উহা সম্পন্ন করিতে হইবে। অতঃপর পরিমেয় বস্তুকে বাম তুলাপাত্রে রাখিয়া ডান তুলাপাত্রে ওজনের বাক্স হইতে আন্দাজমত একটি একটি করিয়া বাটখারা রাখ এবং দেখ যে কখন সূচক C-দাগের উভয় দিকে সমানভাবে দোলে। ঐ অবস্থায় ডান তুলাপাত্রে রক্ষিত বাটখারার মোট ভর দ্রব্যটির ভরের সমান।

ভাল তুলার আবশ্যকীয় গুণ (Requisites of a good balance) : নিম্নলিখিত গুণগুলি থাকিলে তুলাকে ভাল বলা হইবে।

(1) তুলা **সুবেদী** (sensitive) হওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ দুই তুলাপাত্রে রক্ষিত দুই বস্তুর ভরের সামান্য তফাৎ থাকিলে দণ্ড কাত হইয়া যাইবে—অনুভূমিক থাকিবে না।

(2) তুলা **নির্ভুল** (true) হওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ ঠিক সমান ভরের দুই বস্তু দুই তুলাপাত্রে রাখিলে অথবা দুই তুলাপাত্র খালি থাকিলে তুলাদণ্ড অনুভূমিক হইবে।

(3) তুলা **প্রতিষ্ঠ** (stable) হওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ সূচক একবার আন্দোলিত হইলে পুনরায় সাম্য অবস্থানে শীঘ্র ফিরিয়া আসিবে—দীর্ঘ সময় ধরিয়া আন্দোলিত হইবে না।

(4) তুলা **দৃঢ়** (rigid) হওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ তুলার বিভিন্ন অংশগুলি মজবুত হইবে।

1.12. সময়ের পরিমাপ :

কোন ঘটনা যদি একটি নির্দিষ্ট অবকাশ (interval) অন্তর ঘটে তবে তাহার দ্বারা সময়ের পরিমাপ করা চলে। দোলক ঘড়ি আবিষ্কারের পূর্বে সময় পরিমাপের জন্য বালু-ঘড়ি, জল-ঘড়ি, সূর্য-ঘড়ি প্রভৃতি ব্যবহার করা হইত। 6 নং চিত্রে প্রাচীনকালে ব্যবহৃত একটি বালু-ঘড়ির ছবি দেখানো হইয়াছে।

এই ঘড়িতে দুইটি সমান আকারের প্রকোষ্ঠ আছে। একটি সরু নালীপথ দ্বারা প্রকোষ্ঠ দুইটি সংযুক্ত। ঘড়িতে কিছু শুষ্ক ও পরিষ্কার বালি রাখা হয়। ঘড়িটিকে খাড়াভাবে রাখিলে, বালি নালীপথ দিয়া উপরের প্রকোষ্ঠ হইতে নিচের প্রকোষ্ঠে পড়িতে একটি নির্দিষ্ট সময় লয়। ঐ সময় বা অবকাশকে সময় পরিমাপের একক হিসাবে ধরা হয়। সমস্ত বালি নিচে পড়িয়া গেলে ঘড়িটিকে আবার উল্টাইয়া বসানো হয়।

বর্তমানে, সময় মাপিবার জন্য আমরা যে সকল ঘড়ি ব্যবহার করি তাহা নানারকমের হইতে পারে, যেমন,—সাধারণ ঘড়ি (অর্থাৎ হাত-ঘড়ি, দেওয়াল-ঘড়ি টেবল-ঘড়ি ইত্যাদি), ক্রনোমিটার অথবা নির্ভুল সময় নির্দেশক ঘড়ি, বিরাম-ঘড়ি বা স্টপ-ঘড়ি—অর্থাৎ যে ঘড়ি ইচ্ছামত চালানো বা বন্ধ করা যায় (চিত্র 7)। স্টপ-ঘড়ির চাবি টিপিলে ঘড়ি চলিতে সুরু করে; দ্বিতীয়বার টিপিলে বন্ধ হইয়া যায় এবং কাঁটার অবস্থান হইতে সময় পরিমাপ করা হয়। তৃতীয়বার চাবি টিপিলে কাঁটা আবার 0-দাগে ফিরিয়া আসে। কোন কোন স্টপ-ঘড়ি দ্বারা সেকেণ্ডের 5 ভাগের এক ভাগ, এমন কি দশ ভাগের এক ভাগ সময়ও নির্ণয় করা সম্ভব। দ্রুত ঘটিতেছে এইরূপ কতকগুলি ঘটনার অন্তর্বর্তী সময় পরিমাপের জন্য বিশেষ করিয়া স্টপ-ঘড়ি ব্যবহার করা হয়।
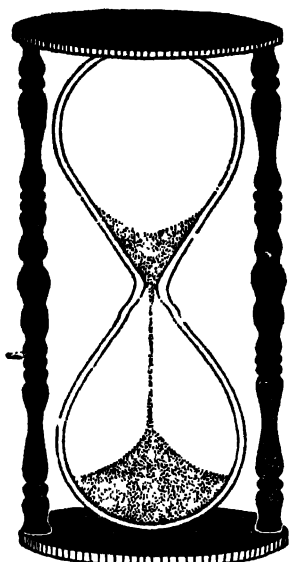
বালু-ঘড়ি; চিত্র 6

এই প্রসঙ্গে একথা উল্লেখযোগ্য যে দোলক-ঘড়ির প্রচলন সম্ভব হয় 1581 খ্রীষ্টাব্দে গ্যালিলিও কর্তৃক সরল দোলক (simple pendulum) আবিষ্কারের পর। শোনা যায় যে গ্যালিলিও যখন মাত্র 17 বৎসর বয়সের এক বালক তখন তিনি পিসা শহরের এক গির্জায় উপাসনা করিতে গিয়া লক্ষ্য করেন যে গির্জার ছাদ হইতে লম্বা শৃঙ্খল দ্বারা ঝুলানো বাতি হাওয়ায় ধীরে ধীরে আন্দোলিত হইতেছে। একটি আন্দোলনে কিরূপ সময় লাগে তাহা দেখিবার জন্য তিনি নিজের নাড়ীর স্পন্দন গণনা করিতে লাগিলেন। তিনি সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেন যে প্রতিটি দোলনের জন্য সমসংখ্যক নাড়ীর স্পন্দন লাগিতেছে—অর্থাৎ প্রতিটি দোলনের সময় সমান। পরে তিনি লিখিয়াছেন,
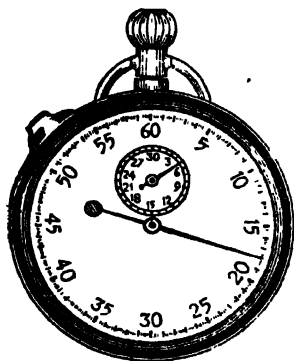
বিরাম-ঘড়ি; চিত্র 7

"কতবার ত' গির্জায় গিয়াছি, হাজার হাজার বার ত' ঝুলানো বাতির প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে ; কিন্তু স্বপ্নেও ভাবি নাই যে ঐ বাতির প্রতিটি দোলন একই সময় সম্পাদিত হইতেছে।" এই ঘটনার পর তিনি সরল দোলকের সূত্রাবলী উপস্থাপিত করেন এবং দোলকের সাহায্যে সময় পরিমাপের ব্যবস্থা করেন.

প্রশ্নাবলী

1. একক কাহাকে বলে এবং এককের প্রয়োজনীয়তা কি? এককের বিভিন্ন পদ্ধতি বুঝাইয়া দাও।

2. নিম্নলিখিত রাশিগুলির সংজ্ঞা লেখ—(ক) সেন্টিমিটার, (খ) ফুট, (গ) কিলোগ্রাম, (ঘ) লিটার।

3, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রকাশ কর:—(ক) ফুট-কে সেন্টিমিটারে, (খ) মিটার-কে গজে, (গ) পাউণ্ড-কে কিলোগ্রামে, (ঘ) সেকেণ্ড-কে দিনে।

[উঃ (ক) 30·48, (খ) 1·09363, (গ) 0·4536, (ঘ) $\frac{1}{86400}$]

4. 'লিটার' ও 'গ্যালন' কাহাকে বলে? গ্যালন-কে লিটারে প্রকাশ কর।

[উঃ 4·54]

5. একটি মিটার স্কেলের সাহায্যে এবং তোমার হাতের তালুর সাহায্যে একটি টেবিলের দৈর্ঘ্য পরিমাপ কর। ইহা হইতে নির্ণয় কর তোমার হাতের তালু কত মিটার দীর্ঘ। এইবার, মিটার স্কেলের সাহায্য সরাসরি তোমার হাতের তালু মাপিয়া দেখ যে ফলাফল মিলিল কি না?

6. একটি সরু তারের ব্যাস 0·008 mm. ঐ ব্যাসকে মিটারে রূপান্তরিত কর।

[উঃ ·000008]

7. ভর মাপিবার যন্ত্রকে কি বলা হয়? চিত্র সহ ঐ যন্ত্রের বর্ণনা দাও। ঐ যন্ত্রের সাহায্যে ভর মাপিবার প্রণালী ব্যাখ্যা কর।

8. তুলা ভাল হইতে গেলে আবশ্যকীয় গুণ কি কি?

9. সৌরদিন কাহাকে বলে? সৌর সেকেণ্ডের সহিত সৌরদিনের সম্পর্ক কি?

10. কলিকাতার মনুমেণ্টের উচ্চতা 60 মিটার; গজ এককে ঐ উচ্চতা কত হইবে।

[উঃ 66 গজ]

11. পরপৃষ্ঠায় কতকগুলি প্রশ্ন এবং প্রত্যেক প্রশ্নের পাশে কতকগুলি সম্ভাব্য উত্তর দেওয়া আছে। যে উত্তরটি তোমার নিকট সর্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত মনে হইবে তাহার উপর ✓ চিহ্ন দাও:

(i) সি. জি. এস্. পদ্ধতিতে আয়তনের একক কি ?

[উঃ। ঘনফুট, লিটার, ঘন সেন্টিমিটার, গ্যালন।]

(ii) 5 c.c. জল একটি চায়ের কাপে, কাচের গ্লাসে এবং আয়তনমাপক চোঙে ঢালা হইল। প্রত্যেক ক্ষেত্রে আয়তন সমান থাকিবে কি ? [উঃ। আয়তন সমান থাকিবে না ; আয়তন অর্ধেক হইয়া যাইবে ; আয়তন সমান থাকিবে।]

(iii) ক্ষেত্রফলের একক-কে মূল-একক বলা যাইবে ? [উঃ মূল একক, লব্ধ একক।]

(iv) একটি রাস্তা 1 মাইল দীর্ঘ অপরটি 1 কিলোমিটার দীর্ঘ। উভয় রাস্তা কি সমান লম্বা ? [উঃ সমান লম্বা ; প্রথমটির দৈর্ঘ্য বেশী ; দ্বিতীয়টির দৈর্ঘ্য বেশী।]

(v) একটি কাঠের ব্লকের আয়তন পরিমাপ করিতে তুমি কি যন্ত্র ব্যবহার করিবে ?

[উঃ। তুলা, স্কেল, আয়তন পরিমাপক চোঙ।]

12. মেট্রিক বা দশমিক পদ্ধতির সুবিধা কি ?

13. বিরাম ঘড়ি কাহাকে বলে ? এই ঘড়ির সুবিধা কি

14. পদার্থের ঘনত্ব ব ত কি বোঝ ? সি. জি. এস্. এবং এফ্. পি. এস্. পদ্ধতিতে ঘনত্বের একক কি হইবে ?

15. একটি বস্তুর ঘনত্ব সি. জি. এস্. পদ্ধতিতে 2·8 গ্র্যাম প্রতি ঘনসেন্টিমিটার হইলে, এফ্. পি. এস্. পদ্ধতিতে উহার মান কত ?

16. একটি বস্তুর ঘনত্ব 5 গ্র্যাম প্রতি সে. মি. এবং আয়তন 10 সি. সি.। বস্তুটির ভর কত ? [উঃ। 50 গ্র্যাম]।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জড় ও শক্তি
(Matter and Energy)

2.1. সূচনা (Introduction) :

এই পৃথিবী বস্তুময়। আমাদের চতুর্দিকে চোখ ফিরাইলে বহুরকম বস্তুর সন্ধান মেলে। টেবিল, চেয়ার, কাগজ, কলম, জল ইত্যাদি যে সমস্ত দ্রব্য আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা বুঝিতে পারি এবং যাহার ওজন আছে তাহাই **বস্তু** (body)। ইহাদের মধ্যে কেহ বা কঠিন, কেহ তরল, কোনটি বা বায়বীয়। কোন বস্তুর গন্ধ অতি মনোরম—কোনটি আবার দুর্গন্ধযুক্ত। কাহারও রং কালো অথবা সাদা—কেহ বা নানাবর্ণে রঞ্জিত। বৈচিত্র্যময় এই সকল বস্তুর সৃষ্টি কি করিয়া হইল, ইহাদের গঠনপ্রণালী, আচরণ বা উপযোগিতা কিরূপ, এই সকল বিষয়ে কৌতুহল উদ্রেক হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তাই, পৃথিবীর আদি যুগ হইতে মানুষের অনুসন্ধানী মন এই সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছে এবং ইহার জবাব খুঁজিয়াছে।

বস্তু যে উপাদানে তৈরী তাহাকে আমরা বলি **জড়** বা **পদার্থ** (matter)। যেমন, কাঠ জড় বা পদার্থ কিন্তু কাঠের তৈরী চেয়ার একটি বস্তু। বস্তু ও পদার্থ ছাড়া আর একটি জিনিসের প্রতি মানুষের দৃষ্টি পড়িয়াছিল। তাহা হইল **শক্তি** (Energy)। বস্তুর কাজ করিবার সামর্থ্যকে বলা হয় শক্তি। শক্তি আছে বলিয়া জগৎ চলিতেছে। শক্তির অভাবে জগৎ স্থাণুবৎ। শক্তি এবং ইহার বিভিন্ন রূপের সহিত আমাদের পরিচয় বস্তুর মাধ্যমে। যেমন, তাপ একপ্রকার শক্তি। কিন্তু তাপকে আলাদা করিয়া কোন আকার বা রং দিয়া আমাদের ধরা-ছোঁয়ার ভিতর আনা সম্ভব নয়। কিন্তু বস্তুর তাপমাত্রা বা উষ্ণতার পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া অথবা উহার প্রসারণ (expansion) লক্ষ্য করিয়া আমরা বস্তুতে তাপশক্তির অস্তিত্ব বুঝিতে পারি। এইরূপ বিদ্যুৎ আর একপ্রকারের শক্তি। বিদ্যুৎ-কে বুঝিতে হইলে কোন বস্তুতে উহার প্রবাহ ঘটাইয়া তাহার ফলাফল লক্ষ্য করিতে হইবে। তার দিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ হইলে তাহা আমরা চোখে দেখিতে পাই না বা হাত দিয়া স্পর্শ করিয়াও অনুভব করিতে পারি না। কিন্তু ঐ প্রবাহ যখন বৈদ্যুতিক পাখায় যায় তখন পাখা ঘোরে এবং তখনই আমরা বৈদ্যুতিক শক্তির অস্তিত্ব বুঝিতে পারি। কাজেই শক্তির পরিচয় পাইতে গেলে বস্তুর সাহায্য প্রয়োজন।

সংজ্ঞাঃ যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, যাহার ওজন ও স্বাধীন অস্তিত্ব আছে, তাহাই বস্তু। বস্তু যে উপাদানে গঠিত তাহা **জড়** বা **পদার্থ**। বস্তুর কাজ করার সামর্থ্যকে বলা হয় **শক্তি**।

2.2. পদার্থের বিভিন্ন অবস্থা ঃ

পদার্থ তিন রকম অবস্থায় থাকিতে পারে। যথা, (1) **কঠিন**, (2) **তরল**, (3) **বায়বীয়**। একখণ্ড বরফের টুকরাকে বলা যাইতে পারে জলের কঠিন অবস্থা। আবার, উহাকে তাপ প্রয়োগে জলে পরিণত করিলে বলা যাইবে জলের তরল অবস্থা। জলকে আরো বেশী উত্তপ্ত করিলে যখন বাষ্প উঠিতে থাকিবে তখন ঐ বাষ্পকে জলের বায়বীয় অবস্থা বলা যাইবে। কাজেই দেখা যাইতেছে একই পদার্থ কঠিন, তরল ও বায়বীয়, এই তিন রকম অবস্থা গ্রহণ করিতে পারে।

পদার্থের গঠনতত্ত্ব ঃ

যে-কোন অবস্থাতেই থাকুক না কেন, পদার্থের মূল গঠনতত্ত্ব অভিন্ন। অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা দ্বারা পদার্থ গঠিত। এই ক্ষুদ্র কণাগুলিকে বলা হয় **অণু** (molecule)। অণুগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে, উহারা যে-পদার্থের অংশ তাহার ধর্ম অক্ষুন্ন রাখে এবং স্বতন্ত্রভাবে থাকিতে পারে। এই অণুগুলি আবার আরও ক্ষুদ্রতর কণিকাদ্বারা গঠিত। ইহাদের নাম **পরমাণু** (atom)। পরমাণু স্বতন্ত্রভাবে থাকিতে পারে না। কিন্তু রাসায়নিক ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে। একই রকম পরমাণু দ্বারা গঠিত যে পদার্থ তাহাকে বলা হয় **মৌল** (element)। দুই বা দুই-য়ের অধিক মৌলের রাসায়নিক সংমিশ্রণে যে-পদার্থের সৃষ্টি হয় তাহাকে বলা হয় **যৌগ** (compound)। উদাহরণস্বরূপ হাইড্রোজেন ও জলের কথা বলা যাইতে পারে। রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফলে দেখা গিয়াছে হাইড্রোজেন বা অক্সিজেন অণুতে একই রকমের পরমাণু বর্তমান কিন্তু জলের প্রত্যেক অণু হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পরমাণু দ্বারা গঠিত। কাজেই হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনকে বলা হয় মৌল এবং জলকে বলা হয় যৌগ। রাসায়নিকেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, এই বিশ্বে কিঞ্চিদধিক 100 রকমের মৌল আছে। ইহাদের ভিতর হাইড্রোজেন সর্বাপেক্ষা হালকা এবং ইউরেনিয়াম সর্বাপেক্ষা ভারী মৌল। এই সকল মৌলের বিভিন্ন সংমিশ্রণে যৌগের সৃষ্টি। এই পৃথিবীতে যদিও বহু রকমের বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি তাহাদের গঠনের মূলে আছে মাত্র কয়েক রকমের মৌল।

আধুনিক বিজ্ঞান অনুযায়ী পরমাণু পদার্থের ক্ষুদ্রতম অবস্থা নয়। পরমাণুকে ভাঙ্গিয়া আরও ক্ষুদ্রতর কণিকা পাওয়া যায়। এই কণাগুলি ঋণাত্মক (negative) তড়িৎযুক্ত। ইহাদের বলা হয় **ইলেকট্রন**।

পরমাণুর ইলেকট্রনগুলি একটি ধনাত্মক (positive) তড়িৎযুক্ত কেন্দ্রক বা 'নিউক্লিয়াস' (nucleus)-কে প্রদক্ষিণ করিয়া সর্বদা ঘূর্ণমান। এই কেন্দ্রক গঠিত হইয়াছে **প্রোটন, নিউট্রন** প্রভৃতি অতি সূক্ষ্ম কণাদ্বারা। পরমাণুর গঠনপ্রণালীকে সৌরজগতের গঠনপ্রণালীর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। কেন্দ্রক-কে বলা যাইতে পারে সূর্য এবং ঘূর্ণমান ইলেকট্রন-গুলিকে গ্রহের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে।

2.3. বস্তুর ভর ও ওজন (Mass and weight of a body) :

পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে বস্তুর ভর বলিতে ঐ বস্তুতে কতটা পরিমাণ জড় বা পদার্থ আছে, তাহাই বুঝায়। যেমন একটি লোহার বলে যতখানি লোহা আছে তাহাই বলটির **ভর**। সাধারণভাবে আমরা বস্তুর ভর ও ওজনের ভিতর পার্থক্য করি না। যে বস্তুর ভর 30 কিলো বলি তাহার ওজন বলিতেও 30 কিলো বলা হয়। কিন্তু দু'টি সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস এবং ইহাদের পার্থক্য ভাল করিয়া বুঝিয়া রাখা উচিত।

সকল বস্তুরই ওজন আছে, ইহা বলাই বাহুল্য। হাতের উপর কোন বস্তুকে রাখিলে আমরা সহজে ঐ ওজন অনুভব করি। কোন কোন বস্তুর ওজন এত বেশী যে হাতের উপর উহাকে রাখা বা টানিয়া তোলা সম্ভব নয়। বস্তুর এই ওজন কোথা হইতে আসে বলিতে পার কি? পৃথিবী প্রত্যেক বস্তুকে নিজ কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে। বস্তুর উপর পৃথিবীর এই নিম্নাভিমুখী আকর্ষণই বস্তুর ওজন। বস্তুর ভিতর যত বেশী পদার্থ থাকিবে উহার উপর আকর্ষণ বল তত বৃদ্ধি পাইবে; সুতরাং উহার ওজনও তত বাড়িয়া যাইবে। তাই, একটি বাটির যাহা ওজন একটি বালতির ওজন তার চাইতে বেশী হইবে; আবার বালতিটি জলভর্তি করিলে ওজন আরও বাড়িয়া যাইবে।

সকল পার্থিব বস্তুর উপর পৃথিবীর আকর্ষণ সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেন বিখ্যাত পদার্থবিদ স্যার আইজাক নিউটন। এই সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে। 1666 খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে সংক্রামক ব্যাধিরূপে প্লেগ দেখা দিয়াছিল। তখন নিউটন কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের ছাত্র। বয়স মাত্র 24 বৎসর। কলেজের সমস্ত ছাত্র প্লেগের ভয়ে কলেজ ছাড়িয়া দূরদূরান্তে পলায়ন করিল। নিউটনও পলাইয়া উল্সথোর্পে তাঁহার গ্রামের বাড়ীতে চলিয়া আসেন।

একদিন নিউটন তাঁহার গৃহসংলগ্ন বাগানে একটি আপেল গাছের নীচে বসিয়া পুস্তক পড়িতেছিলেন। এমন সময় একটি আপেল টুপ্ করিয়া তাঁহার সম্মুখে মাটিতে পড়িল। তাহা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি চিন্তা করিলেন, কেন আপেলটি নীচের দিকে পড়িল? উপরেও ত' উঠিতে পারিত! কোন জিনিসকে কিছু উপর হইতে ফেলিলে কেন উহা সর্বদা মাটির দিকে আসে? নিশ্চয়ই পৃথিবী সব-কিছু বস্তুকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। এই চিন্তায় তিনি বিভোর হইয়া রহিলেন। অবশেষে তিনি আবিষ্কার করিলেন পৃথিবীর আকর্ষণের কথা। ভাবিয়া দেখ, মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়সে তিনি আবিষ্কার করিলেন এই মহাজগতের চিরন্তন এক সত্য! এই আকর্ষণ শুধু পৃথিবী ও পার্থিব বস্তুর ভিতর নয়—এই বিশ্বের যে-কোন দুইটি বস্তুর ভিতরই বর্তমান।

বিভিন্ন বস্তুর উপর পৃথিবীর আকর্ষণ বিভিন্ন—অর্থাৎ বিভিন্ন বস্তুর ওজন বিভিন্ন তাহা নিম্নলিখিত সহজ পরীক্ষা দ্বারা দেখানো যাইতে পারে।

গ্র্যামে দাগকাটা একটি স্কেলের গায়ে হুকের সাহায্যে একটি স্প্রিং আটকাও এবং স্প্রিংয়ের অপর প্রান্ত হইতে একটি তুলাপাত্র (scale pan) ঝুলাও [চিত্র 1]। স্প্রিংয়ের সহিত একটি কাঁটা (pointer) যুক্ত আছে এবং ঐ কাঁটা স্কেলের গা-বাহিয়া চলাচল করিতে পারে। এইবার কোন একটি বস্তু তুলাপাত্রে রাখিলে দেখা যাইবে যে কাঁটা খানিকটা নিচে নামিয়া আসিয়াছে। কেন এইরূপ হইল? বস্তুটিকে পৃথিবী নিচের দিকে আকর্ষণ করে এবং ঐ আকর্ষণের ফলে স্প্রিং খানিকটা দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি পায়। তাই কাঁটাখানিকটা নিচে নামিয়া আসে। অন্যভাবে বলা যায় যে বস্তুর ওজনের জন্য স্প্রিং দৈর্ঘ্যে বাড়িল এবং কাঁটা নিচে নামিয়া আসিল। তুলাপাত্রে বিভিন্ন বস্তু রাখিলে দেখা যাইবে যে কাঁটা স্কেলের বিভিন্ন দাগে আসিয়া দাঁড়াইবে। এই পরীক্ষালব্ধ ফলাফল প্রমাণ করে যে বিভিন্ন বস্তুর ওজন বিভিন্ন।

চিত্র 1

এইরূপ স্প্রিংয়ের সাহায্যে বস্তুর প্রকৃত ওজন মাপিবার একপ্রকার যন্ত্র আছে। ইহাকে স্প্রিং-তুলা (spring balance) বলা হয়।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে ওজনের সংজ্ঞা হিসাবে আমরা বলিতে পারি যে, কোন বস্তু পৃথিবীর কেন্দ্র অভিমুখে মোট যে-আকর্ষণ বল অনুভব

করে, তাহাই হইল বস্তুর ওজন। সুতরাং মনে রাখিতে হইবে, ওজন কার্যত একটি বল।

বস্তুকে যেখানেই লইয়া যাওয়া হউক, উহার ভর ঠিক একই থাকিবে। কিন্তু পৃথিবী পৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানে এবং পৃথিবী-পৃষ্ঠ হইতে বিভিন্ন উচ্চতায় বস্তুর ওজনের সামান্য পরিবর্তন দেখা যায়। মেরু প্রদেশে কোন বস্তুর যাহা ওজন, নিরক্ষপ্রান্তে ঐ ওজন কম দেখা যাইবে। আবার ভূপৃষ্ঠে কোন বস্তুর যাহা ওজন, পর্বতশৃঙ্গে উহার ওজন হইবে অপেক্ষাকৃত কম। বস্তুর গতি, স্থিতি, তাপমাত্রা, তড়িতাবস্থা, চুম্বকত্ব প্রভৃতি বস্তুর ভর-কে প্রভাবিত করিতে পারে না বলিয়া ভরকে বস্তুর **স্বকীয় ধর্ম** (intrinsic property) হিসাবে গণ্য করা হয়। কিন্তু ওজন স্বকীয় ধর্ম নয়। কারণ ওজন পরিবর্তনীয়।

2.4. স্প্রিং তুলা :

2 নং চিত্রে একটি স্প্রিং তুলা দেখানো হইয়াছে। স্প্রিং তুলার ভিতরের অংশ 3 নং চিত্রে দেখানো হইল।

এই যন্ত্রে একটি ইস্পাতের স্প্রিংকে একটি ধাতব আবরণের ভিতর এমনভাবে রাখা হইয়াছে যে স্প্রিংটির এক প্রান্ত আবরণের উপর একটি আংটার সহিত আটকানো এবং নিম্ন-প্রান্ত একটি দণ্ডের সহিত সংযুক্ত। এই দণ্ডের অপর প্রান্তে একটি হুক লাগানো আছে। যে-বস্তুর ওজন নির্ণয় করিতে হইবে তাহাকে এই হুকে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। ধাতব আবরণের গায়ে পাউণ্ড অথবা গ্রামে দাগকাটা একটি স্কেল অঙ্কিত থাকে। স্প্রিংটির সহিত একটি সরু কাঁটা সূচকের (pointer) কাজ করিবার জন্য লাগানো থাকে। স্প্রিং দৈর্ঘ্যে বাড়িলে সূচক স্কেলের গা বাহিয়া নামিয়া আসে।
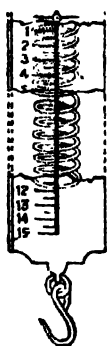
স্প্রিং-তুলার ভিতরের অংশ
চিত্র 3
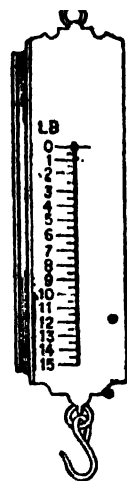
স্প্রিং-তুলা
চিত্র 2

প্রথমে কয়েকটি জানা ওজনের বস্তুকে হুকে ঝুলাইয়া স্প্রিং কতটা

দৈর্ঘ্যে বাড়ে এবং তাহার ফলে সূচক কোথায় দাঁড়ায় তাহা ঠিক করিয়া সেই মত স্কেল কাটা হয়। পরে অজ্ঞাত ওজনের কোন বস্তু হুকে ঝুলাইলে সূচক যে-দাগের কাছে দাঁড়াইবে তাহাই হইবে ঐ বস্তুর ওজন। মনে রাখিবে, স্প্রিং-এর প্রসারণ বস্তুর ওজনের সমানুপাতিক।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, স্প্রিং তুলার কার্যনীতি (principle of work) সরাসরি পৃথিবীর আকর্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত। কাজেই সরাসরি এবং দ্রুত ওজন মাপিতে গেলে এই যন্ত্র সুবিধাজনক।

2.5. ভরের নিত্যতা (Conservation of mass) :

বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে এই বিশ্ব-সৃষ্টির আদিতে যে পরিমাণ ভর সৃষ্টি হইয়াছিল, আজও সেই পরিমাণ ভর বর্তমান আছে। মানুষের পক্ষে ভরের বিনাশ বা সৃষ্টি সম্ভব নয়। ইহাকে ভরের নিত্যতা বলা হয়। রাসায়নিক বা অন্যান্য পদ্ধতিতে যখন আমরা এক বা একাধিক বস্তু হইতে অন্য বস্তু তৈয়ারী করি, তখন মোট ভরের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে।

দৈনন্দিন জীবনে কিছু কিছু ঘটনা ঘটিতে দেখিয়া ভরের নিত্যতা সম্পর্কে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগিতে পারে। যেমন, আমরা দেখি যে, মোমবাতি জ্বালাইয়া রাখিলে বা একখণ্ড কাগজ পোড়াইলে সামান্য একটু অবশিষ্টাংশ বা ছাই পড়িয়া থাকে। পাত্রে কিছু জল লইয়া ফুটাইলে কিছুক্ষণ পরে ঐ জল অদৃশ্য হইয়া যায়। একটি প্লেটে খানিকটা কর্পূর লইয়া খোলা জায়গায় রাখিয়া দিলে কিছুক্ষণ পরে সমস্ত কর্পূর উবিয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে আমাদের চারিদিকে প্রায় সকল জিনিসেরই ক্ষয়-ক্ষতি আমরা লক্ষ্য করি। ইহা কি ভরের বিনাশ নয়? আবার ছোট একটি বীজ মাটিতে রোপন করিলে কালক্রমে তাহা বিরাট বৃক্ষে পরিণত হয়। অথবা, এক টুকরা ম্যাগনেসিয়াম তার লইয়া আগুনে দগ্ধ কর। দেখিবে কিছু সাদা রংয়ের ছাই পড়িয়া আছে। ওজন করিলে দেখা যাইবে ঐ ছাইয়ের ওজন ম্যাগনেসিয়াম তারের ওজন অপেক্ষা বেশী। এই সকল ঘটনা লক্ষ্য করিলে মনে হইতে পারে যে মানুষের পক্ষে নতুন ভর সৃষ্টি করাও সম্ভব।

কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। উপরোক্ত ঘটনাগুলি সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে কাগজ পোড়াইলে বা মোমবাতি জ্বালাইলে বেশ কিছু পরিমাণ গ্যাস তৈয়ারী হইয়া বায়ুতে মিশিয়া যাইতেছে। ঐ গ্যাসের ভর মাপিতে পারিলে দেখা যাইত যে অবশিষ্টাংশ এবং ঐ গ্যাসের মোট ভর মোমবাতির ভরের সমান। জলের বেলাতেও দেখা যায় জল

ধীরে ধীরে স্টীমে পরিণত হইতেছে এবং ঐ স্টীমের মোট ভর জলের ভরের সমান। বীজ জমি এবং বায়ু হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া ক্রমশ ভর বৃদ্ধি করে এবং কালক্রমে বিরাট বৃক্ষে পরিণত হয়। তেমনি, ম্যাগনেসিয়াম তার বায়ু মধ্যে দহন করিলে বায়ুর অক্সিজেন ম্যাগনেসিয়ামের সহিত যুক্ত হয় বলিয়া ছাইয়ের ওজন ম্যাগনেসিয়াম তারের ওজন অপেক্ষা বেশী হয়। সুতরাং কোথাও ভরের বিনাশ বা নতুন ভরের সৃষ্টি হইতেছে না।

পরীক্ষাগারে নানাপ্রকার পরীক্ষার মাধ্যমেও 'ভরের নিত্যতা' সূত্র যাচাই করিয়া লওয়া হইয়াছে।

2.6. শক্তি এবং ইহার বিভিন্ন রূপ (Energy and its different forms) :

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে বস্তুর কাজ করিবার সামর্থ্যকে শক্তি বলে। শক্তিকে মোটামুটি সাত ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। যথা :

(1) **যান্ত্রিক শক্তি** (Mechanical energy) : গতিশীল রেল-গাড়ী, বন্দুক হইতে ছোড়া গুলী, মাংসপেশীর সঞ্চালন প্রভৃতি যান্ত্রিক কারণে যে শক্তির প্রকাশ হয় তাহাকে যান্ত্রিক শক্তি বলে।

(2) **তাপ শক্তি** (Heat energy): তাপের সাহায্যে আমরা অনেক কাজ করিতে পারি। যেমন, স্টীমের তাপে এঞ্জিন চালনা করা পেট্রল, ডিজেল প্রভৃতি জ্বালানীতে তাপ প্রয়োগ করিয়া মোটর গাড়ী, এরোপ্লেন প্রভৃতি চালনা ইত্যাদি। সুতরাং তাপ একপ্রকার শক্তি।

(3) **আলোক শক্তি** (Light energy) : একটি জ্বলন্ত বৈদ্যুতিক বাতির কাছে হাত লইলে বেশ গরম বোধ হইবে। ইহা হইতে বোঝা যায় আলো তাপশক্তি উৎপন্ন করে। সুতরাং আলোও একপ্রকার শক্তি।

(4) **শব্দ শক্তি** (Sound energy) : একটি টানা দেওয়া তারকে কম্পিত করিলে শব্দ নিঃসৃত হয়। এস্থলে তারের যান্ত্রিক শক্তি শব্দশক্তিতে পরিণত হইতেছে।

(5) **চৌম্বক শক্তি** (Magnetic energy) : একটি চুম্বক একটি লৌহখণ্ডকে আকর্ষণ করিয়া কিছু কাজ সম্পন্ন করিতে পারে। সুতরাং চৌম্বকত্ব একপ্রকার শক্তি।

(6) **তড়িৎ শক্তি** (Electric energy) : একটি তড়িৎগ্রস্ত বস্তু একটি তড়িৎবিহীন বস্তুকে আকর্ষণ করে অথবা অপর একটি সমপ্রকার

তড়িৎগ্রস্ত বস্তুকে বিকর্ষণ করিতে পারে। ফলে, তড়িৎ-কে একপ্রকার শক্তি বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

(7) **রাসায়নিক শক্তি** (Chemical energy): যখন কয়লা পোড়ান হয় তখন বায়ুর অক্সিজেনের সহিত যুক্ত হইয়া কয়লার রাসায়নিক শক্তি তাপশক্তিতে পরিণত হয়।

2. 7. শক্তির রূপান্তর (Transformation of energy):

উপরোক্ত সাত প্রকার শক্তি পরস্পরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, অর্থাৎ যে-কোন একটা হইতে অন্যটায় রূপান্তর সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে প্রায় প্রত্যেক প্রাকৃতিক ঘটনাই শক্তির রূপান্তর বলিয়া ধরা যাইতে পারে। তাহার ফলে আমরা বিচিত্র প্রাকৃতিক লীলা দেখিতে পাই। নিম্নে এই রূপান্তরের কয়েকটি সহজ দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল।

জল উচ্চস্থান হইতে নিম্নদিকে প্রবাহিত হয়। উচ্চস্থানে থাকাকালীন জলের স্থিতিশক্তি নিম্নদিকে যাইবার সময় গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া প্রবল স্রোতের সৃষ্টি করে। জলের এই গতিশক্তিকে কাজে লাগাইয়া অনেক ক্ষেত্রে তড়িৎশক্তি সৃষ্টি করা হয়।

যখন বৈদ্যুতিক বাতির ফিলামেণ্টের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালনা করা হয় তখন আমরা আলো পাই। এস্থলে বৈদ্যুতিক শক্তি আলোকশক্তিতে রূপান্তরিত হইতেছে।

স্টীম-ইঞ্জিনে তাপের সাহায্যে স্টীম উৎপন্ন করিয়া রেলগাড়ী চালানো হয়। এস্থলে, তাপশক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হইতেছে।

দুই হাতের তালু সজোরে ঘর্ষণ করিলে তালু গরম হইয়া ওঠে। এক্ষেত্রে যান্ত্রিক শক্তি তাপশক্তিতে পরিণত হইতেছে।

এইরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখানো যাইতে পারে, একপ্রকার শক্তির অন্য যে-কোন প্রকার শক্তিতে রূপান্তর সম্ভব।

2.8. শক্তির নিত্যতা (Conservation of energy):

শক্তি যখন একরূপ হইতে অন্যরূপে পরিবর্তিত হয় তখন শক্তির কোন ক্ষয় হয় না। একবস্তু যে পরিমাণ শক্তি হারাইবে অন্য বস্তু ঠিক সেই পরিমাণ শক্তি লাভ করিবে। প্রকৃতপক্ষে আমরা কোন নতুন শক্তি সৃষ্টি করিতে পারি না বা শক্তি ধ্বংস করিতে পারি না। বিজ্ঞানীগণ বিশ্বাস করেন, এই বিশ্ব-সৃষ্টির প্রথম দিন যে-পরিমাণ শক্তি ছিল আজও সেই পরিমাণ শক্তি বর্তমান। এই সূত্রকে **শক্তির নিত্যতা** বলে।

প্রশ্নাবলী

1. বস্তু, জড় ও শক্তির সংজ্ঞা লেখ। বস্তু ও জড়ের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও।

2. পদার্থ কত রকম অবস্থায় থাকিতে পারে? উদাহরণ সহযোগে তোমার উত্তর ব্যাখ্যা কর। অণু ও পরমাণু কাহাকে বলে? ইহাদের ভিতর পার্থক্য কি?

3. বস্তুর ভর ও ওজন কাহাকে বলে? উহাদের ভিতর পার্থক্য কি? ভর কে বস্তুর স্বকীয় ধর্ম বলিয়া উল্লেখ করা হয় কেন?

4. একটি বস্তুর ভর 30 gm এবং ওজন 30 gm—এইরূপ বলা কি যুক্তি সঙ্গত?

5. একটি বস্তুকে ভূ-পৃষ্ঠ হইতে পর্বতশৃঙ্গে লইয়া যাওয়া হইল। উহার ভর ও ওজনের কি পার্থক্য লক্ষ্য করা যাইবে?

6. উদাহরণ সহযোগে 'ভরের নিত্যতা' সূত্র ব্যাখ্যা কর।

7. শক্তি কাহাকে বলে? শক্তি কয়প্রকার? একপ্রকার শক্তিকে কি অন্যপ্রকার শক্তিতে রূপান্তর করা সম্ভব? উদাহরণ সহযোগে তোমার উত্তর ব্যাখ্যা কর।

8. 'শক্তির নিত্যতা' সূত্র বিবৃত কর।

9. নিম্নে কতকগুলি অশুদ্ধ উক্তি আছে। উক্তিগুলির ভুল সংশোধন করিয়া শুদ্ধ কর:

(i) শক্তির প্রকাশ বস্তুর মাধ্যমে। কিন্তু শক্তি যখন এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে ভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করে তখন সর্বদা প্রথম বস্তু কিছু শক্তি হারায়।

(ii) বিজ্ঞানীরা মনে করেন এই বিশ্বসৃষ্টির আদিতে যে পরিমাণ ভর সৃষ্টি হইয়াছিল আজও সেই পরিমাণ ভর বর্তমান। কিন্তু আমাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ বস্তুসমূহের ক্ষয় ক্ষতি লক্ষ্য করিয়া বলা যাইতে পারে যে বিশ্বের ভর ধীরে ধীরে হ্রাস পাইতেছে।

(iii) একই বস্তুকে বিভিন্ন স্থানে স্প্রিং-তুলা দ্বারা ওজন করিলে একই ফল পাওয়া উচিত কারণ বস্তুর ভর অপরিবর্তিত থাকিতেছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অবস্থার পরিবর্তন
(Change of State)

3.1. সূচনা (Introduction) :

আমরা জানি পদার্থ তিন রকম অবস্থায় থাকিতে পারে; যথা—কঠিন, তরল ও বায়বীয়। যখন কোন পদার্থ কঠিন হইতে তরলে বা তরল হইতে বায়বীয় অবস্থাতে অথবা বায়বীয় হইতে তরলে—অর্থাৎ যে কোন অবস্থা হইতে অন্য কোন অবস্থাতে পরিবর্তিত হয় তখন তাহাকে পদার্থের অবস্থা পরিবর্তন বলা হয়। যেমন, একখণ্ড বরফ লইলে বলা যাইবে যে উহা জলের কঠিন অবস্থা। তাপ প্রয়োগে বরফকে জলে পরিণত করিলে উহা তরল অবস্থা। আরও তাপ প্রয়োগ করিয়া জলকে স্টীমে পরিণত করিলে উহা জলের বায়বীয় অবস্থা।

3.2. গলন ও কঠিনীভবন (Melting and freezing) :

ধর, একটুকরা বরফকে $-10°$ সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রাতে রাখা হইয়াছে। ঐ বরফ টুকরাতে যদি তাপ প্রয়োগ করা যায় তবে দেখা যাইবে যে, বরফের তাপমাত্রা বাড়িতেছে। যখন তাপমাত্রা $0°$ সেন্টিগ্রেড হইল তখন তাপ প্রয়োগ সত্ত্বেও তাপমাত্রার আর কোন পরিবর্তন দেখা যাইবে না, কিন্তু বরফ গলিয়া জল হইতে সুরু করিবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না সমস্ত বরফ গলিয়া জল হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাপ প্রয়োগ সত্ত্বেও তাপমাত্রা $0°$ সেন্টিগ্রেড থাকিবে। পরে বরফগলা জলের তাপমাত্রা আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাইবে।

তেমনি যদি খানিকটা বিশুদ্ধ জল লইয়া ক্রমাগত ঠাণ্ডা করা যায় তবে জলের তাপমাত্রা হ্রাস পাইবে কিন্তু যখন তাপমাত্রা $0°$ সেন্টিগ্রেড পৌঁছাইবে তখন ঠাণ্ডা করা সত্ত্বেও জলের তাপমাত্রার কোন পরিবর্তন দেখা যাইবে না, কিন্তু জল জমিয়া বরফ হইতে শুরু করিবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না সমস্ত জল জমিয়া বরফে পরিণত হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত ঠাণ্ডা করা সত্ত্বেও তাপমাত্রা $0°$ সেন্টিগ্রেডে থাকিবে। পরে বরফের তাপমাত্রা আস্তে আস্তে হ্রাস পাইবে।

এই ঘটনা শুধু যে বরফ এবং জলের বেলাতে প্রযোজ্য তাহা নয়। প্রকৃতপক্ষে যে-সমস্ত পদার্থ তাপ প্রয়োগে রাসায়নিক ক্রিয়া করিবে না তাহাদের বেলাতেই প্রযোজ্য। কিন্তু যে-সমস্ত পদার্থকে উত্তপ্ত করিলে

রাসায়নিক ক্রিয়া হয় তাহাদের বেলা অন্যরূপ হইবে। যেমন, কয়লা বা কাঠ ইত্যাদিতে তাপ দিলে গলিবার পরিবর্তে রাসায়নিক ক্রিয়া হইয়া উহারা পুড়িয়া যায়।

সুতরাং বলা যাইতে পারে যে সাধারণত কোন কঠিন পদার্থে তাপ প্রয়োগ করিলে প্রথমে উহার তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় পৌঁছিলে কঠিন পদার্থ গলিতে শুরু করে এবং তখন তাপ প্রয়োগ সত্ত্বেও তাপ-মাত্রার আর কোন পরিবর্তন হয়না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সমস্ত কঠিন পদার্থ গলিয়া তরলে পরিণত হইবে। এই ঘটনাকে পদার্থের **গলন** (melting) বলা হয়।

তেমনি সাধারণত তরল পদার্থ হইতে তাপ নিষ্কাশন করিলে প্রথমে উহার তাপমাত্রা হ্রাস পায়। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় পৌঁছিলে তরল পদার্থ জমিয়া কঠিন পদার্থে পরিণত হইতে শুরু করে এবং তখন তাপ নিষ্কাশন সত্ত্বেও তাপমাত্রার আর কোন পরিবর্তন হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সমস্ত তরল জমিয়া কঠিন হইবে। এই ঘটনাকে তরলের **হিমায়ন** বা **কঠিনীভবন** (Freezing or solidification) বলা হয়।

3.3. পদার্থের গলনাঙ্ক ও হিমাঙ্ক (Melting point and freezing point of a substance) :

সংজ্ঞা : কোন নির্দিষ্ট চাপে কঠিন পদার্থ যে-তাপমাত্রায় গলিতে শুরু করে তাহাকে উক্ত পদার্থের **গলনাঙ্ক** বলে। যতক্ষণ না সমস্ত পদার্থ গলিয়া যায় ততক্ষণ ঐ তাপমাত্রা স্থির থাকে।

কোন নির্দিষ্ট চাপে তরল যে-তাপমাত্রায় জমিতে শুরু করে তাহাকে উক্ত তরলের **হিমাঙ্ক** বলে। যতক্ষণ না সমস্ত তরল জমিয়া যায় ততক্ষণ ঐ তাপমাত্রা স্থির থাকে।

প্রায় প্রত্যেক পদার্থের গলনাঙ্ক ও হিমাঙ্ক সমান। যেমন, প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে বরফ 0° সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রায় গলিয়া জল হয়। আবার জল ঐ তাপমাত্রাতেই জমিয়া বরফে পরিণত হয়। কিন্তু কতকগুলি পদার্থ আছে—যেমন, চর্বি, মোম, কাচ, মাখন ইত্যাদি—যেগুলি গলিবার পূর্বে একপ্রকার থকথকে অবস্থায় উপনীত হয়। এই পদার্থগুলির কোন বিশেষ নির্দিষ্ট গলনাঙ্ক নাই বা ইহাদের গলনাঙ্ক ও হিমাঙ্ক সমান নয়। যেমন মাখন 23° সেণ্টিগ্রেড এবং 33° সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রার মধ্যে গলে এবং 23° সেণ্টিগ্রেড এবং 20° সেণ্টিগ্রেড-এর মধ্যে জমিয়া যায়। কিন্তু একথা মনে রাখিতে হইবে যে, কোন পদার্থের গলনাঙ্ক বা **হিমাঙ্ক** ধ্রুবক নয়। চাপের উপর উহা নির্ভর করে।

3.4. গলনাঙ্কের উপর চাপের প্রভাব (Effects of pressure on melting point) :

পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, পদার্থের গলনাঙ্ক চাপের উপর নির্ভর করে। চাপ ও গলনাঙ্কের পারস্পরিক সম্পর্ক নিম্নরূপ :

(i) গলনের ফলে যে সমস্ত পদার্থের আয়তন হ্রাস পায়—যেমন, ঢালাই লোহা, বরফ ইত্যাদি, চাপ বৃদ্ধি করিলে ঐ সমস্ত পদার্থের গলনাঙ্ক কমিয়া যায় অর্থাৎ উহারা কম তাপমাত্রায় গলে। যেমন, বরফের গলনাঙ্ক প্রতি প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপের বৃদ্ধিতে প্রায় 0.007° সেন্টিগ্রেড হ্রাস পায়। ইহার সহজ কারণ, বর্ধিত চাপ পদার্থের আয়তন সংকোচনের সুবিধা করিয়া দেয় এবং তাহার ফলে গলনাঙ্ক কমিয়া যায়।

(ii) গলনের ফলে যে-সমস্ত পদার্থের আয়তন বৃদ্ধি পায়—যেমন, মোম ইত্যাদি, চাপ বৃদ্ধি করিলে ঐ সকল পদার্থের গলনাঙ্ক বাড়িয়া যায় অর্থাৎ উহারা বেশী তাপমাত্রায় গলে। মোমের ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে প্রতি প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপের বৃদ্ধিতে মোমের গলনাঙ্ক প্রায় 0.04° সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধি পায়। ইহার সহজ কারণ বর্ধিত চাপ পদার্থের আয়তন বৃদ্ধির অসুবিধা করিয়া দেয় এবং তাহার ফলে গলনাঙ্ক বৃদ্ধি পায়।

3.5. বাষ্প ও বাষ্পীভবন (Vapour and Vaporisation) :

কোন তরলের বায়বীয় অবস্থাকে উক্ত তরলের বাষ্প বলা হয় এবং যে-পদ্ধতিতে তরল বাষ্পে পরিণত হয় তাহাকে **বাষ্পীভবন** বলে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে যে গ্যাস ও বাষ্প এক জিনিস নহে। ইহাদের মধ্যে পার্থক্য বুঝিয়া রাখা উচিত। আমরা সাধারণভাবে এই দুইটি কথার ভিতর কোন পার্থক্য সৃষ্টি করি না ; একই অর্থে দুইটি কথাকেই ব্যবহার করিয়া থাকি। কিন্তু তাহা ঠিক নহে।

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, কোন তরল হইতে উদ্গত বাষ্পকে যে কোন তাপমাত্রায় রাখিয়া চাপ প্রদান করিলে উহা পুনরায় তরলীভূত হয় না। তরলীভূত করিতে হইলে বাষ্পকে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় অথবা উহা হইতে কম তাপমাত্রায় রাখিয়া চাপ প্রদান করিতে হইবে। ঐ নির্দিষ্ট তাপমাত্রাকে বলা হয় **সন্ধি-তাপমাত্রা** (critical temperature)। কোন বাষ্প সন্ধি-তাপমাত্রার নিম্নে থাকিলেই উহাকে বাষ্প বলা উচিৎ ; আর সন্ধি-তাপমাত্রার ঊর্ধ্বে থাকিলে গ্যাস বলা উচিত।

3.6. বাষ্পীভবনের বিভিন্ন উপায় (Different methods of vaporisation) :

তরল পদার্থ দুই রকম উপায়ে বাষ্পে পরিণত হইতে পারে। যথা—(1) বাষ্পায়ন (evaporation) এবং (2) স্ফুটন (boiling)।

বাষ্পায়ন : ধীরে ধীরে তরল অবস্থা হইতে বাষ্পে পরিণত হওয়ার পদ্ধতিকে বাষ্পায়ন বলে। বাষ্পায়ন তরলের উপরি-তল হইতে হয় এবং যে কোন তাপমাত্রায় হইতে পারে। গরমকালে নদী, পুকুর শুকাইয়া যাওয়া, খোলা পাত্রে খানিকটা জল রাখিয়া দিলে কিছুদিন পরে তাহা উবিয়া যাওয়া, ভিজা কাপড় শুকাইতে দিলে জল শুকাইয়া যাওয়া প্রভৃতি বাষ্পায়নের দরুণ হয়।

বাষ্পায়ন দ্রুত হইবে কিংবা মন্থর হইবে তাহা তরল এবং অন্যান্য কয়েকটি বিশেষ অবস্থার উপর নির্ভর করে। একটি প্লেটে সমান পরিমাণ জল এবং স্পিরিট ঢাল। দেখিবে স্পিরিট জলের অনেক আগে উবিয়া গিয়াছে। ইহা হইতে বোঝা যায় যে বাষ্পায়ন তরলের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। যে তরল যত উদ্বায়ী (volatile), উহা তত দ্রুত বাষ্পীভূত হইবে। ইথার, অ্যালকোহল, ইত্যাদি খুব উদ্বায়ী তরল।

তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছ যে শীতকালে ভিজা কাপড় যত তাড়াতাড়ি শুকায়, বর্ষাকালে তত তাড়াতাড়ি শুকায় না ; ইহার কারণ এই যে, শীতকাল অপেক্ষা বর্ষাকালে বায়ুতে বেশী জলীয় বাষ্প থাকে। বায়ুতে বেশী জলীয় বাষ্প থাকিলে জল হইতে বাষ্প উঠিতে বাধা পায় ; কাজেই বাষ্পায়ন দ্রুত হয় না।

গরম চা বা দুধ খাইবার সময় তোমরা অনেকে ডিশে ঢালিয়া খাও ; কারণ ডিশে ঢালিলে উহা তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয়। ইহা হয় কেন জান কি ? ডিশে ঢালিলে তরলের উপরি-তল যত বেশী বিস্তৃত হয়, বাটিতে বা কাপে তত হয় না। উপরি-তল যত বেশী বিস্তৃত হইবে তরল তত দ্রুত বাষ্পীভূত হইয়া ঠাণ্ডা হইবে।

হাওয়া থাকিলে ভিজা কাপড় তাড়াতাড়ি শুকায় ; ছায়া অপেক্ষা রৌদ্রে রাখিলে ভিজা কাপড় দ্রুত শুকাইয়া যায়। ইহা নিত্যকার ঘটনা। ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে বায়ুপ্রবাহ এবং উষ্ণতা বাষ্পায়নের দ্রুততা বৃদ্ধি করে।

সুতরাং উপরোক্ত উদাহরণগুলি হইতে আমরা বলিতে পারি যে, (ক) তরলের প্রকৃতি, (খ) বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ, (গ) তরলের

•উপরি-তলের বিস্তৃতি, (ঘ) বায়ুপ্রবাহ, (ঙ) তরলের উষ্ণতা—এই সকল বিশেষ অবস্থার উপর তরলের বাষ্পায়নের হার নির্ভর করে।

3.7. তরলের স্ফুটন :

তরল অবস্থা হইতে খুব দ্রুত বাষ্পে পরিণত হইবার পদ্ধতিকে স্ফুটন বলা হয়। স্ফুটন তরলের সমস্ত অংশ হইতে সংঘটিত হয় এবং পারিপার্শ্বিক চাপের উপর নির্ভর করিয়া একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় শুরু হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না সমস্ত তরল বাষ্পে পরিণত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এই তাপমাত্রা স্থির থাকে। ঐ তাপমাত্রাকে উক্ত তরলের **স্ফুটনাঙ্ক** বলা হয়।

প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে যে তাপমাত্রায় তরলের স্ফুটন হয়, তাহাকে ঐ তরলের স্বাভাবিক স্ফুটনাঙ্ক বলে।

পরীক্ষা : একটি কাচের ফ্লাস্ক লইয়া উহাতে কিছু জল ঢাল। ফ্লাস্কের মুখ একটি রবারের ছিপি দিয়া বন্ধ কর। ছিপির একটি ছিদ্র দিয়া একটি থার্মোমিটার (T) এবং আর একটি ছিদ্র দিয়া একটি বাঁকানো কাচনল (E) ঢুকাও। দেখিও যেন থার্মোমিটারের কুণ্ড জলের একটু উপরে থাকে [চিত্র 1]। ফ্লাস্কটি চিত্রে যেমন দেখানো হইয়াছে ঐরূপ অবলম্বনের সহিত আটকাও এবং তলায় একটি তারের জাল রাখ। অতঃপর বার্ণারের সাহায্যে ফ্লাস্ককে আস্তে আস্তে উত্তপ্ত কর।
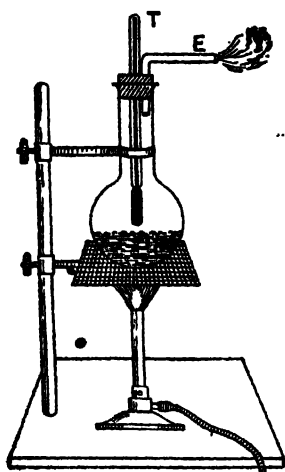
চিত্র নং 1

প্রথম প্রথম জল একটু উত্তপ্ত হইলে দেখিবে, জলের উপর-তল হইতে কিছু কিছু বাষ্প উঠিতেছে ও জলে দ্রবীভূত বায়ু বুদ-বুদের আকারে জল হইতে বাহির হইয়া পাত্রের গায়ে জমিতেছে। থার্মোমিটারের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখিবে, তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়িতেছে। যখন পারদ প্রায় 70° সেন্টি /80° সেন্টি দাগ স্পর্শ করিবে তখন ফ্লাস্কের তলায় জলীয়বাষ্পের বুদবুদ গঠিত হইতে দেখা যাইবে। এই বুদবুদগুলি উপরে উঠিয়া অপেক্ষাকৃত শীতল জলের সংস্পর্শে আসিয়া ভাঙ্গিয়া যাইবে। এই সময় একটা শোঁ শোঁ শব্দ শোনা যাইবে। অবশেষে যখন তাপমাত্রা 98°/99° সেন্টি-এর কাছাকাছি হইবে

তখন বুদবুদগুলি তলা হইতে উপরে আসিয়া ফাটিয়া পড়িবে এবং জলে একটা আলোড়নের সৃষ্টি হইবে। তখন E কাচনল দিয়া প্রচুর স্টিম বাহির হইতে থাকিবে এবং থার্মোমিটারে তাপমাত্রা স্থির হইবে। তখন বলা যাইবে, জলের স্ফুটন হইতেছে। স্ফুটনকালে তরলের তাপমাত্রা স্থির থাকিবে।

3.8. বাষ্পায়ন ও স্ফুটনের পার্থক্য :

বাষ্পায়ন ও স্ফুটন—এই দুই পদ্ধতির ভিতর নিম্নলিখিত প্রভেদ বর্তমান :

(1) স্ফুটন খুব দ্রুত সংঘটিত হয় কিন্তু বাষ্পায়ন অতি ধীরে ধীরে হয়।

(2) স্ফুটন তরলের সমগ্র অংশ ব্যাপিয়া হয়, কিন্তু বাষ্পায়ন তরলের উপরতল হইতে হয়।

(3) প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে স্ফুটন এক নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় শুরু হয় কিন্তু বাষ্পায়ন সকল তাপমাত্রাতেই হইয়া থাকে।

3.9. তরলের স্ফুটনাঙ্কের উপর প্রভাবকারী উপাদান (Factors influencing the boiling point of a liquid) :

নিম্নলিখিত উপাদানগুলি যে-কোন তরলের স্ফুটনাঙ্কের উপর প্রভাব বিস্তার করিবে :

(1) **তরলের উপরকার চাপ :** যে চাপের অধীনে তরলকে ফুটিতে দেওয়া হইবে ঐ চাপের উপর উক্ত তরলের স্ফুটনাঙ্ক নির্ভর করে। চাপ বাড়িলে স্ফুটনাঙ্ক বাড়ে ও চাপ কমিলে স্ফুটনাঙ্ক কমে। দেখা গিয়াছে যে প্রতি 27 মি. মি. বায়ু-চাপ হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে জলের স্বাভাবিক স্ফুটনাঙ্ক (100° সেন্টি) 1° সেন্টি করিয়া হ্রাস-বৃদ্ধি পায়।

(2) **তরলে দ্রবীভূত অবস্থায় অপদ্রব্যের অবস্থান :** তরলে অপদ্রব্য (impurities) দ্রবীভূত অবস্থায় থাকিলে ঐ তরলের স্ফুটনাঙ্ক বিশুদ্ধ তরল অপেক্ষা বেশী হয়। যেমন, বিশুদ্ধ জলের স্বাভাবিক স্ফুটনাঙ্ক 100° সেন্টি. কিন্তু জলে সাধারণ লবণ-জাতীয় পদার্থ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকিলে ঐ জলের স্ফুটনাঙ্ক প্রায় 9° সেন্টি বাড়িয়া যায়।

(3) **স্ফুটনপাত্রের উপাদান :** পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, কোন তরলের স্ফুটনাঙ্ক স্ফুটনপাত্রের উপাদান এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দ্বারা কিছু পরিমাণে প্রভাবান্বিত হয়। যেমন, তামা এবং কাচপাত্রে জল ফুটাইলে কাচপাত্রের বেলাতে স্ফুটনাঙ্ক সামান্য বেশী হয়। ঐ কাচপাত্র পরিষ্কার থাকিলে স্ফুটনাঙ্ক আরো বাড়িয়া যায়। (অবৈজ্ঞানিক প্রহেলিকা)

3.10. ঘনীভবন (Condensation) :

কোন পদার্থ বায়বীয় অবস্থা হইতে তরলে পরিণত হইলে ঐ ঘটনাকে **ঘনীভবন** বলে। পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তরলকে উত্তপ্ত করিলে উহা বাষ্পে পরিণত হয়। সুতরাং ঐ বাষ্পকে পুনরায় তরল অবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে হইলে বাষ্পকে ঠাণ্ডা করিতে হইবে। জলীয় বাষ্প ঠাণ্ডা হইলে জলকণায় ঘনীভূত হয়, ইহার বহু উদাহরণ আমাদের জানা আছে।

শরৎকালের ভোরবেলায় ঘাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাইবে মুক্তার ন্যায় অজস্র শিশির-বিন্দু ঘাসের বা পাতার উপর জমিয়া আছে। বায়ুমণ্ডলে যে জলীয়বাষ্প থাকে তাহা রাত্রিবেলা ঠাণ্ডা হইয়া ঘনীভূত হয় এবং শিশির সৃষ্টি করে।

বায়ুমণ্ডলের জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হইবার ফলে আমরা মেঘ দেখিতে পাই এবং মেঘের জলকণাগুলি খুব ঠাণ্ডা হইলে উহা বৃষ্টির আকারে পৃথিবীতে পড়ে।

গরম ভাতের হাঁড়ির ঢাকনা উল্টাইয়া দেখ। দেখিবে ঢাকনাতে জলবিন্দু জমিয়া আছে।

একটি কাচের গ্লাসে একখণ্ড বরফ ফেলিয়া দাও। দেখিবে কিছুক্ষণের মধ্যে গ্লাসের চারিদিকে কুয়াশার ন্যায় জলবিন্দু জমিয়াছে। বরফ থাকায় গ্লাস খুব ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে এবং গ্লাসের চারিপাশের বায়ুতে যে জলীয় বাষ্প থাকে তাহা ঠাণ্ডা গ্লাসের সংস্পর্শে আসায় হঠাৎ খুব শীতল হয় এবং গ্লাসের চতুর্দিকে জলকণার আকারে জমিয়া যায়।

***3.11. লীন-তাপ** (Latent heat) :

কোন বস্তুতে তাপ প্রয়োগ করিলে বস্তুর তাপমাত্রার পরিবর্তন হয়। থার্মোমিটারের সাহায্যে তাপমাত্রার পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া আমরা বুঝিতে পারি বস্তুটি তাপ গ্রহণ করিতেছে। কিন্তু 0° সেন্টি তাপমাত্রার একখণ্ড বরফে যদি তাপ প্রদান করা হয় তবে দেখা যাইবে যে থার্মোমিটার প্রথমত কোন তাপমাত্রার পরিবর্তন দেখাইতেছে না; অথচ তাপ গ্রহণ করিয়া বরফ আস্তে আস্তে গলিয়া যাইতেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না বরফ টুকরাটি গলিয়া জল হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাপ প্রয়োগ করা সত্ত্বেও তাপমাত্রার কোন পরিবর্তন হইবে না। পরে যখন বরফ সম্পূর্ণ গলিয়া জল হইবে তখন

সেই জলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। তাহা হইলে বরফ টুকরাটির গলনের সময় যে-তাপ প্রদান করা হইল তাহা কোথায় গেল? এই তাপ বরফ টুকরাটির গলনে সাহায্য করিল কিন্তু ইহার কোন ব্যাহ্যিক প্রকাশ হইল না। এইরূপে যে-কোন পদার্থ কঠিন হইতে তরল অবস্থায় পরিবর্তিত হইতে কিছু তাপ গ্রহণ করে যাহা থার্মোমিটারের সাহায্যে ধরা যায় না। এই তাপ বস্তুতে লীন (hidden) হইয়া থাকে বলিয়া ইহাকে **লীন-তাপ** বলে।

আবার, কিছু পরিমাণ জল লইয়া উহাকে তাপ প্রয়োগে উষ্ণ কর। জলের তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইবে। তাপমাত্রা বৃদ্ধি থার্মোমিটারের সাহায্যে লক্ষ্য করা যাইবে। জলের তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে পাইতে যখন 100° সেন্টি হইবে, তখন দেখা যাইবে জলের তাপমাত্রা আর বৃদ্ধি পাইতেছে না কিন্তু জল তাপ গ্রহণ করিয়া ফুটিতেছে এবং স্টীমে পরিণত হইতেছে। অর্থাৎ এই তাপের বাহ্যিক প্রকাশ হইল না কিন্তু ইহা জলকে তরল অবস্থা হইতে স্টীমে পরিণত করিতে সাহায্য করিল। এইরূপ যে কোন তরলপদার্থ তরল অবস্থা হইতে বাষ্পে পরিবর্তিত হইতে কিছু তাপ গ্রহণ করে যাহা থার্মোমিটারের সাহায্যে ধরা যায় না। ইহাকেও লীন-তাপ বলে। প্রথম ক্ষেত্রে লীন-তাপকে বলা হয় **গলনের লীন-তাপ** এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বলা হয় **বাষ্পীভবনের লীন-তাপ**।

সাধারণভাবে আমরা বলিতে পারি যে পদার্থের অবস্থান্তর হইলেই উহা কিছু তাপ গ্রহণ বা বর্জন করে যাহার বাহ্যিক প্রকাশ হয় না। এই তাপকেই লীন-তাপ বলা হয়।

দেখা গিয়াছে বরফ গলনের লীন-তাপ প্রতি গ্র্যামে 80 ক্যালরি। অর্থাৎ 0° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় 1 গ্র্যাম বরফকে 0° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার 1 গ্র্যাম জলে পরিণত করিতে 80 ক্যালরি তাপ প্রদান করিতে হইবে।

তেমনি, স্টীমের লীন-তাপ প্রতি গ্র্যামে 537 ক্যালরি। অর্থাৎ 100° সেন্টি. তাপমাত্রায় 1 গ্র্যাম জলকে স্টীমে পরিণত করিতে 537 ক্যালরি তাপের প্রয়োজন।

3.12. বাষ্পায়নে শৈত্যের উৎপত্তি (Cold caused by evaporation):

কোন তরল বাষ্পে পরিণত হইতে গেলে কিছু লীন-তাপ গ্রহণ করে। বাহির হইতে এই তাপ প্রদান না করিলে, তরল নিজ দেহ হইতে অথবা পরিপার্শ্ব হইতে তাপ সংগ্রহ করিয়া আস্তে বাষ্পে পরিণত হইবে। তরল অথবা পরিপার্শ্ব ইহাতে শীতল হইয়া পড়ে। এই ধরণের শীতলীকরণের বহু উদাহরণ আছে।

(ক) হাতে কয়েক ফোঁটা স্পিরিট ফেলিলে হাত খুব ঠাণ্ডা মনে হয়। ইহার কারণ স্পিরিট উদ্বায়ী বলিয়া খুব দ্রুত বাষ্পে পরিণত হয় এবং ইহার জন্য প্রয়োজনীয় তাপ হাত হইতে সংগ্রহ করে। ফলে, হাত খুব শীতল বোধ হয়। একই কারণে জ্বর হইলে কপালে ওডিকোলনের পটি বা শুধু জলপটি দেওয়া হয়। জলপটি হইতে জল বাষ্পীভূত হইবার সময় দেহ হইতে তাপ লয় এবং ইহাতে জ্বর কমিয়া যায়।

(খ) দেহ হইতে যখন ঘাম বাহির হয় তখন পাখার হাওয়া দিলে দেহ শীতল হয়। কারণ হাওয়া দিলে ঘাম বাষ্পে পরিণত হইতে সুবিধা পায় এবং দেহ হইতে প্রয়োজনীয় লীন-তাপ সংগ্রহ করিয়া দ্রুত বাষ্পে পরিণত হয়। ফলে দেহ ঠাণ্ডা হয়।

কুকুরের শরীর হইতে ঘাম বাহির হয় না। তাই গ্রীষ্মকালে আরাম পাইবার জন্য কুকুর জিহ্বা বাহির করিয়া রাখে।

(গ) গরমের দিনে পানীয় জল ঠাণ্ডা করিবার জন্য মাটির কুঁজায় জল রাখা হয়। কুঁজা মাটির তৈয়ারী বলিয়া উহার গায়ে অসংখ্য ছিদ্র থাকে। ঐ ছিদ্র দিয়া সর্বদা জল চোঁয়াইয়া বাহিরে আসে ও বাষ্পে পরিণত হয়। ইহার জন্য প্রয়োজনীয় লীন-তাপ কুঁজার গাত্র সরবরাহ করে এবং কুঁজা ঠাণ্ডা হইয়া যায়। সুতরাং কুঁজার অভ্যন্তরস্থ জলও ঠাণ্ডা হয়। কাচের বা কাঁসার পাত্রে জল রাখিলে তত ঠাণ্ডা হয় না। কারণ, ঐ পাত্রের গায়ে ছিদ্র থাকে না, এবং বাষ্পায়নের কোন সুবিধা হয় না। পাত্রের মুখ হইতে যতটুকু বাষ্পীভূত হইবার তাহাই হয়। সেইজন্য জল তেমন ঠাণ্ডা হইতে পারে না। মাটির কুঁজা পুরানো হইয়া গেলে ঐ ছিদ্রগুলি ধুলাবালি দ্বারা বন্ধ হইয়া যায়। তখন ঐ কুঁজার জল আর ঠাণ্ডা হয় না।

(ঘ) ভিজা জামা-কাপড় গায়ে শুকাইলে সর্দি লাগে। এইজন্য ভিজা জামা-কাপড় গায়ে দিয়া থাকিতে নাই। জামা-কাপড়ের জল দেহ হইতে তাপ লইয়া বাষ্পীভূত হয়। তাহাতে দেহ হঠাৎ শীতল হইয়া পড়ে। তখন ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দি হইবার সম্ভাবনা দেখা যায়।

(ঙ) গ্রীষ্মকালে ঘরের জানালায় খস্‌খস্‌ ঝুলাইয়া তাহাতে জল ছিটাইয়া ঘর ঠাণ্ডা রাখা হয়। খস্‌খসের জল খস্‌খস্‌ হইতে লীন-তাপ সংগ্রহ করিয়া বাষ্পে পরিণত হয়। ফলে খস্‌খস্‌ ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে এবং ঐ খস্‌খসের ভিতর দিয়া যে হাওয়া আসে তাহাও ঠাণ্ডা হয়।

প্রশ্নাবলী

1. পদার্থের গলন ও কঠিনীভবন কাহাকে বলে? প্লাটিনামের গলনাঙ্ক 1755° সেণ্টি বলিতে কি বোঝ? পদার্থের গলনাঙ্ক ও হিমাঙ্ক কি সমান?

2. গলনাঙ্কের উপর চাপের প্রভাব কি? উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

3. বাষ্পায়ন ও স্ফুটন কাহাকে বলে। উহাদের মধ্যে পার্থক্য কি?

4. কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর বাষ্পায়নের হার নির্ভর করে? বাষ্প ও গ্যাসের ভিতর পার্থক্য কি?

5. স্ফুটনাঙ্ক কাহাকে বলে? তরলের উপরকার চাপের সহিত ইহার সম্পর্ক কি?

6. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর লেখ :—

(i) গরমকালে পাখার হাওয়ায় আরাম বোধ হয় কেন?

(ii) মাটির কুঁজার জল রাখিলে জল ঠাণ্ডা হয়, কিন্তু ধাতবপাত্রে রাখিলে হয় না কেন?

(iii) গরমকালে জানালায় খস্‌খস্ টাঙানো হয় কেন?

(iv) ভিজা জামাকাপড় গায়ে রাখিলে সর্দি হইবার সম্ভাবনা থাকে কেন?

(v) জ্বর হইলে কপালে ওডিকোলনের পটি দিলে আরাম বোধ হয় কেন?

7. লীন-তাপ কাহাকে বলে? এই তাপ কি থার্মোমিটারে ধরা যায়? বরফ গলনের লীন-তাপ কত?

8. বায়ুমণ্ডলে জলীয়-বাষ্পের ঘনীভবনের দু' একটি দৃষ্টান্ত দাও।

9. বাষ্পীভবনের লীন-তাপ কাহাকে বলে?

10. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির মধ্যে যেটির উত্তর "হ্যাঁ" তাহার পাশে Y এবং যেটির উত্তর "না" তাহার পাশে N বসাও :—

(i) পদার্থের যতক্ষণ গলন বা কঠিনীভবন হয়, ততক্ষণ তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকিলেও পদার্থ কি তাপ গ্রহণ বা বর্জন করে?—

(ii) সকল প্রকার পদার্থেরই কি সুনির্দিষ্ট গলনাঙ্ক বা হিমাঙ্ক আছে?

(iii) গলনের ফলে যে সকল পদার্থের আয়তন বৃদ্ধি পায় তাহাদের গলনাঙ্ক কি চাপ বৃদ্ধিতে বৃদ্ধি পায়?—

(iv) জল হইতে উদ্‌গত বায়বীয় পদার্থকে কি গ্যাস বলা যায়?—

(v) তরলের উপর দিয়া যত কম বায়ু চলাচল হইবে তরল তত শীঘ্র কি বাষ্পীভূত হইবে?—

(vi) তরলের উপরিস্থিত বায়ু-চাপ হ্রাস করিলে কি তরলের স্ফুটনাঙ্ক কমিয়া যায়?—

(vii) একটি পাত্রে জল রাখিয়া উহাকে বরফ দ্বারা ঘিরিয়া রাখিলে ঐ জল কি জমিয়া বরফ হইবে?—

(viii) জলকে 100°C তাপমাত্রায় উষ্ণ করিয়া তাপ সরবরাহ বন্ধ করিলে ঐ জল কি স্টীমে পরিণত হইবে?—

(ix) জল অপেক্ষা স্পিরিট কি বেশী উদ্বায়ী?—

পদার্থ বিজ্ঞান

প্রথম পরিচ্ছেদ

স্থিতি ও গতি
(Rest and Motion)

1.1. সূচনা (Introduction) :

আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বহুরকম সচল বস্তু এবং স্থির বস্তু লক্ষ্য করি। বাড়ী, ঘর, গাছপালা, মাঠ, ময়দান, স্তম্ভ, মিনার প্রভৃতি স্থির কিন্তু চলন্ত রেলগাড়ী, ছুটন্ত ঘোড়া, মোটর গাড়ী প্রভৃতি গতিশীল বা সচল। তুমি যখন বাড়ী হইতে বিদ্যালয়ে হাঁটিয়া যাইতেছ তখন তুমি গতিশীল। কোন ব্যক্তি যদি রাস্তা দিয়া সাইকেল চালাইয়া যায়, তবে তাহাকে আমরা গতিশীল বলি। এইরূপ অসংখ্য গতিশীল বস্তুর উদাহরণ তোমরা জান। লক্ষ্য করিলে দেখিবে, সকল গতিশীল বস্তুই সময়ের সাপেক্ষে স্থান পরিবর্তন করিতেছে—অর্থাৎ এই মুহূর্তে সে যে-স্থানে আছে কিছুক্ষণ পরে তাহাকে অন্যস্থানে দেখা যাইবে। কিন্তু যে বস্তু স্থির তাহার এরূপ কোন স্থান পরিবর্তন আমরা দেখি না। তোমার বিদ্যালয়-গৃহ আজ যে স্থানে আছে কাল সেই স্থানেই থাকিবে। এই কারণে সচল বা গতিশীল বস্তু বলিতে আমরা সেই বস্তু বুঝি যাহা সময়ের সাপেক্ষে স্থান হইতে স্থানান্তরে অবস্থান করে এবং স্থির বস্তু বলিতে সেই বস্তু বুঝি সময়ের সাপেক্ষে যাহার কোন স্থান পরিবর্তন হয় না।

কিন্তু তোমরা জান যে পৃথিবী নিজ অক্ষের চতুর্দিকে 24 ঘণ্টায় একবার
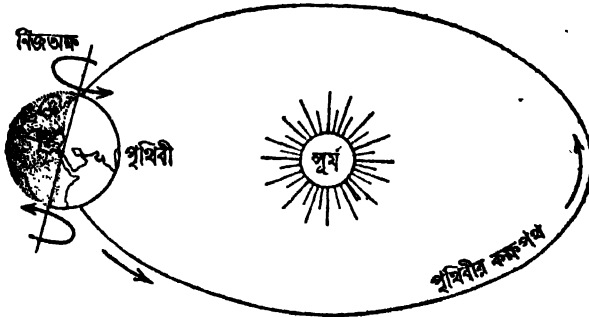
চিত্র 1

ঘুরিয়া আসে এবং 365 দিনে সূর্যের চতুর্দিক একবার প্রদক্ষিণ করে [চিত্র 1]। সুতরাং পৃথিবীর উপর অবস্থিত বাড়ীঘর প্রভৃতি স্থির থাকে কি

করিয়া? মহাকাশচারীরা যখন মহাকাশ যানে চড়িয়া পৃথিবী হইতে দূরে চলিয়া যায় তখন তাহারা দেখে যে, বাড়ীঘর, গাছপালা সবই ক্রমাগত ছুটিতেছে। প্রকৃতপক্ষে এই বিশ্বে কোন বস্তুই স্থির নয় অর্থাৎ পরম স্থিতি (absolute rest) কি তাহা আমরা জানি না।

তাহা হইলে প্রশ্ন উঠিবে যে বাড়ী, ঘর, গাছপালা—যাহাকে আমরা স্থির বস্তু বলিয়া দেখি, তাহা কি? সাধারণ ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক বস্তুর সাপেক্ষে যদি কোন বস্তু স্থান পরিবর্তন না করে তবে তাহাকেই আমরা বলি স্থির বস্তু—আর পারিপার্শ্বিক বস্তুর সাপেক্ষে যদি সে স্থান পরিবর্তন করে তবে বলি বস্তুটি গতিশীল। এই স্থিতি ও গতিকে বলা হয় আপেক্ষিক স্থিতি ও গতি। সুতরাং কোন বস্তু গতিশীল কি স্থির তাহা উল্লেখ করিতে হইলে আমরা পৃথিবীকে স্থির মনে করিয়া পৃথিবীর উপরিস্থ অন্যান্য বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে উহার আপেক্ষিক গতি ও স্থিতি উল্লেখ করিয়া থাকি। এই হিসাবে বাড়ীঘর, গাছপালা স্থির কারণ পারিপার্শ্বিক বস্তুর সাপেক্ষে উহাদের কখনও স্থান পরিবর্তন হয় না।

1.2. চলন ও চলন সংক্রান্ত কয়েকটি রাশির সংজ্ঞা :

যখন কোন বস্তু সরলরেখা অবলম্বন করিয়া চলে তখন তাহার গতিকে **চলন** (translation) বলা হয়। যেমন একটি পাথরকে উঁচু হইতে ফেলিয়া দিলে পাথরটি সরল রেখা অবলম্বন করিয়া পড়ে। সুতরাং পড়ন্ত পাথরটির গতিকে বলা যাইবে চলন। সোজা রাস্তা বরাবর যদি কোন গাড়ী চলিয়া যায় তবে উহার গতিকে বলা যাইবে চলন। চলন সংক্রান্ত রাশিগুলির সংজ্ঞা নিম্নরূপ :

(ক) **সরণ** (Displacement) : যদি কোন বস্তু একটি নির্দিষ্ট দিকে স্থান পরিবর্তন করে তবে সেই পরিবর্তনকে সরণ বলে এবং বস্তুটির প্রথম ও শেষ অবস্থানের ভিতর যে রৈখিক-দূরত্ব (linear distance) হয়, তাহাই বস্তুর সরণের পরিমাপ।

চিত্র 2

ধর, কোন বস্তু গোড়াতে O বিন্দুতে ছিল (চিত্র 2)। অতঃপর 4 ফুট পূর্বদিকে সরিয়া A বিন্দুতে পৌঁছাইল এবং পরে 3 ফুট উত্তরে গিয়া B বিন্দুতে পৌঁছিল। যদি প্রকৃতপক্ষে বস্তু OAB পথে গেল তথাপি
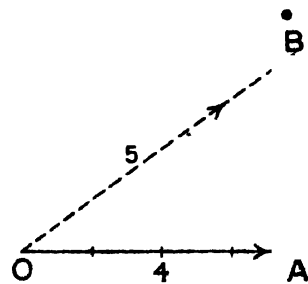
বস্তুটির সরণের পরিমাপ OB সরল রেখা, কারণ O বিন্দু বস্তুর প্রথম ও B বিন্দু শেষ অবস্থান। সরণের মান $=OB=\sqrt{(4)^2+(3)^2}=5$ ফুট।

কাজেই দেখা যাইতেছে, সরণের মান (magnitude) এবং নির্দিষ্ট দিক (direction) আছে। যে-রাশির মান ও দিক থাকে তাহাকে **ভেক্টর** (vector) রাশি বলে। সেই হিসাবে সরণ একটি ভেক্টর রাশি।

(খ) **দ্রুতি** (Speed): সময়ের সাপেক্ষে অবস্থান পরিবর্তনের হারকে (rate) দ্রুতি বলে। অর্থাৎ কোন বস্তু এক সেকেণ্ডে যতটা দূরত্ব যাইতে পারে, তাহাই বস্তুটির দ্রুতি। সুতরাং দ্রুতি নির্ণয় করিতে হইলে বস্তু কতটা দূরত্ব গেল এবং তাহার জন্য কত সময় লাগিল তাহা জানিতে হইবে।

$$\text{দ্রুতি}=\frac{\text{অতিক্রান্ত দূরত্ব}}{\text{সময়}}$$

যেমন, এক মাইল দূরত্ব যদি পায়ে হাঁটিয়া যাওয়া যায় তাহা হইলে যে সময় লাগিবে, সাইকেল চড়িয়া গেলে তাহা অপেক্ষা কম সময় লাগিবে; আবার মোটর গাড়ীতে গেলে আরো কম সময় লাগিবে। অর্থাৎ পায়ে হাঁটার দ্রুতি অপেক্ষা সাইকেলের দ্রুতি বেশী, আবার মোটর গাড়ীর দ্রুতি সাইকেল অপেক্ষা আরো বেশী।

এস্থলে লক্ষণীয় যে, দ্রুতি বলিবার সময় কোনরূপ দিকের কথা বলা হয় নাই। কাজেই দ্রুতির শুধু মান আছে, দিক্ নাই। যে রাশির শুধু মান থাকে, দিক থাকে না, তাহাকে **স্কেলার** রাশি বলে। সেই হিসাবে দ্রুতি একটি স্কেলার রাশি (scalar quantity)।

যদি গতিশীল বস্তু কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করিয়া চলে তবে তাহার দ্রুতিকে বলা হয় সমদ্রুতি (uniform speed)। যদি তাহা না হয় তবে দ্রুতি অসম (variable)।

(গ) **বেগ** (Velocity): সময়ের সাপেক্ষে কোন নির্দিষ্ট দিকে সরণের হার-কে বলে বেগ। এক সেকেণ্ডে কোন বস্তু কোন নির্দিষ্ট দিকে যতটা পথ যাইতে পারে তাহাই উহার বেগের পরিমাপ। যেমন, একটি বস্তু এক সেকেণ্ডে 3 সেন্টিমিটার দূরত্ব উত্তর দিকে গেলে, ঐ দিকে বস্তুর বেগ 3 সেন্টিমিটার প্রতি সেকেণ্ডে। বলা বাহুল্য, বেগ একটি ভেক্টর রাশি।

বেগ সম ও অসম হইতে পারে। যদি কোন বস্তুকণা সমান অবকাশে (equal interval of time) একই দিকে সমান দূরত্ব অতিক্রম করে, তবে তাহার বেগ সম। যদি তাহা না হয় তবে উহার বেগ অসম।

বেগের একক :

সি. জি. এস্. পদ্ধতি : এই পদ্ধতিতে বেগের একক হইল সেকেণ্ডে এক সেণ্টিমিটার—অর্থাৎ কোন বস্তুকণা যদি এক সেকেণ্ডে কোন নির্দিষ্ট দিকে এক সেণ্টিমিটার দূরত্ব যায় তবে তাহার বেগ সি. জি. এস্ পদ্ধতি অনুযায়ী এক একক।

এফ. পি. এস্. পদ্ধতি : এই পদ্ধতিতে বেগের একক হইল সেকেণ্ডে এক ফুট—অর্থাৎ কোন বস্তুকণা যদি এক সেকেণ্ডে কোন নির্দিষ্ট দিকে এক ফুট দূরত্ব যায় তবে তাহার বেগ এফ্. পি. এস্. পদ্ধতি অনুযায়ী এক একক।

উদাহরণ : (1) একটি ট্রেন 10 মাইল পথ 10 মিনিটে অতিক্রম করিলে, উহার দ্রুতি কত ?

উ। এস্থলে অতিক্রান্ত দূরত্ব = 10 মাইল = 10 × 1760 × 3 ফুট

সময় = 10 মিনিট = 10 × 60 সেকেণ্ড

$$\therefore \text{ দ্রুতি} = \frac{\text{অতিক্রান্ত দূরত্ব}}{\text{সময়}} = \frac{10 \times 1760 \times 3}{10 \times 60} = 88 \text{ ফুট/সেকেণ্ড}$$

(2) একটি মোটর গাড়ী সোজা দক্ষিণ অভিমুখী গিয়া 1 ঘণ্টা সময়ে 15 কিলোমিটার পথ অতিক্রম করিল। উহার বেগ কত ?

উ। এস্থলে, দক্ষিণমুখী অতিক্রান্ত দূরত্ব = 15 কিলোমিটার

= 15 × 1000 × 100 সেণ্টিমিটার

সময় = 1 ঘণ্টা = 60 × 60 সেকেণ্ড।

$$\therefore \text{ বেগ} = \frac{\text{অতিক্রান্ত দূরত্ব}}{\text{সময়}} = \frac{15 \times 1000 \times 100}{60 \times 60} = 416.6 \text{ সে.মি./সেকেণ্ড}$$

দ্রুতি এবং বেগের পার্থক্য : দ্রুতি এবং বেগের মধ্যে তফাৎ এই যে দ্রুতি বলিতে কোন দিক্ নির্দেশের প্রয়োজন নাই, শুধু মান বলিলেই চলে ; কিন্তু বেগ বলিতে মান এবং দিক্ নির্দেশ দু'য়েরই প্রয়োজন। উদাহরণ দ্বারা পার্থক্যটি ভাল বোঝা যাইবে।

যদি কোন ট্রেন আকাবাঁকা পথে প্রতি ঘণ্টায় 50 মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে তবে আমরা বলিব যে ট্রেনের সমদ্রুতি (uniform speed) ঘণ্টায় 50 মাইল। আমরা একথা বলিব না যে, ট্রেনটির সমবেগ (uniform velocity) ঘণ্টায় 50 মাইল। কারণ, ট্রেনটি সর্বদা ঘণ্টায় 50 মাইল দূরত্ব অতিক্রম করিতেছে ঠিক, কিন্তু দিকের পরিবর্তন হইতেছে প্রায়ই।

অথবা, ধরা যাউক, কোন বস্তুকণা চক্রাকার পথে এমনভাবে ঘুরিতেছে যে, কোন নির্দিষ্ট সময়ে সে নির্দিষ্ট চাপের দৈর্ঘ্য (length of arc) অতিক্রম করিতেছে। এক্ষেত্রে তাহার দ্রুতি সম কিন্তু একথা বলিতে পারি না যে, তাহার বেগ সম। কারণ, চক্রাকার পথে ঘুরিবার সময় প্রতি মুহূর্তে তাহার দিক পরিবর্তন হইতেছে।

(ঘ) **ত্বরণ** (Acceleration): যখন কোন ট্রেন স্টেশন পরিত্যাগ করে তখন ক্রমশ উহার বেগ বৃদ্ধি পায় এবং পরে একটি নির্দিষ্ট বেগ লইয়া চলিতে থাকে। গতির গোড়ার দিকে যখন ট্রেনটির বেগ বৃদ্ধি পাইতেছিল তখন বলা যাইতে পারে যে, ট্রেনটির একটি ত্বরণ ছিল। যদি কোন বস্তুকণা ক্রমবর্ধমান বেগ লইয়া চলে তবে সময়ের সাপেক্ষে তাহার বেগ পরিবর্তনের হারকে বলা হয় ত্বরণ। একটি উদাহরণ লওয়া যাক্।

ধর, কোন এক মুহূর্তে একটি বস্তুকণার বেগ সেকেণ্ডে 32 ফুট। 10 সেকেণ্ড সময় পরে, তাহার গতি ত্বরান্বিত হইয়া বেগ হইল সেকেণ্ডে 52 ফুট। আরো 10 সেকেণ্ড পরে তাহার বেগ দেখা গেল সেকেণ্ডে 72 ফুট। মনে কর, সে এই ভাবে ক্রমবর্ধমান বেগ লইয়া চলিল। এস্থলে দেখা যাইতেছে যে, প্রতি 10 সেকেণ্ড সময় পর পর বস্তুকণাটি সেকেণ্ডে 20 ফুট পরিমাণ বেগ পরিবর্তন করিতেছে। তাহা হইলে তাহার বেগ পরিবর্তনের হার প্রতি সেকেণ্ডে $\frac{20}{10}=2$ ফুট প্রতি সেকেণ্ডে। সুতরাং ইহাই তাহার ত্বরণ।

এখানে একটি জিনিস লক্ষ্য করিবার আছে। 'প্রতি সেকেণ্ড' কথাটি দুইবার আসিতেছে। একবার বেগ বুঝাইবার জন্য এবং অন্যবার বেগ পরিবর্তনের হার বুঝাইবার জন্য। এই কারণে ত্বরণের একক বলিতে 'প্রতি সেকেণ্ড প্রতি সেকেণ্ড' কথা ব্যবহার করা হয়।

সি. জি. এস্. পদ্ধতিতে ত্বরণের একক হইল 'এক সেন্টিমিটার প্রতি সেকেণ্ড প্রতি সেকেণ্ড' (1/cm/sec/sec)।

এফ্. পি. এস্. পদ্ধতিতে ত্বরণের একক হইল 'এক ফুট প্রতি সেকেণ্ড প্রতি সেকেণ্ড' (1 ft/sec/sec)। মনে রাখিতে হইবে, বেগের ন্যায় ত্বরণও সম বা অসম হইতে পারে।

(ঙ) (**মন্দন** (Retardation or Deceleration): যদি কোন বস্তুকণা ক্রমহ্রসমান বেগ লইয়া চলে তবে তাহার বেগ পরিবর্তনের হারকে মন্দন বলে।) মন্দনকে আমরা ঋণাত্মক (negative) ত্বরণও বলিতে পারি। কোন চলন্ত ট্রেনকে যদি ব্রেক করিয়া থামাইবার চেষ্টা

করা হয় তবে ট্রেনটির বেগ আস্তে আস্তে হ্রাস পায় এবং অবশেষে ট্রেনটি সম্পূর্ণ গতিহীন হয়। এই অবস্থায় বলা যাইতে পারে যে, ট্রেনটির একটি মন্দন সৃষ্টি হইয়াছিল। পূর্বের ন্যায় একটি উদাহরণ লওয়া যাক।

ধর, একটি বস্তুকণার কোন এক মুহূর্তে বেগ দেখা গেল সেকেণ্ডে 32 ফুট। 2 সেকেণ্ড পরে তাহার বেগ হইল সেকেণ্ডে 28 ফুট এবং আরো 2 সেকেণ্ড পরে তাহার বেগ কমিয়া দাঁড়াইল সেকেণ্ডে 24 ফুট। এই রকম বেগ কমিতে থাকিলে বলা হয় বস্তুটির মন্দন হইতেছে। এস্থলে দেখা যাইতেছে, প্রতি 2 সেকেণ্ড সময় পর পর বস্তুটির বেগ কমিতেছে সেকেণ্ডে 4 ফুট করিয়া। সুতরাং প্রতি সেকেণ্ডে তাহার বেগ পরিবর্তিত হইতেছে $\frac{4}{2}=2$ ফুট প্রতি সেকেণ্ডে। অর্থাৎ তাহার মন্দনের পরিমাণ 2 ফুট প্রতি সেকেণ্ড প্রতি সেকেণ্ড। মন্দনের একক ও ত্বরণের একক হুবহু এক।

উদাহরণ: একটি বস্তুকণা স্থিরাবস্থা হইতে চলিতে শুরু করিয়া 4 সেকেণ্ডে 40 ফুট/সেকেণ্ড বেগ সংগ্রহ করিল। বস্তুকণার ত্বরণ কত?

উ। বস্তুকণার বেগ পরিবর্তন = 40 ফুট/সেকেণ্ড এবং তজ্জন্য সময় = 4 সেকেণ্ড

$$\therefore \text{ বস্তুকণার ত্বরণ} = \frac{\text{বেগ পরিবর্তন}}{\text{সময়}} = \frac{40}{4} = 10 \text{ ফুট/সেকেণ্ড/সেকেণ্ড}$$

1. 3. নিউটনের গতিসূত্র (Newton's laws of motion):

1687 খ্রীষ্টাব্দে স্যার আইজাক নিউটন 'প্রিন্সিপিয়া' নামক একখানি গ্রন্থে বস্তুর গতি—বিশেষত গ্রহ ও অন্যান্য জ্যোতিষ্কের গতি—সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন। গ্রন্থের প্রথম ভাগে গতি সম্পর্কিত মূল তথ্যগুলিকে তিনি তিনটি সূত্রের আকারে উপস্থাপিত করেন। এই সূত্রগুলিকে নিউটনের গতিসূত্র বলা হয়। ইহারা গতিবিদ্যার স্তম্ভস্বরূপ।

প্রথম সূত্র: বাহির হইতে প্রযুক্ত বল দ্বারা অবস্থার পরিবর্তন না করিলে স্থির বস্তু চিরকাল স্থির অবস্থাতেই থাকিবে এবং সচল বস্তু সমবেগে সরল রেখা অবলম্বন করিয়া চিরকাল চলিতে থাকিবে।

দ্বিতীয় সূত্র: কোন বস্তুর ভরবেগের (momentum) পরিবর্তনের হার বস্তুটির উপর প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক এবং বল যেদিকে প্রযুক্ত হয় ভরবেগের পরিবর্তনও সেই দিকে ঘটে।

তৃতীয় সূত্র: প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে।

এখন, এই তিনটি সূত্র সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিব।

1.4. প্রথম সূত্রের আলোচনা :

প্রথম সূত্র পর্যালোচনা করিলে আমরা নিম্নলিখিত দুইটি বিষয় জানিতে পারি :—(i) পদার্থের জড়তা (inertia of matter) এবং (ii) বলের সংজ্ঞা।

পদার্থের জড়তা : প্রথম সূত্রে এই কথা বলা হইয়াছে যে, কোন বস্তু যদি স্থির থাকে তাহা হইলে তাহার ধর্মই হইল চিরদিন স্থির থাকা এবং কোন বস্তু যদি গতিশীল হয় তবে তাহার ধর্ম হইল চিরদিন সমবেগে সরলরেখায় গতি বজায় রাখা। জড় পদার্থের এই ধর্ম—অর্থাৎ যে-অবস্থায় তাহাকে রাখা হইল সেই অবস্থাকে বজায় রাখার চেষ্টা—এই ধর্মকে বলে পদার্থের জড়তা।

জড়তাকে দুইভাগে ভাগ করিয়া বলা যাইতে পারে (i) স্থিতি জড়তা (inertia of rest) এবং (ii) গতি-জড়তা (inertia of motion)।

স্থিতি-জড়তা সম্বন্ধে ধারণা করা কিছু কঠিন নয়। কারণ, আমাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতাই হইল এই যে কোন বস্তুকে যদি কোথাও রাখি তবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহাকে ধাক্কা দেওয়া হইতেছে বা ঠেলা দেওয়া হইতেছে—অর্থাৎ বাহ্যিক বল প্রয়োগ করা হইতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত সে ঐ জায়গাতেই থাকিবে। হঠাৎ বস্তুটি চলিতে আরম্ভ করে না। সুতরাং সাধারণ বুদ্ধি দ্বারা স্থিতি-জড়তা বোঝা খুবই সহজ।

কিন্তু কোন বস্তুকে যদি মাটিতে গড়াইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে বস্তুটি কিছুক্ষণ পরে থামিয়া যায়। তাহা হইলে বস্তুটি চিরদিন গতিশীল হইল কি করিয়া? গতি-জড়তার সত্যতা প্রমাণিত হইল কোথায়? এখানে একটা কথা আমরা ধরি নাই। সেটা হইতেছে, বস্তুটি মাটিতে গড়াইবার সময় বাহ্যিক বলের দ্বারা প্রভাবিত হইতেছে। মাটির সহিত ঘর্ষণ, বায়ুর বাধা প্রভৃতি বাহ্যিক বল বস্তুটির উপর কাজ করে বলিয়া বস্তুটি কিছুক্ষণ পরে থামিয়া যায়। মাটিতে একটি বল গড়াইয়া দিলে যতটা যাইবে মসৃণ মেঝে বা বরফের উপর তাহা অপেক্ষা বেশী যাইবে। কারণ মসৃণ মেঝে বা বরফের ঘর্ষণ-বাধা মাটি অপেক্ষা কম। সুতরাং এইসব বাহ্যিক বল সম্পূর্ণ অপসারণ করিলে বস্তু সর্বদা গতি বজায় রাখিবে। এইভাবে আমরা গতি-জড়তা ধারণা করিয়া লইতে পারি।

স্থিতি জড়তার দৃষ্টান্ত : (ক) যখন যাত্রীপূর্ণ কোন স্থির গাড়ী হঠাৎ বেগে চলিতে আরম্ভ করে তখন প্রত্যেক যাত্রীই পিছন দিকে হেলিয়া পড়ে।

ইহা স্থিতি-জড়তার একটি দৃষ্টান্ত। গাড়ি যখন স্থির তখন যাত্রীর দেহও স্থির। হঠাৎ গাড়ী চলিলে দেহের নিম্নাংশ গাড়ীর সহিত সংলগ্ন বলিয়া গতিশীল হয় কিন্তু ঊর্ধ্বাংশ স্থিতি-জড়তার দরুণ স্থির থাকিতে চেষ্টা করে। ফলে, যাত্রী পিছন দিকে হেলিয়া পড়ে।

(খ) একটি খাড়া দণ্ডের মাথায় একটি বাটি বসানো আছে [চিত্র 3]। বাটির উপর একটি শক্ত কার্ড রাখিয়া একটি বল কার্ডটির উপর বসানো হইল। এখন, একটি স্প্রিং-কে টানিয়া ছাড়িয়া দিলে স্প্রিং কার্ডকে সজোরে আঘাত করিয়া সরাইয়া দিবে কিন্তু বলটিকে বাটির ভিতর পড়িতে দেখা যাইবে। ইহাও স্থিতি জড়তার দৃষ্টান্ত। কার্ড হঠাৎ আঘাত পাইয়া এত শীঘ্র সরিয়া যায় যে বলটির স্থিতি-জড়তা নষ্ট হইতে পারে না। ফলে, পূর্বের

চিত্র 3
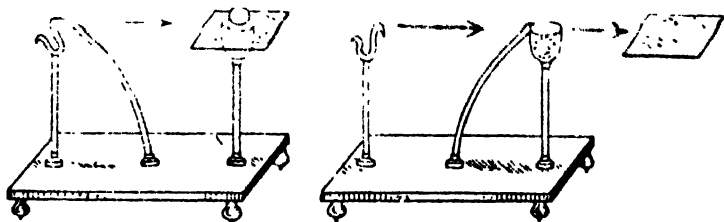
স্থির বল পরেও স্থির থাকে কিন্তু নীচে কোন কার্ড না থাকায় বলটি বাটির ভিতর গিয়া পড়ে। কিন্তু কার্ডকে আস্তে আঘাত করিলে বলটি বাহিরে পড়িয়া যাইবে।

গতি-জড়তার দৃষ্টান্ত : (ক) যখন চলন্ত গাড়ী হইতে আরোহী অসাবধানে নামে তখন তাহাকে সামনের দিকে পড়িয়া যাইতে দেখা যায়। ইহা গতি-জড়তার দরুণ ঘটে। চলন্ত গাড়ীতে থাকার ফলে আরোহীর সমস্ত দেহই গতিশীল। কিন্তু মাটিতে পা দিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার দেহের নিম্নাংশ স্থির হয় কিন্তু গতি-জড়তার দরুণ তাহার দেহের ঊর্ধ্বাংশ গতি বজায় রাখিতে চেষ্টা করে। এই কারণে ঝোঁক সামলাইবার জন্য প্রত্যেক যাত্রীকে নামিবার সময় একটু পিছন দিকে হেলিতে হয়। অসাবধানে নামিলেই সে সম্মুখের দিকে পড়িয়া যাইতে পারে।

(খ) চলন্ত গাড়ীর কামরায় কোন আরোহী যদি একটি বল-কে সোজা উপরে ছুঁড়িয়া দেয় তবে কিছুক্ষণ পরে বলটি আবার তাহার হাতে আসিয়া পড়ে—যদিও ইতিমধ্যে আরোহী সামনের দিকে খানিকটা আগাইয়া যায়। ইহাও গতি-জড়তার দৃষ্টান্ত। বলটি গাড়ীর ভিতরে থাকায় গতি-জড়তার দরুণ বল গাড়ীর গতি বজায় রাখে এবং ছুঁড়িয়া দিলেও উহা গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাকে।

1.5. বল (Force) :

প্রথম সূত্র হইতে আমরা জানিতে পারি, কোন বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন করিতে হইলে বাহির হইতে বস্তুটির উপর বল আরোপ করিতে হয়। স্থির বস্তুকে সচল করিতে বা সচল বস্তুকে স্থির অবস্থায় আনিতে বা জোরে কিংবা আস্তে চালাইতে হইলে বাহ্যিক বল প্রয়োগ না করিলে হয় না। বস্তু নিজ হইতে চলিতে পারে না বা স্থির হইতে পারে না।

সংজ্ঞা : বাহির হইতে যাহা প্রয়োগ করিয়া বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন করা হয় বা পরিবর্তন করিবার চেষ্টা করা হয় তাহাকে **বল** বলে।

বল একটি ভেক্টর রাশি ; কারণ ইহার মান ও অভিমুখ দুই-ই আছে।

1.6. দ্বিতীয় সূত্রের আলোচনা :

দ্বিতীয় সূত্র হইতে আমরা বলের পরিমাপ (measurement of force) এবং বল ও ত্বরণের বা মন্দনের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে পারি। দ্বিতীয় সূত্র আলোচনা করিবার পূর্বে **ভরবেগ** (momentum) সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন।

ভরবেগের সংজ্ঞা : ভর ও বেগের সমন্বয়ে কোন গতিশীল বস্তুতে যে পরিমাণ গতির (quantity of motion) উৎপত্তি হয় তাহাকে ভরবেগ বলে এবং ইহা বস্তুর ভর ও বেগের গুণফলের সমান।

যদি কোন বস্তুর ভর 'm' এবং বেগ 'v' তবে উহার ভরবেগ$=m\times v$. একটি 2000 পাউণ্ড ভরের মোটর গাড়ী যদি 44 ফুট/সেকেণ্ড বেগে দৌড়ায় তবে উহার ভরবেগ$=2000\times 44=88,000$ পাউণ্ড-ফুট সেকেণ্ড।

একটি উদাহরণ লইলে ভরবেগ সম্বন্ধে ধারণা সুস্পষ্ট হইবে। ধরা যাক্ একটি মোটর গাড়ী ঘণ্টায় 20 মাইল বেগে চলিতেছে। গাড়টিকে থামাইতে কিছু বলের প্রয়োজন। যদি একই বেগে একটি মালভর্তি লরী চলে তবে উহাকে থামাইতে আরো বেশী বলের প্রয়োজন, কারণ লরীটির ভর অনেক বেশী। যদি পূর্বোক্ত মোটর গাড়ীটি দ্বিগুণ বেগে চলে, তবে তাহাকে থামাইতে পূর্বোক্ত বলের দ্বিগুণ বল লাগিবে। লরীর বেলাতেও ঐ একই কথা। একটি ভারী ও একটি হালকা বস্তুর উপর যদি একই বল একই সময় ধরিয়া ক্রিয়া করে, তবে হালকা বস্তুর গতিবেগ ভারী বস্তুর গতিবেগ অপেক্ষা বেশী হইবে কিন্তু উহাদের ভরবেগ সমান হইবে।

সুতরাং গতিশীল বস্তুর গতির পরিমাপ—যাহা তাহার সম্মিলিত গতি ও ভরের উপর নির্ভর করে—তাহাকেই বলা হয় ভরবেগ।

বলের পরিমাপ (Measurement of force): স্থির বেগে চলন্ত কোন বস্তুর উপর যদি বল প্রয়োগ করা যায়, তবে বলের অভিমুখ অনুযায়ী বস্তুর গতিবেগ বৃদ্ধি পাইতে পারে অথবা হ্রাস হইতে পারে—অর্থাৎ বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তন হইতে পারে। দ্বিতীয় সূত্র হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ভরবেগের এই পরিবর্তন প্রযুক্ত বলের উপর নির্ভর করে। তাছাড়া, বল যে-অভিমুখে ক্রিয়া করে, ভরবেগের পরিবর্তনও সেই অভিমুখে ক্রিয়া করে।

মনে কর, কোন বস্তুর ভর 'm' এবং ইহা u বেগে চলিতেছে। এখন 't' সময় ধরিয়া বস্তুর উপর P বলপ্রয়োগ করা হইলে বস্তুতে একটি ত্বরণ সৃষ্টি হইবে এবং উহার বেগ পরিবর্তিত হইবে। ধর, t সময় পরে উহার বেগ হইল 'v' এবং বস্তুর ত্বরণ f.

এখন, বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তন $= mv - mu = m(v-u) =$ ভর $\times$ বেগের পরিবর্তন

এই ভরবেগের পরিবর্তনের হার $= \dfrac{\text{ভর} \times \text{বেগের পরিবর্তন}}{\text{সময়}}$

$=$ ভর $\times$ ত্বরণ $= m \times f$

এখন, দ্বিতীয় সূত্র হইতে আমরা জানি, $P \propto$ ভরবেগের পরিবর্তনের হার $\propto mf$.

$\therefore \quad P = k.m.f$ [k একটি ধ্রুবরাশি।]

এখন যদি ধরিয়া লই যে, একক ভরের উপরি ক্রিয়া করিয়া একক ত্বরণ সৃষ্টি করিতে পারে যে বল, তাহাই বলের একক, অর্থাৎ $P=1$, যখন $m=1$ এবং $f=1$, তাহা হইলে $k=1$.

বলের এককের উপরোক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী আমরা পাই, **বল = ভর × ত্বরণ।** ইহাই বলের মান নির্দেশক সমীকরণ।

এই সমীকরণ হইতে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলিও জানিতে পারি :

(ক) যদি কোন বল P কোন গতিশীল ভর 'm'-এর উপর এমনভাবে ক্রিয়া করে যে বলের অভিমুখ এবং ভরের গতির অভিমুখ একই, তবে বস্তুটির গতি ত্বরান্বিত হইবে এবং ত্বরণ $f = \dfrac{P}{m}$.

(খ) যদি কোন বল কোন গতিশীল ভর m-এর উপর এমনভাবে ক্রিয়া করে যে, বলের অভিমুখ এবং ভরের গতির অভিমুখ বিপরীত, তবে বস্তুটির গতি মন্দীভূত হইবে এবং মন্দন $f = \dfrac{P}{m}$.

1.7. বিভিন্ন পদ্ধতিতে বলের একক (Units of force in different systems) :

সি. জি. এস্. পদ্ধতিতে বলের একক-কে বলা হয় **ডাইন** (dyne)। এক ডাইন এমন বল যে এক গ্র্যাম ভরের উপর ক্রিয়া করিয়া 1 সেন্টিমিটার প্রতি সেকেণ্ড প্রতি সেকেণ্ড ত্বরণ উৎপন্ন করে।

এফ্. পি. এস্. পদ্ধতিতে বলের একক-কে বলা হয় **পাউণ্ডাল** (poundal)। এক পাউণ্ডাল এমন বল যে, এক পাউণ্ড ভরের উপর ক্রিয়া করিয়া 1 ফুট প্রতি সেকেণ্ড প্রতি সেকেণ্ড ত্বরণ উৎপন্ন করে।

মনে রাখিবে, 1 পাউণ্ডাল=13,800 ডাইন (প্রায়)।

উদাহরণ : 175 গ্র্যাম ভরের একটি বস্তুর উপর 500 ডাইন বল প্রয়োগ করিলে বস্তুটির কত ত্বরণ উৎপন্ন হইবে ?

উ। আমরা জানি, বল=বস্তুর ভর × বস্তুর ত্বরণ।

$\therefore$ বস্তুর ত্বরণ $=\dfrac{\text{বল}}{\text{বস্তুর ভর}}=\dfrac{500}{175}=2{\cdot}86$ সে. মি./সেকেণ্ড/সেকেণ্ড

1.8. তৃতীয় সূত্রের আলোচনা :

ধরা যাউক, A এবং B দুইটি বস্তু। যদি A বস্তু B বস্তুর উপর বল-প্রয়োগ করে, তবে তৃতীয় সূত্রানুযায়ী B বস্তু A বস্তুর উপর সমান ও বিপরীত-মুখী বল প্রয়োগ করিবে। A বস্তু দ্বারা প্রযুক্ত বলকে **ক্রিয়া** বলিলে B দ্বারা প্রযুক্ত বলকে বলা হইবে **প্রতিক্রিয়া**।
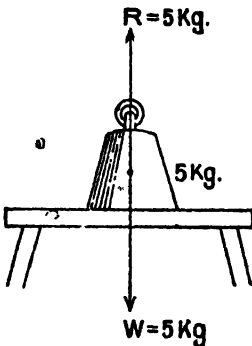
চিত্র 4

মনে কর, টেবিলের উপর 5 কিলোর একটি ওজন রাখা আছে। ওজনটি টেবিলের উপর নিম্নাভিমুখী 5 kg. বল প্রয়োগ করিবে (চিত্র 4)। ইহা ওজন কর্তৃক টেবিলের উপর ক্রিয়া (W)। টেবিলও ওজনের উপর ঊর্ধ্বাভিমুখী 5 kg বল প্রয়োগ করিবে। ইহা ওজনের উপর টেবিলের প্রতিক্রিয়া (R)।

ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সমান ও বিপরীত তাহা প্রদর্শন করাইবার জন্য একটি সহজ পরীক্ষা করা যাইতে পারে। দুইটি স্প্রিং তুলা লইয়া একটির হুকের সহিত অপরটির হুক আটকাও এবং স্প্রিং তুলা দুইটিকে হাত দিয়া সমানভাবে বিপরীতমুখী টান দাও। বলা বাহুল্য, স্প্রিং তুলা দুইটির কাঁটা সমান পাঠ

দেখাইবে। ধর, এই পাঠ হইল 5 পাউণ্ড [চিত্র 5(a)]। এইবার একটি তুলাকে কোন দৃঢ় অবলম্বনে, ধর, দেওয়ালের সঙ্গে আটকাইয়া অন্য তুলাতে
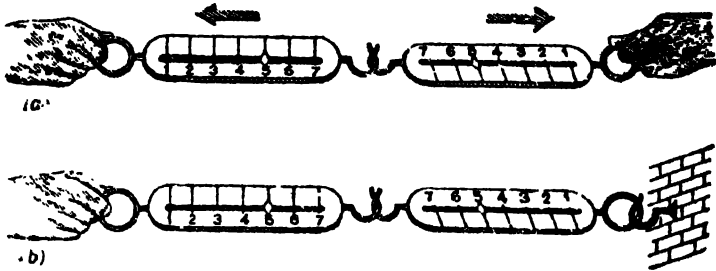
চিত্র 5

আগের মতন সমান টান প্রয়োগ কর। এবারও দেখিবে, দুইটি স্প্রিং তুলাই পূর্বের ন্যায় 5 পাউণ্ড টান দেখাইতেছে [চিত্র 5(b)]। যেন, দেওয়ালে আটকানো স্প্রিং তুলাকে পূর্বের ন্যায় কেহ হাতে ধরিয়া সমান ভাবে টানিতেছে। এক্ষেত্রে দেওয়ালের সঙ্গে আটকানো স্প্রিং তুলাতে প্রতিক্রিয়া পড়িতেছে এবং উভয়ের পাঠ সমান হওয়ায় প্রমাণ হইতেছে, প্রতিক্রিয়া ও ক্রিয়া সমান এবং বিপরীত।

ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে একটি কথা সর্বদা মনে রাখিতে হইবে। যতক্ষণ ক্রিয়া স্থায়ী হয় ততক্ষণ প্রতিক্রিয়াও স্থায়ী হয়। ক্রিয়া না থাকিলে প্রতিক্রিয়া থাকিতে পারে না।

তৃতীয় সূত্রের বহু দৃষ্টান্ত আমাদের প্রতিনিয়ত দৃষ্টিগোচর হয়। দু'একটি দৃষ্টান্ত আলোচনা করা যাউক।

(ক) যখন কোন আরোহী নৌকা হইতে লাফাইয়া তীরে পৌঁছায় তখন নৌকাটি পিছনে হটিয়া যায়। আরোহী নৌকার উপর যে-বল প্রয়োগ করে তাহার ফলে নৌকাটি পিছনে সরে এবং নৌকা আরোহীর উপর যে সমান ও বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তাহার ফলে আরোহী তীরে পৌঁছায়।

(খ) যখন বন্দুক হইতে গুলী ছোড়া হয় তখন যে বন্দুক ছোড়ে সে পিছনদিকে ধাক্কা অনুভব করে। ইহা গুলী কর্তৃক বন্দুকের উপর প্রতিক্রিয়ার ফল।

(গ) হাউই বা রকেটের গতি প্রতিক্রিয়া বলের জন্য সম্ভব হয়। হাউই বা রকেটের কিছু জ্বালানী রাখা হয়। ঐ জ্বালানী দহনের ফলে উচ্চ চাপের গ্যাস উৎপন্ন হইয়া একটি সরু নালী-মুখ দিয়া নিচের দিকে সজোরে বাহির

হইয়া আসে। ইহার ফলে যে প্রচণ্ড বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন হয় তাহাই হাউই বা রকেটকে তীব্রবেগে উর্ধ্বে আকাশের দিকে চালিত করে।

প্রশ্নাবলী

1. নিম্নলিখিত রাশিগুলির সংজ্ঞা এবং একক লেখ: (ক) দ্রুতি, (খ) বেগ, (গ) ত্বরণ, (ঘ) মন্দন।

2. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর লেখ :—

(ক) দ্রুতি ও বেগের মধ্যে পার্থক্য কি ?

(খ) ত্বরণের এককে 'সময়' দুইবার উল্লেখ করিতে হয় কেন ?

(গ) মন্দনকে ঋণাত্মক ত্বরণ বলা হয় কেন ?

3. একটি বস্তুকণা 5 ফুট/সেকেণ্ড গতিবেগ লইয়া 5 মিনিট চলিল। সে কত দূরত্ব অতিক্রম করিবে ? [উঃ 1500 ফুট]

4. দুইটি সমান্তরাল রেললাইন দিয়া দুইটি ট্রেন একই বেগে একই দিকে যাইতেছে। ট্রেন দুইটির মুখোমুখী দুই কামরার দুইজন যাত্রী পরস্পরকে কিরূপ গতিশীল দেখিবে ?

5. নিউটনের গতিসূত্র বিবৃত কর।

6. কিভাবে প্রথম সূত্র হইতে বলের সংজ্ঞা এবং দ্বিতীয় সূত্র হইতে বলের পরিমাপ পাওয়া যায় ব্যাখ্যা কর।

7. পদার্থের জড়তা বলিতে কি বোঝ ? উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা কর। চলন্ত গাড়ী হইতে নামিবার সময় একটু পশ্চাতে হেলিতে হয় কেন ?

8. বলের সংজ্ঞা লেখ এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে বলের এককগুলি বুঝাইয়া বল।

9. 50 গ্র্যাম ভরের একটি বস্তুর উপর বলপ্রয়োগ করিলে উহা 5 সেন্টি-মিটার/সেকেণ্ড/সেকেণ্ড ত্বরণ লইয়া চলিতে সুরু করে। বলের পরিমাণ কি ছিল ? [উঃ 250 ডাইন]

10. ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কাহাকে বলে ? উহারা কি একই বস্তুর উপর প্রযুক্ত হয় ? ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পরস্পরের সমান ও বিপরীত ইহা কিরূপে প্রমাণ করিবে ?

11. নিম্নে কতকগুলি উক্তি করা হইল। যেটি শুদ্ধ তাহার পাশে C এবং যেটি অশুদ্ধ তাহার পাশে W বসাও।

(ক) মন্দনের মান ও অভিমুখ থাকায় ইহা একটি ভেক্টর রাশি।—

(খ) গাছপালা, বাড়ীঘর যাহা আমরা স্থির দেখি তাহা পরমস্থিতি।—

(গ) চক্রাকারে পরিভ্রমণরত কোন বস্তুর গতিবেগ সমগতিবেগের দৃষ্টান্ত।—

(ঘ) ভর ও বেগের গুণফলে আমরা যাহা পাই তাহাকে বস্তুর ভরবেগ বলে।—

(ঙ) ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া সাম্য অবস্থার সৃষ্টি করিতে পারে।—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কার্য, ক্ষমতা এবং শক্তি
(Work, Power and Energy)

2.1. কার্য (Work):

আমাদের জীবনযাত্রায় কার্যের উদাহরণ আমরা সর্বদাই দেখিতে পাই। যখন কুলীরা মোট বহন করে, ঘোড়া বা গরু গাড়ী টানে, মালী কূয়া হইতে জল তোলে, মাঝি দাঁড় বাহিয়া নৌকা চালায়, মানুষ হাঁটিয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে যায়, তখন তাহারা প্রত্যেকেই কিছু কার্য করে। প্রকৃতপক্ষে আমরা সব সময়ই কিছু-না-কিছু কার্য করিতেছি। সাধারণ ভাবে কার্য বলিতে আমরা এমন কিছু বুঝি যাহার ফলে দৈহিক ক্লান্তি বা অবসাদ ঘটে। কিন্তু বিজ্ঞানের ভাষায় 'কার্য' কথাটির একটু অন্য অর্থ আছে। নিম্নের উদাহরণে তাহা স্পষ্ট হইবে।

মনে কর, একদল রাজমিস্ত্রী বাড়ী তৈয়ার করিবার জন্য মাথায় করিয়া ইঁট বহন করিয়া উচ্চে তুলিতেছে। এস্থলে দুইজন মিস্ত্রীর কার্যের পরিমাণ যদি তুলনা করিতে হয় তবে স্বভাবতই মনে হয় যে-মিস্ত্রী বেশী সংখ্যায় ইঁট তুলিল সে-ই বুঝি বেশী কার্য করিল। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। যদি কোন মিস্ত্রী 100 খানা ইঁট 40 ফুট উচ্চে তোলে এবং অন্য মিস্ত্রী ঐ 100 খানা ইঁট 20 ফুট উচ্চে তোলে তবে প্রথম জন দ্বিতীয় জন অপেক্ষা দ্বিগুণ কার্য করিল।

সুতরাং উপরোক্ত কার্যের পরিমাপ করিতে গেলে দুইটি জিনিসের প্রয়োজন হইতেছে—যে-দ্রব্য তোলা হইতেছে তাহার ওজনকে কাটাইবার জন্য প্রদত্ত বল (force) এবং যতদূর তোলা হইতেছে সেই দূরত্ব (distance)। প্রকৃতপক্ষে যে-কোন কার্যের পরিমাপ করিতে গেলে যতটা বল প্রযুক্ত হইতেছে এবং বলের প্রয়োগ-বিন্দু (point of application) বলের অভিমুখে যতটা সরিয়া যাইতেছে তাহার গুণফল নির্ণয় করিতে হইবে।

সংজ্ঞা: কোন বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করিলে যদি বলের প্রয়োগ-বিন্দুর স্থানচ্যুতি হয়, তাহা হইলে প্রযুক্ত বল কার্য করিয়াছে বলা হয় এবং প্রযুক্ত বল ও বলের অভিমুখে বলের প্রয়োগবিন্দুর সরণের গুণফল দ্বারা কৃত কার্যের পরিমাপ করা হয়। অর্থাৎ

কৃতকার্য = প্রযুক্ত বল × বলের অভিমুখে বলের প্রয়োগ-বিন্দুর সরণ

এই সংজ্ঞা হইতে বোঝা যাইতেছে যে, প্রযুক্ত বল যতই হউক না কেন, বলের প্রয়োগবিন্দুর কোন সরণ না হইলে পদার্থ-বিজ্ঞান অনুযায়ী কোন কার্যই করা হইল না। যেমন, বিরাট এক পাথরখণ্ডকে যতই ধাক্কা দিয়া সরাইবার চেষ্টা করিয়া গলদঘর্ম হওয়া যাউক না কেন, পাথরখণ্ড না সরিলে কোন কার্য করাই হইবে না। যদিও সাধারণভাবে আমরা বলিব যে পাথরখণ্ডকে সরাইবার জন্য যথেষ্ট কাজ করা হইয়াছে।

এখন, যদি বলের প্রয়োগবিন্দু বলের অভিমুখে সরিয়া যায় তবে বলা হয় যে বল কার্য করিয়াছে। যেমন, কিছু উপর হইতে যদি কোন বস্তুকে ফেলা যায় তবে বস্তুটি পৃথিবী কর্তৃক আকর্ষিত হইয়া নিচের দিকে পড়ে। এস্থলে পৃথিবীর আকর্ষণ বল যে-দিকে কার্য করিতেছে বস্তুটিও সেইদিকে সরিতেছে। সুতরাং বলা যাইতে পারে পৃথিবীর আকর্ষণ বল কার্য করিয়াছে।

কিন্তু যদি বলের প্রয়োগবিন্দু বলের অভিমুখের বিপরীত দিকে সরিয়া যায় তবে বলা হয় যে বলের বিরুদ্ধে কার্য করা হইয়াছে। যেমন, কোন ভারী বস্তুকে কিছু উপরে তুলিতে হইলে যে কার্য করা হইবে তাহা পৃথিবীর আকর্ষণ বলের বিরুদ্ধে করা হইবে।

2.2. কার্যের বিভিন্ন একক :

(i) **পরম একক** (Absolute unit) : সি. জি. এস্. পদ্ধতিতে কার্যের পরম একক **আর্গ** (erg)। 1 ডাইন বল প্রয়োগ করিলে যদি বলের প্রয়োগবিন্দু বলের অভিমুখে 1 সে. মি. সরিয়া যায়, তবে যে-কার্য করা হয় তাহাকে আর্গ বলে।

এফ্. পি. এস্. পদ্ধতিতে কার্যের পরম একক **ফুট-পাউণ্ডাল** (foot-poundal)। 1 পাউণ্ডাল বল প্রয়োগ করিলে বলের প্রয়োগ-বিন্দু বলের অভিমুখে 1 ফুট সরিয়া গেলে যে-কার্য করা হয় তাহাকে ফুট-পাউণ্ডাল বলে।

(ii) **অভিকর্ষীয় একক** (Gravitational unit) : সি. জি. এস্. পদ্ধতিতে কার্যের অভিকর্ষীয় একক **গ্র্যাম সেন্টিমিটার** (Gram-centimetre)। 1 গ্র্যাম ভরের বস্তুকে পৃথিবীর আকর্ষণের বিরুদ্ধে 1 সে. মি. উচ্চে তুলিতে যে-কার্য করা হয়, তাহাই গ্র্যাম-সেন্টিমিটার।

মনে রাখিবে, 1 গ্র্যাম-সেন্টিমিটার = 981 আর্গ।

এফ্. পি. এস্. পদ্ধতিতে কার্যের অভিকর্ষীয় এককের নাম

ফুট-পাউণ্ড (foot-pound)। 1 পাউণ্ড ভরের বস্তুকে পৃথিবীর আকর্ষণের বিরুদ্ধে 1 ফুট উচ্চে তুলিতে যে-কার্য করা হয়, তাহাকে ফুট-পাউণ্ড বলে।

মনে রাখিবে, 1 ফুট-পাউণ্ড=32 ফুট-পাউণ্ডাল।

(iii) **ব্যবহারিক একক** (Practical unit) : সি. জি. এস্. পদ্ধতিতে কার্যের পরম একক 'আর্গ' প্রায় সর্বত্রই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কোন কোন সময় 'আর্গ' খুব ছোট একক হওয়ায় ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আর একটি বড় এককের প্রচলন আছে। এই একক-কে কার্যের ব্যবহারিক একক বলে। ইহার নাম **জুল** (joule)।

মনে রাখিবে, 1 জুল $=10^7$ আর্গ।

আমরা জানি, 1 ফুট-পাউণ্ডাল=1 পাউণ্ডাল × 1 ফুট

এখন, 1 পাউণ্ডাল=13800 ডাইন (প্রায়) এবং 1 ফুট=30·48 সে. মি.

কাজেই, 1 ফুট-পাউণ্ডাল $=13800\times30{\cdot}48$ আর্গ $=4{\cdot}2\times10^5$ আর্গ

তাছাড়া, 1 ফুট-পাউণ্ড = 33 ফুট-পাউণ্ডাল

$=32\times4{\cdot}2\times10^5$ আর্গ $=1{\cdot}35\times10^7$ আর্গ (প্রায়)

$=1{\cdot}35$ জুল

2.3. ক্ষমতা (Power) :

সংজ্ঞা : কাজ করিবার হার-কে ক্ষমতা বলে।

ধর, দুইজন মালী কুয়া হইতে বালতি করিয়া জল তুলিতেছে। যে মালী বেশী ক্ষমতাশালী সে কোন নির্দিষ্ট সময়ে বেশী বালতি জল তুলিবে—অর্থাৎ ক্ষমতাশালী লোক নির্দিষ্ট সময়ে বেশী কাজ করিবে। সুতরাং ক্ষমতা পরিমাপ করা হয় কত কাজ করা হইল এবং তাহার জন্য কত সময় লাগিবে—এই দুইয়ের অনুপাত দ্বারা। ক্ষমতা $(P)=\dfrac{\text{কৃত কার্য }(W)}{\text{সময় }(t)}$

2.4. ক্ষমতার বিভিন্ন একক :

(i) **পরম একক** (Absolute units) : সি. জি. এস্. পদ্ধতিতে ক্ষমতার পরম একক 1 আর্গ প্রতি সেকেণ্ড-অর্থাৎ, এক সেকেণ্ড সময়ে যে এক আর্গ কার্য করিতে পারে তাহার ক্ষমতাকে সি. জি. এস্. পদ্ধতিতে একক ধরা হয়।

এফ্. পি. এস্. পদ্ধতিতে ক্ষমতার পরম একক 1 ফুট-পাউণ্ডাল প্রতি সেকেণ্ড—অর্থাৎ এক সেকেণ্ডে এক ফুট-পাউণ্ডাল কার্য করিতে পারিলে সেই ক্ষমতাকে এফ্. পি. এস্. পদ্ধতিতে একক ধরা হয়।

(ii) ব্যবহারিক একক (Practical units) :

সি. জি. এস্. পদ্ধতিতে এই এককের নাম ওয়াট (Watt)

এক সেকেণ্ডে এক জুল কার্য করিতে পারিলে সেই ক্ষমতাকে ওয়াট বলা হয়।

∴ 1 ওয়াট=1 জুল/সেকেণ্ড=10^7 আর্গ/সেকেণ্ড

কোন কোন ক্ষেত্রে আর একটি বড় একক ব্যবহার করা হয়। তাহার নাম কিলোওয়াট (Kw.)। 1 কিলোওয়াট=1000 ওয়াট।

সাধারণত বৈদ্যুতিক যন্ত্রের ক্ষমতা ওয়াট একক দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

এফ্. পি. এস্ পদ্ধতিতে ক্ষমতার ব্যবহারিক এককের নাম হর্স পাওয়ার (Horse-power) বা অশ্ব-ক্ষমতা। ইহা প্রতি সেকেণ্ডে 550 ফুট-পাউণ্ড কার্য বুঝায়। অর্থাৎ, যদি কোন ব্যক্তি বা যন্ত্র 550 পাউণ্ড ওজনকে প্রতি সেকেণ্ডে অভিকর্ষের বিরুদ্ধে খাড়া 1 ফুট তুলিতে পারে তাহার ক্ষমতাকে বলা হয় 1 হর্স পাওয়ার।

1 এইচ. পি.=550 ফুট-পাউণ্ড/সেকেণ্ড।

মনে রাখিবে, 1 এইচ. পি.=746 জুল/সেকেণ্ড=746 ওয়াট (প্রায়)।

2.5. শক্তি (Energy) :

সাধারণভাবে যে-মানুষ যত বেশী কার্য করিতে পারে আমরা তাহাকে তত শক্তিমান বলিয়া থাকি। প্রকৃতপক্ষে পদার্থ বিজ্ঞান অনুযায়ী, যাহাই কাজ করিতে পারে তাহারই কিছু শক্তি আছে বলিয়া ধরা হয়।

সংজ্ঞা : কোন বস্তুর কার্য করিবার সামর্থ্যকে তাহার শক্তি বলে।

বস্তুর শক্তির পরিমাপ করা হয় সে কতখানি কার্য করিতে পারে তাহা দ্বারা। বস্তুর শক্তি ও কার্য একই ধরণের জিনিস এবং একই একক দ্বারা উভয়কে প্রকাশ করা হয়।

পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে শক্তিকে মোটামুটি সাতভাগে ভাগ করা যায়। ইহাদের মধ্যে যান্ত্রিক শক্তি বর্তমানে আমাদের আলোচ্য বিষয়। যান্ত্রিক শক্তিকে দুইভাগে ভাগ করা যায়—(i) **গতিশক্তি** (Kinetic energy) ও **স্থিতিশক্তি** (Potential energy)।

2.6. গতিশক্তি (Kinetic energy) :

তীব্র স্রোতযুক্ত পাহাড়ী নদী লক্ষ্য করিলে দেখা দেখা যায়, জলস্রোতের সঙ্গে সঙ্গে পাথরের টুকরা গড়াইয়া যাইতেছে। পাথরের টুকরাকে গড়াইবার

জন্য কিছু কাজ করা প্রয়োজন। জল এই কাজ সম্পাদন করে। কিন্তু কিছু কাজ সম্পন্ন করার মত শক্তি জল কোথা হইতে পায় ? জল এই শক্তি সংগ্রহ করে তাহার গতি (motion) হইতে।

বায়ু-প্রবাহ পালে লাগাইয়া নৌকা চালানো হয়, তাহা তোমরা জান। জলের বাধাকে অতিক্রম করিয়া নৌকা চালাইতে কিছু কাজ করা প্রয়োজন। বায়ু-প্রবাহ এই কাজ করে। কিন্তু বায়ু কাজ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি পায় কিরূপে ? বায়ু এই শক্তি সংগ্রহ করে প্রবাহ বা গতি হইতে।

বন্দুক হইতে গুলী ছুড়িলে গুলী কাচ ভেদ করিয়া যাইতে পারে ; অর্থাৎ, কিছু কাজ করিতে পারে। কিন্তু গুলীটিকে কাচের সহিত ঠেকাইয়া রাখিলে গুলী ঐরূপ কোন কাজ করিতে পারে না। সুতরাং গতিশীল অবস্থায় গুলী কাজ করিবার প্রয়োজনীয় শক্তি লাভ করে।

সংজ্ঞা : যে-কোন গতিশীল বস্তু তাহার গতির জন্য কিছু শক্তি পায়। এই শক্তিকে গতিশক্তি বলে।

বস্তুর গতিশক্তি $= \frac{1}{2} \times$ বস্তুর ভর $\times$ (গতিবেগ $)^2$

2.7. স্থিতিশক্তি (Potential energy) :

তোমরা খেলনার মোটর গাড়ী দেখিয়াছ। দম দিলে উহা চলিতে শুরু করে। গাড়ীর ভিতরে একটি স্প্রিং থাকে। দম দিলে স্প্রিংটি সংকুচিত হইয়া ছোট হয় এবং ছাড়িয়া দিলে প্যাঁচ খুলিয়া পুনরায় আগের অবস্থায় ফিরিয়া আসে। স্প্রিংয়ের সহিত মোটর গাড়ীর চাকার এমনভাবে সংযোগ থাকে যে স্প্রিংটি প্যাঁচ খুলিয়া আগেকার অবস্থায় ফিরিয়া আসিবার সময় চাকা ঘুরাইয়া গাড়ীটিকে চালায়। স্প্রিংটি স্বাভাবিক অবস্থায় আসিলে আর চাকা ঘুরাইতে পারে না—মোটর গাড়ীও আর চলে না। সুতরাং ইহা হইতে বোঝা যায়, স্বাভাবিক অবস্থা হইতে পরিবর্তিত করিয়া স্প্রিংটিকে সংকুচিত করিবার ফলে স্প্রিং কিছু কাজ করিবার শক্তি পায়।

ধর, মাটিতে একটি পেরেক অল্প পোঁতা আছে। এখন একটি হাতুড়িকে কিছু উপরে উঠাইয়া পেরেকের উপরে ফেলিলে পেরেক মাটিতে আরো পুঁতিয়া যাইবে। কিন্তু পেরেকের মাথায় হাতুড়ি ছোঁয়াইয়া রাখিলে পেরেক মাটিতে ঢুকিবে না। এখন, পেরেক মাটিতে পুঁতিয়া যাওয়ার অর্থ কিছু কাজ সম্পন্ন হওয়া। হাতুড়ি এই কাজ করে। কিন্তু হাতুড়ি এই কাজ করিবার শক্তি সংগ্রহ করে তখনই যখন হাতুড়িকে কিছু উঁচুতে তোলা হয়।

সংজ্ঞা : স্বাভাবিক (standard) অবস্থা হইতে পরিবর্তন করিয়া কোন বস্তুকে অন্য অবস্থায় আনিলে সে কিছু শক্তি সঞ্চয় করে। বস্তুর স্থিতির জন্য এই যে শক্তি সঞ্চিত হয় তাহাকে উহার স্থিতিশক্তি বলে।

বিভিন্ন প্রকারের যন্ত্র

2.8. সূচনা (Introduction) :

কার্য যত কঠিন হয় মানুষ তত তাহার বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া সেই কার্যকে সহজ করিবার উপায় উদ্ভাবন করে। ইহার ফলে নানাবিধ যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। যে-যুগে আমরা আজকাল বাস করি তাহাকে অনায়াসে যান্ত্রিক যুগ বলা যাইতে পারে। এই যুগে মানুষ নানা উপায়ে তাহার কায়িক পরিশ্রমকে লঘু করিয়া কঠিন কার্য সম্পাদন করিতেছে। ভারী বোঝা মাথায় করিয়া উপরে তুলিবার আর প্রয়োজন নাই—সে কার্য সম্পাদন করিতেছে বিদ্যুৎচালিত ক্রেন। গ্রীষ্মাধিক্যে কায়িক পরিশ্রম করিয়া হাতপাখা চালাইবার প্রয়োজন নাই—বৈদ্যুতিক পাখা সে-কার্যের ভার লইয়াছে; দূর-দূরান্তরে গমন করিবার জন্য পায়ে হাঁটিয়া দৈহিক পরিশ্রমের দিন শেষ হইয়াছে—আজ মানুষ যন্ত্রের সাহায্যে অল্প সময়ে হাজার হাজার মাইল দূরত্ব অতিক্রম করিতেছে।

বিজ্ঞানের ভাষায় **যন্ত্র বলিতে আমরা সেই ব্যবস্থাকে বুঝি যাহা দিয়া সামান্য বল প্রয়োগে বিপুল বাধাকে অতিক্রম করা যায়।** সাধারণত যন্ত্রের গঠন প্রণালী খুব জটিল। কিন্তু নিম্নলিখিত কয়েকটি যন্ত্রকে সরল যন্ত্র (simple machines) বলা যাইতে পারে। যথা : (1) লিভার (Lever) বা দণ্ড, (2) নততল (Inclined plane) ও (3) চক্র ও অক্ষদণ্ড (Wheel and Axle)।

এই যন্ত্রগুলির সাহায্যে কম আয়াসে গুরুভার দ্রব্য উত্তোলন করা যায়। যন্ত্রের সাহায্যে আমরা যে সুবিধা পাইয়া থাকি তাহাকে **যান্ত্রিক সুবিধা** (mechanical advantage) বলে। উহা উত্তোলিত ভার বা বোঝা (W) ও প্রদত্ত বলের (P) অনুপাতের সমান। অর্থাৎ

$$\text{যান্ত্রিক সুবিধা} = \frac{\text{উত্তোলিত ভার}}{\text{প্রদত্ত বল}} = \frac{W}{P}$$

পরবর্তী অনুচ্ছেদে উপরোক্ত যন্ত্রগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল।

2.9. লিভার বা দণ্ড :

ইহা একটি শক্ত দণ্ড এবং একটি স্থিরবিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া অবাধে ঘুরিতে সক্ষম। এই স্থির বিন্দুকে বলা হয় **আলম্ব** (fulcrum)। এই দণ্ডের এক এক অংশে বল প্রয়োগ করিতে হয় এবং অপর অংশে অতিক্রমণীয় বাধা বা ভার প্রয়োগ করিতে হয়। লিভার তিন রকমের হইতে পারে।

(ক) **প্রথম শ্রেণীর লিভার ঃ** 1 নং চিত্রে এই লিভারের কার্যপ্রণালী ও প্রকৃত প্রয়োগ দেখানো হইল। AB হইল লিভার। ইহার আলম্ব হইল C বিন্দু এবং ইহা দণ্ডের ঠিক মাঝখানেই নাই—কোন এক প্রান্তের নিকটবর্তী অবস্থানে আছে। 1 নং চিত্রে ইহা B প্রান্তের নিকটবর্তী দেখানো হইয়াছে। B প্রান্তে ভার বা বোঝা থাকে। P প্রযুক্ত বল ও W ভার।

চিত্র 1
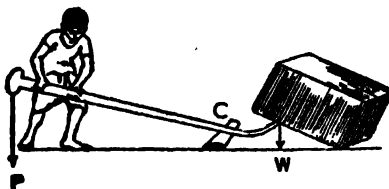
যেহেতু BC অপেক্ষা AC অনেক বড়, কাজেই P অপেক্ষা W অনেক বড় হইবে। অর্থাৎ অল্প বল প্রয়োগে বেশী ভার তোলা যাইবে। সুতরাং প্রথম শ্রেণীর লিভারে যান্ত্রিক সুবিধা আছে। শাবল (চিত্র 2), তুলাদণ্ড, রেল লাইন উঁচু করিবার জন্য কুলীরা যে-দণ্ড ব্যবহার করে তাহা, ঢেঁকি ইত্যাদি প্রথম শ্রেণীর লিভারের দৃষ্টান্ত। কাঁচিতে দুইটি প্রথম শ্রেণীর লিভার যুক্ত থাকে।

শাবল চিত্র 2

(খ) **দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভার ঃ** 3 নং চিত্রে এই লিভারের কার্যপ্রণালী ও প্রকৃত প্রয়োগ দেখানো হইয়াছে। এই শ্রেণীর লিভার দণ্ডের একপ্রান্তে আলম্ব থাকে এবং অপর প্রান্তে বল প্রয়োগ করিতে হয়। ভার এই দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী। 3 নং চিত্রে C বিন্দুতে আলম্ব ; A প্রান্তে P বল প্রয়োগ করা দেখানো হইয়াছে এবং ভার মধ্যবর্তী B বিন্দুতে আছে।
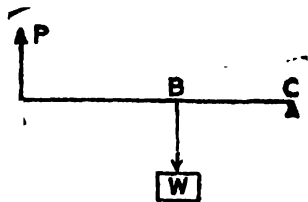
চিত্র 3

যেহেতু, সর্বদা AC বাহু BC বাহু অপেক্ষা বড়, সেইহেতু এই লিভার দ্বারা সর্বদা অল্প বল প্রয়োগে বেশী ভারী জিনিস তোলা যাইবে। অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভারে সর্বদা যান্ত্রিক সুবিধা থাকে। হাতগাড়ী [চিত্র 3 (i)], নৌকার দাঁড়, কর্ক চাপা (cork squeezer) ইত্যাদি দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভারের উদাহরণ। সুপারি কাটা যাঁতিতে এই ধরণের দুইটি লিভার যুক্ত থাকে।
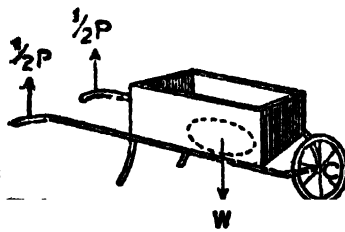
হাতগাড়ী
চিত্র 3 (i)

(গ) **তৃতীয় শ্রেণীর লিভার:** 4 নং চিত্রে ইহার কার্যপ্রণালী বুঝানো হইয়াছে। এই লিভারের এক প্রান্তে আলম্ব C, অপর প্রান্তে ভার W এবং মাঝামাঝি কোন বিন্দু A হইতে বল প্রয়োগ করা হয়।

কিন্তু যেহেতু AC সর্বদা BC অপেক্ষা ছোট সেইহেতু W সর্বদা P অপেক্ষা ছোট। অর্থাৎ বেশী বল প্রয়োগ করিয়া অল্প ভার তোলা যাইবে।
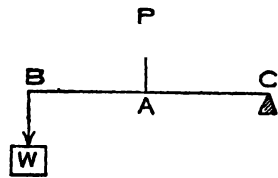
চিত্র 4

এই কারণে **তৃতীয় শ্রেণীর লিভারে কোন যান্ত্রিক সুবিধা নাই।** কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে ভার উত্তোলনের জন্য সরাসরি বলপ্রয়োগের সুবিধা থাকে না—আবার প্রথম দুই শ্রেণীর লিভারও ব্যবহার করা যায় না। সেই সব ক্ষেত্রে অসুবিধা সত্ত্বেও তৃতীয় শ্রেণীর লিভার ব্যবহৃত হয়।
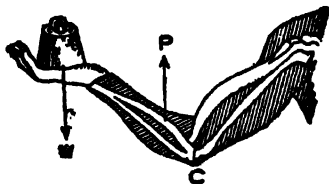
মানুষের বাহু তৃতীয় শ্রেণীর লিভারের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ [চিত্র 4 (i)]। বাহুর হাড় হইল দণ্ড। কনুই আলম্ব এবং মাংসপেশীর সাহায্যে বাহুর মাঝ বরাবর বল প্রযুক্ত হয় এবং হাতের তালু ভার উত্তোলন করে।

চিত্র 4(i)

কখন কখন কয়েকটি লিভার যুক্ত করিয়া একটি সম্মিলিত লিভার (combination of levers) তৈয়ারী করা হয়। ইহার ফলে খুব কম বল প্রয়োগ করিয়া অনেক ভারী জিনিস খুব সহজে তোলা যায়। রেলওয়ে প্লাটফর্মে ভারী মাল খুব দ্রুত ওজন করিবার জন্য যে 'weigh bridge' নামক যন্ত্র থাকে তাহা উক্ত সম্মিলিত লিভারের দৃষ্টান্ত।

2.10. নততল (Inclined plane):

তোমরা যাহারা পাহাড়ে বেড়াইতে গিয়াছ তাহারা জান যে, খাড়া পাহাড়ে ওঠার চাইতে একটু ঢালু পথে ওঠা সহজ। সেইজন্য কোন পাহাড়ী সহরে যাইবার জন্য গাড়িগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া যতটা পারে খাড়া পথ এড়াইয়া চলে। কোন বাড়ীর তিনতলা বা চারতলায় উঠিতে হইলে সিড়িগুলি যদি খুব খাড়া হয় তবে বেশ কষ্ট হয়; কিন্তু সিড়িগুলি একটু ঢালু হইলে উঠিতে তত কষ্ট হয় না।

এই সব উদাহরণ হইতে আমরা বুঝি যে কোন বস্তুকে খাড়া উচ্চ স্থানে উঠাইতে যত কষ্ট হয় ঢালু পথে উঠাইতে তত কষ্ট হয় না; অল্পায়াসে উঠানো যায়। এই জন্য রাস্তায় বা স্টেশনে দেখিয়া থাকিবে যে ভারী পিপা লরী বা রেলগাড়ির কামরায়তুলিবার জন্য কুলীরা একখানি তক্তা কাত করিয়া ফেলিয়া তাহার উপর দিয়া পিপাগুলি গড়াইয়া তুলিতেছে [চিত্র 5 (i)]। ইহাতে কাজ অনেক সহজ হয়।
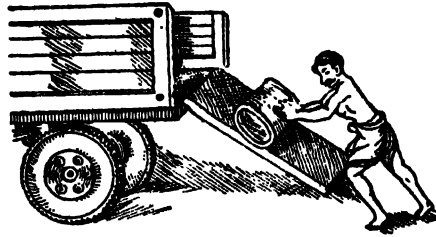
চিত্র 5 (i)

কোন কাঠের তক্তা বা ঐ-জাতীয় কোন সমতলকে যদি অনুভূমিক না রাখিয়া কোন কোণে আনত রাখা হয় তবে উহাকে **নততল** বলে।
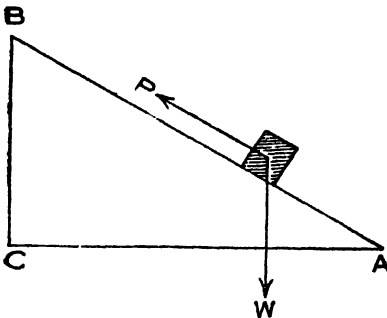
চিত্র 5 (ii)

ধর AB একটি নততল যাহা AC অনুভূমিক রেখার সহিত $\angle BAC$ কোণে দণ্ডায়মান [চিত্র 5 (ii)]। এবার যদি W ওজনের কোন বস্তুকে নততলের সমান্তরাল ভাবে P বল প্রয়োগ করিয়া B পর্যন্ত তোলা যায় তবে যে-কার্য, করা হইবে তাহার পরিমাণ—বল $\times$ দূরত্ব $= P \times AB$.

এই কার্যের ফলে W ওজনকে CB উচ্চতায় লওয়া হইল। এখন যদি মনে করা যায় যে, W ওজনকে

খাড়াভাবে C হইতে B বিন্দুতে লওয়া হইল তবে তাহার জন্ম যে কার্য করা হইবে তাহার পরিমাণ $= W \times BC$.

5 (ii) নং চিত্র হইতে সহজে বোঝা যায় যে, BC অপেক্ষা AB অনেক বড়। প্রকৃতপক্ষে নততলের বেলাতে এইরূপ সর্বদা হইবে। সুতরাং P অপেক্ষা W অনেক বড় অর্থাৎ কম বল প্রয়োগে বেশী কার্য করা যাইবে।

শোনা যায় বহু পূর্বে পুরীর মন্দির, কোনারকের মন্দির, মিশরের পিরামিড প্রভৃতি নির্মাণে ভারী পাথরকে নততলের সাহায্যে উচ্চস্থানে তোলা হইয়াছিল।

2.11. চক্র ও অক্ষদণ্ড (Wheel and Axle):

6 নং চিত্রে একটি চক্র ও অক্ষদণ্ড ব্যবস্থা দেখানো হইয়াছে। এই যন্ত্রে দুইটি বিভিন্ন ব্যাসের চোঙাকৃতি ড্রাম এমনভাবে একসঙ্গে যুক্ত করা থাকে যে উভয় চোঙের অক্ষ এক। বড় ব্যাসের ড্রামটিকে (B) বলা হয় চক্র এবং ছোট ব্যাসের ড্রামটিকে (A) বলা হয় অক্ষদণ্ড। উভয়ের অক্ষ এক এবং উহারা একসঙ্গে ঘুরিতে পারে। ড্রাম দুইটিতে দুইটি দড়ি জড়ানো থাকে এবং উহাদের পাক উল্টামুখী। অক্ষদণ্ডের দড়ির এক প্রান্তে ভার (W) থাকে এবং চক্রের দড়ির একপ্রান্তে বল (P) প্রয়োগ করা হয়। চক্রের দড়ির পাক খুলিয়া গেলে অক্ষদণ্ডের দড়ি গুটাইয়া যায় এবং ভারকে টানিয়া তোলে।
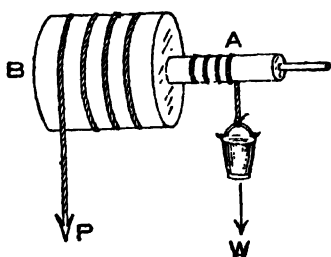
চিত্র 6

চক্রের ব্যাসার্ধ অক্ষদণ্ডের ব্যাসার্ধ অপেক্ষা বড় হওয়ায় এই যন্ত্রে সর্বদা যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যায়—অর্থাৎ অল্প বল প্রয়োগে বেশী কার্য করা যাইবে।

জাহাজে ব্যবহৃত 'ক্যাপস্টান' (capstan) (7নং চিত্র) চক্র ও অক্ষদণ্ডের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এক্ষেত্রে ক্যাপস্টানে যুক্ত দণ্ডের দৈর্ঘ্য হইল চক্রের ব্যাসার্ধের সমান এবং ব্যারেলের ব্যাসার্ধ হইল অক্ষদণ্ডের ব্যাসার্ধের সমান।
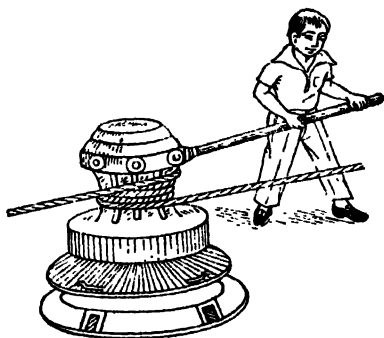
চিত্র 7

যন্ত্র সম্বন্ধে সর্বদা একটি কথা স্মরণ রাখিবে। যন্ত্রের সাহায্যে আমরা কাজের সুবিধা করিয়া লই—অর্থাৎ অল্প বলপ্রয়োগে বেশী বাধা অতিক্রম করিবার ব্যবস্থা করিয়া লই, কিন্তু শক্তির দিক হইতে কিছুই লাভবান হই না। যে-শক্তি আমরা যন্ত্রে প্রয়োগ করি যন্ত্র আবার তাহাই ফিরাইয়া দেয়! যন্ত্র বেশী শক্তি সৃষ্টি করিতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, যন্ত্র যে-শক্তি ফিরাইয়া দেয় তাহা প্রযুক্ত শক্তি অপেক্ষা কিছু কম ; কারণ যন্ত্রের বিভিন্ন অংশের ভিতর ঘর্ষণজনিত বাধা অতিক্রম করিবার জন্য কিছু শক্তি খরচ হয়।

প্রশ্নাবলী

1. 'কার্য' বলিতে কি বুঝায়? 'বলের দ্বারা কার্য' এবং 'বলের বিরুদ্ধে কার্য' এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য কি? উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা কর।

2. 'কার্য' ও 'ক্ষমতা' বলিতে কি বোঝ? এফ্. পি, এস্. এবং সি, জি, এস্ পদ্ধতিতে উহাদের ব্যবহারিক একক কি? এই দুই পদ্ধতির এককের ভিতর সম্পর্ক কি?

3. ক্ষমতা ও কার্যের বিভিন্ন এককগুলি ব্যাখ্যা কর।

4. এক ব্যক্তি তীব্র স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার কাটিয়া নিজেকে তীরভূমির সাপেক্ষে স্থির রাখিয়াছে। সে কি কোন কার্য করিল?

5. 'হর্স পাওয়ার' কাহাকে বলে?

6. শক্তি কাহাকে বলে? দুইপ্রকার যান্ত্রিক শক্তির পার্থক্য উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা কর।

7. যন্ত্রের সুবিধা কি? তৃতীয় শ্রেণীর লিভারে যান্ত্রিক সুবিধা আছে কি? কি অবস্থায় ঐ লিভার ব্যবহার করা সুবিধাজনক?

8. লিভার কয় শ্রেণীর? প্রত্যেক শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহারিক প্রয়োগের উদাহরণ দাও।

9. জাহাজের ক্যাপস্ট্যান কোন শ্রেণীর যন্ত্র? ইহার বিবরণ দাও।

10. নিম্নে কতকগুলি প্রশ্ন দেওয়া হইল। যেটির উত্তর "হ্যাঁ" তাহার ডানদিকে Y এবং যেটির উত্তর "না" তাহার ডানদিকে N লেখ :—

(i) কৃত কার্য কি প্রযুক্ত বল এবং বলের প্রয়োগবিন্দুর সরণের গুণফলের সমান?

(ii) সাধারণভাবে 'কার্যের' অর্থ এবং বৈজ্ঞানিক অর্থ কি এক?

(iii) সমতল রাস্তা বরাবর একটি গাড়ী স্থিরমানের বেগে ছুটিতেছে এবং গাড়ীর উপর কোন নীট বল (net force) ক্রিয়া করিতেছে না। এই অবস্থায় গাড়ীর উপর কোন কার্য করা হইতেছে কি ?

(iv) সকল প্রকার লিভারই কি সমান সুবিধাজনক ?

(v) দোদুল্যমান দোলকের শক্তি কি গতিশক্তি ও স্থিতিশক্তির সংমিশ্রণ বলা যায় ?

11. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির পাশে উহাদের কয়েকটি সম্ভাব্য উত্তর দেওয়া আছে। তুমি যে উত্তরটি নির্ভুল মনে কর তাহাতে √ চিহ্ন দাও।

(i) প্রথম শ্রেণীর লিভারে আলম্ব বিন্দু কোথায় অবস্থিত ? উঃ। দণ্ডের একপ্রান্তে, দণ্ডের মধ্যস্থলে।

(ii) দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভারের উদাহরণ কি ? উঃ। শাবল, নৌকার দাঁড়, মানুষের হাত।

(iii) 'হর্স পাওয়ার' কিসের একক ? উঃ। শক্তি, কার্য, ক্ষমতা। ✓

(iv) 1 জুল কত আর্গের সমান : উঃ। 10^5 আর্গ, 10^7 ✓ আর্গ, 32 আর্গ।

(v) একটি বস্তুকে মাটি হইতে উঁচুতে তুলিলে তাহার কি ধরনের শক্তি লাভ হয় ? উঃ গতিশক্তি ✓; স্থিতিশক্তি।

(vi) কোন বস্তুর কার্য করিবার সামর্থ্যকে কি বলে ? উঃ ক্ষমতা ✓, বল, শক্তি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তাপবিজ্ঞান
(Heat)

3.1. তাপ (Heat) :

তাপ সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই কিছু-না-কিছু ধারণা আছে। আগুন জ্বালাইলে তাপ পাওয়া যায়, দিনের বেলা সূর্য উঠিলে তাপ অনুভব করি, শীতকাল অপেক্ষা গ্রীষ্মকালে তাপ বেশী থাকে, এসব কথা আমাদের সকলেরই জানা আছে। কোন কঠিন পদার্থের মত তাপের কোন আকার বা আয়তন না থাকায় কিংবা গন্ধ, রং প্রভৃতির দ্বারা তাপকে বুঝিবার উপায় না থাকায় তাপ-কে কোন বস্তুর মাধ্যমে বুঝিতে হয়। আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতা হইতেছে এই যে, কোন বস্তু তাপ গ্রহণ করিলে গরম হইবে এবং তাপ ছাড়িয়া দিলে ঠাণ্ডা হইবে। কাজেই, **তাপ-কে আমরা এমন এক জিনিস বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি যাহার গ্রহণে বস্তু গরম হইয়া উঠে এবং বর্জনে ঠাণ্ডা হইয়া যায়।**

3.2. তাপমাত্রা (Temperature) :

গরম ও ঠাণ্ডা বোধ আমাদের সকলেরই আছে। বরফে হাত দিলে ঠাণ্ডা বোধ হয় কিন্তু উত্তপ্ত লোহার টুকরাতে হাত দিলে গরম বোধ হয়। কোন বস্তু ঠাণ্ডা কি গরম, এই অনুভূতিকে আমরা সোজা কথায় বস্তুর তাপমাত্রা বলিতে পারি। যে বস্তুতে হাত দিলে গরম লাগে তাহার তাপমাত্রা বেশী, আর যে বস্তুতে হাত দিলে ঠাণ্ডা মনে করি, তাহার তাপমাত্রা কম বলা হয়।

কিন্তু তাই বলিয়া তাপ বেশী হইলেই যে তাপমাত্রা বাড়িবে তাহার কোন অর্থ নাই। যেমন, একটি দেশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠি এবং এক বালতি ফুটন্ত জলের কথা ধরা যাউক। দেশলাই কাঠির তাপমাত্রা বালতির ফুটন্ত জলের তাপমাত্রা অপেক্ষা বেশী কিন্তু দেশলাই কাঠির মোট তাপ বালতির জলের মোট তাপ অপেক্ষা অনেক কম।

তাপবিজ্ঞানে 'তাপমাত্রা' কথাটি এতই প্রয়োজনীয় যে ইহার বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন।

একটি উত্তপ্ত লোহার বল-কে যদি এক বালতি ঠাণ্ডা জলে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তবে দেখা যায় লোহার বল আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হইতেছে এবং জল আস্তে আস্তে গরম হইতেছে। এরূপ কখনও দেখা যায় না যে, উত্তপ্ত বল আরও

উত্তপ্ত হইতেছে এবং ঠাণ্ডা জল আরও ঠাণ্ডা হইতেছে। ইহার কারণ, গোড়াতে উত্তপ্ত বলের তাপমাত্রা ঠাণ্ডা জল অপেক্ষা বেশী হওয়ায়,উত্তপ্ত বল ঠাণ্ডা জলকে তাপ প্রদান করিয়াছে এবং জলের তাপমাত্রা কম থাকাতে জল সেই তাপ গ্রহণ করিয়াছে।

সংজ্ঞা : তাপমাত্রা বস্তুর উষ্ণতার মাত্রা (degree of hotness) **বুঝায়। ইহা ঐ বস্তুর এমন এক তাপীয়** (thermal) **অবস্থা প্রকাশ করে যাহা হইতে আমরা বুঝি ঐ বস্তুটি অন্য বস্তুকে তাপ দিবে কিংবা অন্য বস্তু হইতে তাপ গ্রহণ করিবে।**

এই সম্পর্কে তাপমাত্রাকে তরলের তলের (level) সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। আমরা জনি উচ্চতল হইতে জল সর্বদা নিম্নতলে প্রবাহিত হয়। উল্টাদিকে কখনও প্রবাহিত হয় না। অর্থাৎ, তলদ্বারা আমরা বুঝিতে পারি জলপ্রবাহ কোন্ দিকে যাইবে। তাপমাত্রাও তেমনি বুঝাইয়া দেয় কোন্ বস্তু হইতে কোন্ বস্তুতে তাপের প্রবাহ হইবে।

যখন A বস্তু B বস্তুকে তাপ প্রদান করে তখন বলা হয় A বস্তুর তাপমাত্রা B বস্তু অপেক্ষা বেশী এবং উল্টা প্রবাহ হইলে বলা হয় B বস্তুর তাপমাত্রা A বস্তু হইতে বেশী।

তাপ ও তাপমাত্রার পার্থক্য : (1) তাপ একপ্রকার শক্তি। কিন্তু তাপমাত্রা বস্তুর এক তাপীয় (thermal) অবস্থা।

(2) যখন কোন বস্তু তাপ গ্রহণ করে, তখনই উহার তাপমাত্রা বাড়ে এবং যখন তাপ ছাড়িয়া দেয় তখনই উহার তাপমাত্রা কমে। অর্থাৎ, তাপকে কারণ (cause) বলা হইলে তাপমাত্রা হইবে উহার ফল (effect)।

(3) কিছু পরিমাণ জলের সহিত ইহার তলের (level) যে তফাৎ, তাপের সহিত তাপমাত্রারও সেই তফাৎ।

(4) দুই বস্তুর এক তাপমাত্রা হইলেই উহাদের যে সমপরিমাণ তাপ থাকিবে তাহার কোন অর্থ নাই। আবার দুই বস্তুর সমপরিমাণ তাপ থাকিলেই উহাদের তাপমাত্রা এক হইবে তাহারও কোন অর্থ নাই।

3.3. থার্মোমিটার এবং থার্মোমিটার স্কেল (Thermometer and thermometer scales) :

কোন জিনিস উত্তপ্ত কি ঠাণ্ডা তাহা আমরা স্পর্শ করিয়া বুঝিতে পারি। কিন্তু স্পর্শানুভূতির বিচার সর্বদা নির্ভুল বা সূক্ষ্ম হয় না। যেমন, শীতপ্রধান

দেশের লোক আমাদের দেশে আসিলে খুব বেশী গরম বোধ করিবে কিন্তু আমরা এদেশে থাকিতে অভ্যস্ত বলিয়া তত গরম বোধ করি না। আবার, আমরা শীতের দেশে গেলে খুব ঠাণ্ডা বোধ করিব।

এক বালতি গরম জলে কিছুক্ষণ হাত ডুবাইয়া রাখিয়া ঠাণ্ডা জলে হাত ডুবাও। জল খুব বেশী ঠাণ্ডা লাগিবে। তেমনি, ঠাণ্ডা জলে কিছুক্ষণ হাত ডুবাইয়া রাখিয়া গরম জলে ডুবাইলে জল খুব গরম লাগিবে।

কাজেই অনুভূতির বিচার নির্ভুল নয়। তাছাড়া, তাপমাত্রার সূক্ষ্ম পরিমাপ স্পর্শ দ্বারা হইতে পারে না। এজন্য যন্ত্রের প্রয়োজন।

যে যন্ত্রের সাহায্যে কোন বস্তুর তাপমাত্রা মাপা যায় তাহাকে থার্মোমিটার বলে। যে থার্মোমিটারে পারদ ব্যবহৃত হয় তাহাকে পারদ-থার্মোমিটার বলে। এই ধরণের থার্মোমিটার খুব বেশী ব্যবহৃত হয়। তোমরা সকলে নিশ্চয়ই কোন না কোন থার্মোমিটার দেখিয়াছ। 1 নং চিত্রে বহুল ব্যবহৃত একটি পারদ থার্মোমিটারের ছবি দেখানো হইল। ইহা একটি সর্বত্র সমান ব্যাসের সূক্ষ্ম রন্ধ্রবিশিষ্ট শক্ত কাচের নল। রন্ধ্রের এক প্রান্তে চোঙাকৃতি একটি কুণ্ড আছে এবং অপর প্রান্ত বন্ধ। কুণ্ড এবং রন্ধ্রের খানিকটা অংশ পারদপূর্ণ। কাচনলের গায়ে তাপমাত্রার স্কেল অঙ্কিত। যে-বস্তুর তাপমাত্রা মাপিতে হয় তাহার সহিত কুণ্ডটির সংস্পর্শ ঘটাইলে পারদ আয়তনে বাড়িয়া যে দাগ পর্যন্ত পৌঁছাইবে তাহাই হইবে ঐ বস্তুর তাপমাত্রা।
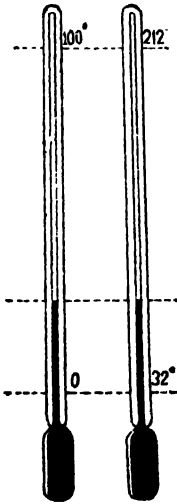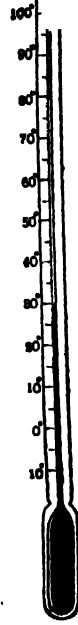
চিত্র 1

চিত্র 2

তাপমাত্রার স্কেল : তাপমাত্রার স্কেল নির্ণয় করিতে গিয়া বরফের গলনাঙ্ক-কে নিম্নসীমা এবং জলের স্ফুটনাঙ্ক-কে ঊর্ধ্বসীমা ধরা হয়। আমাদের দেশে প্রধানত দুইরকম থার্মোমিটার স্কেল চালু আছে। যথা—(ক) সেন্টিগ্রেড বা সেলসিয়াস স্কেল এবং (খ) ফারেনহাইট স্কেল।

(ক) **সেন্টিগ্রেড বা সেলসিয়াস স্কেল :** এই স্কেল অনুযায়ী বরফের গলনাঙ্ক-কে 0° ডিগ্রী এবং জলের স্ফুটনাঙ্ক-কে 100° ডিগ্রী

ধরা হয়। মধ্যবর্তী স্থানকে 100 সমান ভাগে ভাগ করা হয় এবং প্রত্যেক ভাগকে এক সেন্টিগ্রেড বা সেলসিয়াস ডিগ্রী ধরা হয় [চিত্র 2]।

(খ) ফারেনহাইট স্কেল : এই স্কেল অনুযায়ী বরফের গলনাঙ্ককে 32° ডিগ্রী এবং জলের স্ফুটনাঙ্ককে 212° ডিগ্রী ধরা হয়। মধ্যবর্তী স্থানকে সমান 180° ভাগে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক ভাগকে এক ফারেনহাইট ডিগ্রী ধরা হয়।

এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে জ্বর হইলে দেহের তাপমাত্রা পরীক্ষা করিবার জন্য ডাক্তারগণ যে থার্মোমিটার ব্যবহার করেন তাহা ফারেনহাইট স্কেল অনুযায়ী দাগ কাটা। এই থার্মোমিটারে 95° হইতে 110° ডিগ্রী ফারেনহাইট পর্যন্ত দাগ কাটা থাকে, কারণ, জীবিত মানুষের দেহের তাপমাত্রা ইহার ভিতর ওঠানামা করে।

3.4. তাপের পরিমাণ (Quantities of heat) :

পদার্থবিজ্ঞানে বহু রাশির পরিমাপ আমরা সরাসরি যন্ত্রের সাহায্যে করিতে পারি। যেমন, বস্তুর ভর আমরা সরাসরি তুলাযন্ত্রের সাহায্যে মাপিতে পারি, তাপমাত্রা থার্মোমিটারের সাহায্যে, দৈর্ঘ্য স্কেলের সাহায্যে ইত্যাদি। কিন্তু তাপের পরিমাণ সরাসরি পরিমাপ করিবার সেরূপ কোন যন্ত্র নাই। তাপের পরিমাপ করিতে হইলে তাপের ফলাফল লক্ষ্য করিতে হইবে। যেমন, বস্তুতে তাপ দিলে উহার তাপমাত্রার পরিবর্তন হয়। আবার, দেখা যায় নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপের দরুন বস্তুর তাপমাত্রাবৃদ্ধি বা হ্রাস ভর এবং উপাদানের উপর নির্ভর করে। যদি H পরিমাণ তাপ কোন বস্তুতে দেওয়া হয় এবং তাহাতে বস্তুর তাপমাত্রা বৃদ্ধি 't' হয় তবে,

$H \propto t$ যখন বস্তুর ভর (m) স্থির

এবং $H \propto m$ " " " তাপমাত্রা (t) "

অর্থাৎ $H \propto mt$ যখন উভয়েই পরিবর্তনশীল।

অথবা $H = S.m.t.$ এস্থলে 'S' একটি আনুপাতিক ধ্রুবরাশি এবং ইহা বস্তুর উপাদানের উপর নির্ভরশীল। ইহাকে বলা হয় **আপেক্ষিক তাপ** (specific heat)। এই কারণে, তাপের পরিমাণ পরিমাপ করিতে হইলে বস্তুর ভর, তাপমাত্রাবৃদ্ধি বা হ্রাস এবং আর একটি নতুন রাশি—আপেক্ষিক তাপ প্রয়োজন।

পরীক্ষা : (i) একটি পাত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ জল লইয়া বার্নারের সাহায্যে উত্তপ্ত কর। জলকে সমভাবে উত্তপ্ত করিবার জন্য একটি

আলোড়কের (stirrer) দ্বারা জলকে ধীরে ধীরে নাড়িতে থাক। জলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি লক্ষ্য করিবার জন্য জলের ভিতর একটি থার্মোমিটার ডুবাও। এইভাবে জলে ধীরে ধীরে তাপ প্রদান করিয়া জলের তাপমাত্রা ধর, 10°C বৃদ্ধি করাও এবং ইহাতে যে সময় লাগিল, তাহা ঘড়ির সাহায্যে দেখিয়া লিখিয়া রাখ। এইবার অনুরূপ একটি পাত্রে দ্বিগুণ পরিমাণ জল লইয়া পূর্বের ন্যায় দুইটি বার্নারের সাহায্যে জলকে উত্তপ্ত কর। দেখিবে, একই তাপমাত্রাবৃদ্ধির জন্য একই সময় লাগিতেছে। ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে সমতাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য দ্বিগুণ পরিমাণ জল দ্বিগুণ পরিমাণ তাপ গ্রহণ করিল—অর্থাৎ **তাপগ্রহণ বস্তুর ভরের সমানুপাতিক হইল।**

(ii) একটি পাত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ জল লইয়া বার্নারের সাহায্যে উত্তপ্ত কর। থার্মোমিটার লক্ষ্য করিয়া জলের তাপমাত্রাবৃদ্ধি 10°C কর এবং ইহাতে যে সময় লাগিল ঘড়ির সাহায্যে তাহা লক্ষ্য কর। এইবার অনুরূপ আর একটি পাত্রে একই পরিমাণ জল লইয়া পূর্বের ন্যায় দুইটি বার্নারের সাহায্যে জলে তাপ প্রদান কর। পূর্বের পরীক্ষার মত একই সময় ধরিয়া তাপ প্রদান করিলে দেখা যাইবে তাপমাত্রা বৃদ্ধি 20°C হইল। অর্থাৎ সমভর জলে দ্বিগুণ তাপ প্রদান করিলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি দ্বিগুণ হয়। সুতরাং বলা যায়, **বস্তু কর্তৃক তাপ গ্রহণ বস্তুর তাপমাত্রা-বৃদ্ধির সমানুপাতিক।**

(iii) সীসা, তামা, লোহা ইত্যাদি বিভিন্ন পদার্থের সমান ভরের কতকগুলি গোলক লও। তাপপ্রদান করিয়া উহাদের তাপমাত্রা সমান কর। এইবার একসঙ্গে তাড়াতাড়ি গোলকগুলি একটি মোমের প্লেটের উপর রাখ। দেখিবে, গোলকগুলি বিভিন্ন পরিমাণ মোম গলাইবে। কোনটি সম্পূর্ণ গলাইয়া পাড়িয়া যাইবে, কোনটি বা অর্ধেক গলাইবে ইত্যাদি (চিত্র 3)। ইহা হইতে বোঝা যায় যে, যদিও গোলকগুলির ভর সমান
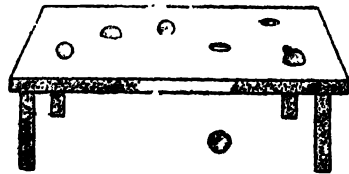
চিত্র 3

এবং উহাদের একই তাপমাত্রা হ্রাস হইল (কারণ, প্রত্যেকটিই এক প্রাথমিক তাপমাত্রা হইতে মোম গলনের তাপমাত্রায় পৌঁছিল) তবুও তাহারা বিভিন্ন পরিমাণ তাপ ছাড়িয়া দিল। সুতরাং **তাপ বর্জন বস্তুর উপাদানের উপরও নির্ভর করে।**

3.5. তাপ পরিমাপের একক (Units of measurement of heat) :

তাপ পরিমাপের যে সমস্ত একক প্রচলিত আছে তাহা নিম্নে বলা হইল।

(i) **ক্যালরি** (Calorie) : এক গ্র্যাম জলের এক ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রাবৃদ্ধি করিতে যে তাপের প্রয়োজন তাহাকে ক্যালরি বলে। সি. জি. এস্. পদ্ধতিতে তাপের একক ক্যালরি।

(ii) **বৃটিশ থার্মাল একক** (British thermal unit) : এক পাউণ্ড জলের এক ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপমাত্রা বৃদ্ধি করিতে যে-তাপের প্রয়োজন তাহাকে বৃটিশ থার্মাল একক বলে। ইহা এফ্. পি. এস্. পদ্ধতিতে তাপের একক। ইংলণ্ডে এই একক সমধিক প্রচলিত।

মনে রাখিবে, 1 বৃটিশ থার্মাল একক=252 ক্যালরি।

(iii) **থার্ম** (Therm) : ইহা ইংলণ্ডে প্রচলিত বাণিজ্য সংক্রান্ত (commercial) তাপের একক। ইংলণ্ডে রন্ধন ইত্যাদি কাজের জন্য যে-গ্যাস সরবরাহ করা হয় তাহার মূল্য থার্ম এককের ভিত্তিতে ধার্য করা হয়।

মনে রাখিবে, 1 থার্ম=100,000 বৃটিশ থার্মাল একক।

সুতরাং 100,000 পাউণ্ড জলের তাপমাত্রা 1 ডিগ্রী ফারেনহাইট বৃদ্ধি করিতে যে-তাপের প্রয়োজন তাহাকে থার্ম বলা হইবে।

3.6. আপেক্ষিক তাপ (Specific heat) :

আমরা যদি সমপরিমাণ বিভিন্ন দ্রব্য লই—যথা, সীসা, লোহা, তামা ইত্যাদি এবং উহাদের সমপরিমাণ তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য তাপ প্রদান করি, তবে দেখিব, বিভিন্ন দ্রব্যে বিভিন্ন পরিমাণ তাপ দিতে হইতেছে। সুতরাং বিভিন্ন পদার্থের তাপ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা শুধু দ্রব্যের ভর বা তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে না; উহার আপেক্ষিক তাপের উপরও নির্ভর করে। ইহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

সি. জি. এস্. পদ্ধতিতে কোন পদার্থের আপেক্ষিক তাপ বলিতে ঐ পদার্থের 1 গ্র্যাম ভরের 1° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য যত ক্যালরি তাপ প্রয়োজন তাহার সমান বুঝায়। যথা, তামার আপেক্ষিক তাপ ·09 ; ইহার অর্থ এই যে, 1 গ্র্যাম তামাকে এক ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উষ্ণ করিতে ·09 ক্যালরি তাপ প্রয়োজন।

এফ্. পি. এস্. পদ্ধতিতে কোন পদার্থের আপেক্ষিক তাপ বলিতে ঐ পদার্থের 1 পাউণ্ড ভরকে 1 ডিগ্রী ফারেনহাইট উষ্ণ করিতে যত বৃটিশ

থার্মাল একক তাপ প্রয়োজন তাহার সমান বুঝায়। যেমন, তামার আপেক্ষিক তাপ '09, ইহার অর্থ এই যে 1 পাউণ্ড তামাকে 1 ডিগ্রী ফারেনহাইট উষ্ণ করিতে '09 বৃটিশ থার্মাল একক তাপ প্রয়োজন।

বলা বাহুল্য, বিভিন্ন পদার্থের আপেক্ষিক তাপ বিভিন্ন।

3.7. বস্তুর তাপমাত্রা বৃদ্ধি অথবা হ্রাসের জন্য গৃহীত বা বর্জিত তাপের পরিমাণ (Amount of heat either absorbed or given out by a body for a rise or fall of temperature) :

যদি কোন পদার্থের আপেক্ষিক তাপ s হয়, তবে আপেক্ষিক তাপের সংজ্ঞা হইতে আমরা জানি,

1 গ্র্যাম বস্তু 1° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রাবৃদ্ধি বা হ্রাসের জন্য তাপগ্রহণ বা বর্জন করে s ক্যালরি।

সুতরাং m গ্র্যাম বস্তু 1° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা বৃদ্ধি বা হ্রাসের জন্য তাপ গ্রহণ বা বর্জন করে ms ক্যালরি।

অথবা, m গ্র্যাম বস্তু $t°$ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা বৃদ্ধি বা হ্রাসের জন্য তাপ গ্রহণ বা বর্জন করে $m.\ s.\ t.$ ক্যালরি।

এই তাপের পরিমাণ H হইলে, $H=m.s.t.$ ক্যালরি।

অর্থাৎ গৃহীত বা বর্জিত তাপ=বস্তুর ভর×ইহার আপেক্ষিক তাপ× তাপমাত্রাবৃদ্ধি বা হ্রাস। যদি তাপ গ্রহণের পূর্বে বস্তুর তাপমাত্রা t_1°C থাকে এবং তাপ গ্রহণ করিয়া তাপমাত্রা t_2°C দাঁড়ায় তবে তাপমাত্রা বৃদ্ধি $=(t_2-t_1)$°C ; সেক্ষেত্রে $H=m.s.\ (t_2-t_1)$ ক্যালরি।

তেমনি যদি তাপ বর্জনের পূর্বে বস্তুর তাপমাত্রা t_1°C থাকে এবং তাপ বর্জনের পর তাপমাত্রা হ্রাস পাইয়া t_2°C হয়, তবে তাপমাত্রা হ্রাস $=(t_1-t_2)$°C ; সেক্ষেত্রে, $H=m.s.\ (t_1-t_2)$ ক্যালরি।

উদাহরণ : (1) একটি তামার বস্তুর ওজন 180 গ্র্যাম ; তামার আপেক্ষিক তাপ '09 ; বস্তুটির তাপমাত্রা 25°C হইতে 95°C বৃদ্ধির জন্য কত তাপ লাগিবে ?

উ। এক্ষেত্রে $m=180$ গ্র্যাম ; $s=$'09 ; $t_1°=25$°C ; $t_2=95$°C.

আমরা জানি, $H=m.s.(t_2-t_1)$

$$=180\times{}'09\times(95-25)$$

$$=180\times{}'09\times70=1134 \text{ ক্যালরি।}$$

(2) 2·5 পাউণ্ড অ্যালকোহলের তাপমাত্রা $68^\circ F$ হইতে উহার স্ফুটনাঙ্ক $173^\circ F$ পর্যন্ত বৃদ্ধির জন্য কত তাপের প্রয়োজন হইবে ?

[অ্যালকোহলের আপেক্ষিক তাপ=0·6]

উ। এস্থলে, $m=2\cdot5$ পাউণ্ড ; $s=0\cdot6$; $t^\circ_1=68^\circ F$; $t_2^\circ=173^\circ F$

আমাদের জানা আছে, $H=m.s.(t_2-t_1)$

$$=2\cdot5\times0\cdot6\times(173-68)$$

$$=2\cdot5\times0\cdot6\times105=157\cdot5$$ বৃ. থা. এ.

3·8 **তাপ একপ্রকার শক্তি** (Heat is a form of energy) :

ঘর্ষণের দ্বারা কার্য করিলে সর্বদা তাপের সৃষ্টি হয়, ইহা আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতা। বড় বড় যন্ত্রপাতির বিভিন্ন অংশগুলি ভালভাবে পিচ্ছিলকারী তেল (lubricating oil) দ্বারা পিচ্ছিল না রাখিলে ঘর্ষণের ফলে উত্তপ্ত হইয়া পড়ে তাহা তোমরা জান। আদিমকালে অসভ্য মানুষেরা পাথরে পাথর ঘষিয়া আগুন জ্বালাইত, তাহা ইতিহাসের বই-এ পড়িয়াছ। ঘর্ষণজনিত তাপের এইরূপ অসংখ্য উদাহরণ উল্লেখ করা যাইতে পারে।

কোন গ্যাসকে আবদ্ধ স্থানে রাখিয়া চাপ প্রদান করিলে যে-কার্য সম্পাদিত হয় তাহার ফলে তাপ উৎপন্ন হয়। সাইকেলের চাকা পাম্প করিবার সময় বা ফুটবল ব্লাডারে হাওয়া ভর্তি করিবার সময় এই ব্যাপার হয়ত তোমরা লক্ষ্য করিয়াছ।

যখন বৈদ্যুতিক বাতিতে তড়িৎ-প্রবাহ হয় তখন বাতি আলো ও উত্তাপ সৃষ্টি করে। ইহা দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি তড়িৎশক্তিকে আলোকশক্তি বা তাপশক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়।

গতিশক্তিকে রূপান্তরিত করিয়া তাপশক্তি সৃষ্টির উদাহরণ প্রায়ই আমাদের চোখে পড়ে। কোন মানুষ কিছুদূর বেশ জোরে দৌড়াইলে তাহার দেহ উত্তপ্ত হয়। কামার যখন হাতুড়ী দিয়া লোহা পিটায় তখন লোহা উত্তপ্ত হইয়া পড়ে। ইহা গতিশক্তির তাপশক্তিতে রূপান্তরের

উপরোক্ত উদাহরণগুলি হইতে বলা যায়, তাপ এক প্রকারের শক্তি, কারণ, বিভিন্ন শক্তিকে তাপশক্তিতে বা তাপশক্তিকে অন্যান্য শক্তিতে রূপান্তর সম্ভব।

3.9. তাপের সহিত কার্যের সম্পর্ক (Relationship of heat with work) :

শক্তির নিত্যতা সূত্র অনুযায়ী যখনই এক শক্তি অন্য কোন শক্তিতে রূপান্তরিত হয় তখন শক্তির কোন বিনাশ হয় না—মোট শক্তি অপরিবর্তিত থাকে। সুতরাং তাপ যদি একপ্রকার শক্তি হয় এবং যান্ত্রিক শক্তি যদি তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয় তবে উহা শক্তির নিত্যতা সূত্র মানিয়া চলিবে। অর্থাৎ যে-যান্ত্রিক শক্তির ব্যয় হয় এবং যে-তাপশক্তি সৃষ্টি হয় তাহারা সমানুপাতিক। ইহাকে ঘুরাইয়া বলিলে দাঁড়ায় এই যে, নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপ পাইতে গেলে সর্বদা নির্দিষ্ট পরিমাণ কার্য করা প্রয়োজন। 1847 খ্রীষ্টাব্দে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী জেমস্ প্রেসকট জুল এই সম্পর্ক নিরূপণ করেন এবং পরীক্ষা-মূলকভাবে ইহার সত্যতা প্রমাণিত করেন।

যদি W কার্যকে রূপান্তরিত করিয়া H তাপ উৎপন্ন করা হয়, তবে উপরোক্ত সম্পর্ক অনুযায়ী লেখা যায়, $W \propto H$

$$\text{অথবা,} \quad \frac{W}{H} = \text{ধ্রুবরাশি}$$

এই ধ্রুবরাশিকে তাপের **যান্ত্রিক তুল্যাঙ্ক** (mechanical equivalent) বলা হয় এবং J অক্ষর দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$$\text{সুতরাং,} \quad \frac{W}{H} = J \quad \text{অথবা,} \quad W = J.H.$$

মনে রাখিবে, সি. জি. এস্. পদ্ধতিতে $J = 4{\cdot}2 \times 10^7$ আর্গ/ক্যালরি। অর্থাৎ এক ক্যালরি তাপ উৎপাদন করিতে $4{\cdot}2 \times 10^7$ আর্গ কার্য করিতে হইবে। এফ্. পি. এস্. পদ্ধতিতে ইহার মান 778 ফুট পাউণ্ড/বৃ. থা. এ.।

প্রশ্নাবলী

1. তাপ ও তাপমাত্রার প্রভেদ কি? তাপমাত্রা কোন যন্ত্র দিয়া মাপা হয়?

2. কয়প্রকার থার্মোমিটার স্কেল আছে? উহাদের ব্যাখ্যা কর। ডাক্তারী থার্মোমিটার কোন্ স্কেল অনুযায়ী দাগ কাটা?

3. একজন নার্স ভুলক্রমে একটি ডাক্তারী থার্মোমিটার পরিষ্কার করিবার জন্য ফুটন্ত জলে থার্মোমিটারটি ডুবাইয়া দিল। পরে দেখা গেল যে থার্মোমিটারটি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কেন এরূপ হইল?

4. নিম্নলিখিত রাশিগুলির সংজ্ঞা লেখ।—(ক) ক্যালরি, (খ) বৃটিশ থার্মাল একক, (গ) থার্ম, (ঘ) আপেক্ষিক তাপ।

5. সীসার আপেক্ষিক তাপ 0·03—এই উক্তির দ্বারা কি বোঝ?

6. দুইটি একই ধরনের কেটলীতে সমপরিমাণ জল ও দুধ ভরিয়া আগুনের উপর পাশাপাশি রাখা হইল। জল অপেক্ষা দুধের তাপমাত্রাবৃদ্ধি দ্রুত দেখা গেল। ইহার কারণ কি?

7. কিছু পরিমাণ তাপ পরিমাপ করিতে গেলে কি কি বিষয় জানিবার প্রয়োজন হয়?

8. 100°C তাপমাত্রার এক পাউণ্ড লোহা এবং এক পাউণ্ড সীসা বরফে রাখিলে লোহা বেশী বরফ গলায় কেন?

9. 50 গ্র্যাম জলকে 15°C হইতে 40°C উষ্ণ করিতে কত তাপের প্রয়োজন হইবে?

[উঃ 1250 ক্যালরি।]

10. 'তাপ একপ্রকার শক্তি'—এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার সপক্ষে যুক্তির অবতারণা কর।

11. তাপের সহিত কার্যের সম্পর্ক কি? তাপের যান্ত্রিক তুল্যাঙ্ক কি? জি. সি. এস্. পদ্ধতিতে উহার মান কত?

12. নিম্নে কতকগুলি প্রশ্ন দেওয়া আছে। যাহার উত্তর "হ্যাঁ" তাহার পাশে Y এবং যাহার উত্তর "না" তাহার পাশে N বসাও:

(ক) সূর্য কি পার্থিব সকল শক্তির মূলাধার?—

(খ) এক বালতি ফুটন্ত জলের তাপমাত্রা দেশলাই কাঠির তাপমাত্রা অপেক্ষা কম। কিন্তু ফুটন্ত জলের মোট তাপ কি দেশলাই কাঠির তাপ অপেক্ষা কম?—

(গ) গরম জলে হাত ডুবাইয়া ঠাণ্ডা জল স্পর্শ করিলে কি বেশী ঠাণ্ডা লাগিবে?—

(ঘ) দুই বস্তুর তাপমাত্রা সমান হইলে, উহাদের তাপও কি সমান হইবে?—

(ঙ) সমান ভরের বিভিন্ন দ্রব্যে সমান তাপ প্রয়োগ করিলে উহাদের তাপমাত্রা কি ভিন্ন হইবে?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আলোক বিজ্ঞান

(Light)

4.1. **আলোক প্রভব** (Source of light) :

যে বস্তু আলোক প্রদান করিতে পারে তাহাকে আলোক প্রভব বলে। ইহাদের ভিতর একপ্রকার বস্তু আছে যাহারা নিজ হইতে আলো বিকিরণ করে। যেমন সূর্য, নক্ষত্র, জ্বলন্ত বাতি ইত্যাদি। ইহাদের বলা হয় **স্বপ্রভ** (luminous) বস্তু। আবার, অন্য একপ্রকারের বস্তু আছে যাহারা স্বপ্রভ বস্তু হইতে আলোক গ্রহণ করিয়া পরে সেই আলোক বিকিরণ করে। ইহাদের বলা হয় **অপ্রভ** (non-luminous) বস্তু। চাঁদ অপ্রভ বস্তু। চাঁদের নিজের কোনো আলো নাই। সূর্য হইতে আলো পাইয়া চাঁদ আলো বিকিরণ করে। বেশীর ভাগ বস্তুই অপ্রভ। চেয়ার, টেবিল, গাছপালা. বাড়িঘর প্রভৃতি পারিপার্শ্বিক দৃশ্যমান বস্তু স্বপ্রভ বস্তু হইতে আলো গ্রহণ করিয়া দৃষ্টির গোচরে আসে।

4.2. **আলোক-মাধ্যম** (Optical medium) :

যে-মাধ্যমের ভিতর দিয়া আলো চলাচল করিতে পারে তাহাকে আলোক-মাধ্যম বলা হয়।

এই মাধ্যম যদি এমন হয় যে, আলো চতুর্দিকে সমান গতিতে যায় তবে ঐ মাধ্যমকে **সমসত্ত্ব** (homogeneous) মাধ্যম বলা হয়। যেমন, বায়ু, জল, কাচ ইত্যাদি সমসত্ত্ব মাধ্যম।

যে-সমসত্ত্ব মাধ্যমের ভিতর দিয়া আলো অতি সহজে যাতায়াত করিতে পারে তাহাকে **স্বচ্ছ** (transparent) মাধ্যম বলে। যেমন, কাচ, জল ইত্যাদি।

যে-মাধ্যমের ভিতর দিয়া মোটেই আলো যাইতে পারে না, তাহাকে **অস্বচ্ছ** (opaque) মাধ্যম বলে। যেমন—পাথর, লোহা, কাঠ ইত্যাদি।

আবার যে-মাধ্যমের ভিতর দিয়া আলো আংশিকভাবে যাইতে পারে তাহাকে **ঈষৎ স্বচ্ছ** (translucent) মাধ্যম বলা হয়। ঘষা কাচ, তেলা কাগজ ইত্যাদি ঈষৎ স্বচ্ছ মাধ্যমের উদাহরণ।

আলোক-রশ্মি ও রশ্মিগুচ্ছ (Ray of light and beam of light) : কোন সমসত্ত্ব মাধ্যমে আলো সরলরেখায় চলাচল করে। সুতরাং একটি সরলরেখা আলোক-রশ্মির পথকে বুঝাইয়া দিবে। ঐরূপ কতকগুলি আলোক-রশ্মি মিলিয়া এক রশ্মিগুচ্ছ সৃষ্টি করে। একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, একটি রশ্মি সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। প্রভব যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন তাহা হইতে সর্বদা রশ্মিগুচ্ছ বিকীর্ণ হইবে।

রশ্মিগুচ্ছ তিন প্রকার হইতে পারে। যথা : (1) **সমান্তরাল** (parallel) (2) **অপসারী** (divergent) ও (3) **অভিসারী** (convergent)।

সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছের রশ্মিগুলি পরস্পর সমান্তরাল (চিত্র 1)। বহুদূরে অবস্থিত কোন প্রভব হইতে আগত রশ্মিগুচ্ছকে আমরা সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ বলিতে পারি। যেমন, সূর্য হইতে আগত রশ্মিগুচ্ছ সমান্তরাল। তাছাড়া, লেন্স বা গোলীয় দর্পণ (spherical mirror) দ্বারাও কৃত্রিম উপায়ে সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ তৈয়ারী করা যায়।
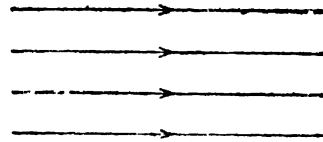
চিত্র 1

যখন কোন প্রভব হইতে রশ্মিগুচ্ছ শঙ্কুর (conical) আকারে এমনভাবে ছড়াইয়া পড়ে যে প্রভব উক্ত শঙ্কুর শীর্ষবিন্দু তখন ঐ রশ্মিগুচ্ছকে **অপসারী রশ্মিগুচ্ছ** বলে (চিত্র 2)।
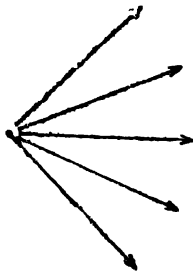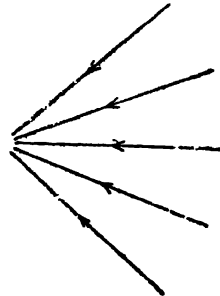
চিত্র 2 চিত্র 3

আবার, যখন কোন প্রভব হইতে রশ্মিগুচ্ছ এমন ভাবে আসে যে তাহারা এক বিন্দুতে মিলিত হয়, তখন তাহাকে **অভিসারী** রশ্মিগুচ্ছ বলে (চিত্র 3)।

4.3. সমতল দর্পণে আলোকের প্রতিফলন (Reflection of light at a plane mirror) **:**

আমরা জানি যে সমসত্ত্ব মাধ্যমে আলো সরলরেখায় গমন করে। কিন্তু আলো যখন এক সমসত্ত্ব মাধ্যম হইতে অন্য মাধ্যমে আপতিত হয় তখন ঐ আলোর কিছু অংশ দ্বিতীয় মাধ্যমের তল (surface) হইতে পুনরায় সরলরেখায় প্রথম মাধ্যমে ফিরিয়া আসে। এই ঘটনাকে আলোর **প্রতিফলন** বলে। দর্পণ দ্বারা আলোর প্রতিফলন তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় আলোর প্রতিফলন আমরা সর্বদাই দেখিতে পাই।

যদি প্রতিফলকের তল মসৃণ হয় তবে প্রতিফলিত রশ্মিগুলি একটি নির্দিষ্ট দিকে যাইবে এবং আপতিত রশ্মিগুচ্ছের সহিত প্রতিফলিত রশ্মিগুচ্ছের মিল থাকিবে। 4নং চিত্রে একটি মসৃণ তলে এক গুচ্ছ সমান্তরাল রশ্মি আপতিত হইয়াছে। উহাদের প্রতিফলিত রশ্মিগুচ্ছও সমান্তরাল। এই ধরনের প্রতিফলনকে **নিয়মিত** (regular) **প্রতিফলন** বলে। ইহার ফলে প্রতিফলকের যে-অংশ হইতে আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হয়, সেই অংশ চক্‌চকে দেখায়।
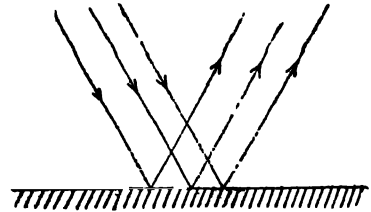
চিত্র 4

5নং চিত্রে একটি রশ্মি লইয়া নিয়মিত প্রতিফলন দেখান হইয়াছে। AO রশ্মি M_1M_2 সমতল দর্পণ দ্বারা OB রশ্মিতে প্রতিফলিত হইয়াছে।

A N B

M_1 O M_2

চিত্র 5

এখানে AO রশ্মিকে **আপতিত রশ্মি** এবং OB-কে **প্রতিফলিত** (reflected) **রশ্মি** বলা হয়। যে বিন্দুতে আপতিত রশ্মি দর্পণের উপর পড়ে (অর্থাৎ O বিন্দু) তাহাকে বলা হয় **আপতন বিন্দু** (point of incidence)। আপতন বিন্দু দিয়া দর্পণের উপর যদি লম্ব টানা যায় (ছবিতে ON), তবে উহাকে **অভিলম্ব** (normal) বলা হয়।

আপতিত রশ্মি অভিলম্বের সহিত যে কোণ উৎপন্ন করে (অর্থাৎ $\angle$ AON) উহাকে **আপতন কোণ** (angle of incidence) এবং প্রতিফলিত

রশ্মি অভিলম্বের সহিত যে-কোণ উৎপন্ন করে (অর্থাৎ ∠BON) উহাকে **প্রতিফলন কোণ** (angle of reflection) বলে।

নিয়মিত প্রতিফলনের সূত্র (Laws of regular reflection) :

(1) আপতিত রশ্মি, প্রতিফলিত রশ্মি ও আপতন বিন্দু দিয়া প্রতিফলকের উপর অঙ্কিত অভিলম্ব একই সমতলে অবস্থান করে।

(2) আপতন কোণ সর্বদা প্রতিফলন কোণের সমান হয় অর্থাৎ, ∠AON = ∠BON.

4.4. **বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন** (Diffuse reflection) :

যদি প্রতিফলকের তল অমসৃণ হয়, তবে প্রতিফলিত রশ্মিগুলি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং আপতিত রশ্মিগুচ্ছের সহিত প্রতিফলিত রশ্মিগুচ্ছের কোন মিল থাকে না। 6নং চিত্রে একগুচ্ছ সমান্তরাল রশ্মি একটি অমসৃণ তলে আপতিত হইয়াছে। প্রতিটি আলাদা রশ্মির নিয়মিত প্রতিফলন হইলেও যেহেতু তল অমসৃণ সেই হেতু তলের বিভিন্ন বিন্দুতে অভিলম্ব বিভিন্ন দিকে হইবে।
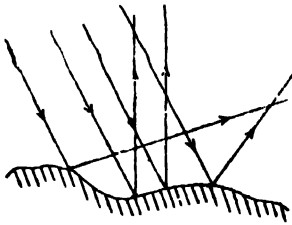
চিত্র 6

সুতরাং প্রতিফলিত রশ্মিগুলি চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইবে ও আপতিত রশ্মির সহিত কোন মিল থাকিবে না। ইহাকে **বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন** বলা হয়।

ঘষা কাচ, সাদা কাগজ, ঘরের দেওয়াল, সিনেমার পর্দা ইত্যাদি অমসৃণ বলিয়া বিক্ষিপ্ত প্রতিফলনের সৃষ্টি করে। ইহার ফলে এই বস্তুগুলি যে-দিক হইতেই দেখা যাক না কেন সর্বত্র সমান উজ্জ্বল দেখাইবে। কিন্তু সমতল দর্পণ নিয়মিত প্রতিফলন সৃষ্টি করে বলিয়া দর্পণের যে-অংশ প্রতিফলনে অংশ গ্রহণ করে সেই অংশই চক্‌চকে দেখায়।

4.5. **প্রতিবিম্ব ও উহার সংজ্ঞা** (Image and its definition) :

প্রতিবিম্ব তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইলে আমরা আমাদের আকৃতির প্রতিবিম্ব দেখি। পুকুরের পাড়ে গাছ থাকিলে জলে উহার প্রতিবিম্ব দেখা যায়। এই প্রতিবিম্বের উৎপত্তি কিরূপে হয় ?

সাধারণত বস্তু হইতে আলোকরশ্মি যখন সোজাসুজি আমাদের চোখে আসে তখন আমরা বস্তুটিকে যথাস্থানে দেখি। কিন্তু যখন আলোক-

রশ্মি প্রতিফলিত বা প্রতিসৃত (refracted) হইয়া বাঁকিয়া আমাদের চোখে আসে তখন মনে হয় বস্তুটি অন্য জায়গায় আছে, কারণ, চোখ আলোকরশ্মির দিক্-পরিবর্তন অনুসরণ করিতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে বস্তুটির কোন স্থান পরিবর্তন হয় না। এই যে নতুন জায়গায় বস্তুটি আছে বলিয়া মনে হয়, তাহাকে বস্তুর **প্রতিবিম্ব** বলে।

সুতরাং যখন কোন বিন্দুপ্রভব (point source) হইতে আগত রশ্মি প্রতিফলিত বা প্রতিসৃত হইয়া অন্য কোন বিন্দুতে মিলিত হয় বা অন্য কোন বিন্দু হইতে অপসৃত হইতেছে বলিয়া মনে হয়, তখন ঐ দ্বিতীয় বিন্দুকে প্রথম বিন্দুপ্রভবের প্রতিবিম্ব বলা হয়।

প্রতিবিম্ব দুই প্রকার হইতে পারে—সদ্-বিম্ব এবং অসদ্-বিম্ব।

সদ্-বিম্ব : বিন্দুপ্রভব হইতে আগত রশ্মিগুচ্ছ প্রতিফলিত বা প্রতিসৃত হইয়া যদি অন্য কোন বিন্দুতে মিলিত হয় তবে ঐ বিন্দুকে প্রভবের সদ-বিম্ব (real image) বলা হয়। 7নং চিত্রে P বিন্দু হইতে রশ্মিগুচ্ছ L উত্তল লেন্স দ্বারা অপসৃত হইয়া P' বিন্দুতে মিলিত হইতেছে এবং পরে চোখে যাইয়া পড়িতেছে। এস্থলে লেন্সের

চিত্র 7
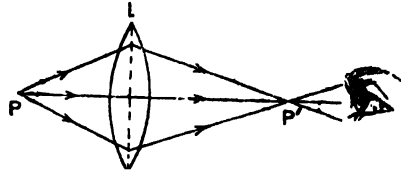
ভিতর দিয়া P বিন্দুর দিকে তাকাইলে চোখ P' বিন্দুতে উহার প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইবে। এই প্রতিবিম্বকে সদ্-বিম্ব বলা হয়। P' বিন্দুতে কোন সাদা পর্দা রাখিলে পর্দায় P বিন্দুর প্রতিবিম্ব পড়িবে।

অসদ্-বিম্ব : যখন বিন্দুপ্রভব হইতে আগত রশ্মিগুচ্ছ প্রতিফলিত বা প্রতিসৃত হইয়া অন্য কোন বিন্দু হইতে অপসৃত হইতেছে বলিয়া মনে হয় তখন ঐ দ্বিতীয় বিন্দুকে প্রভবের অসদ্-বিম্ব (virtual image) বলা হয়। অসদ্-বিম্ব যে-স্থানে গঠিত হয় সেখানে কোন পর্দা রাখিলে পর্দায় কোন প্রতিবিম্ব পড়ে না। আয়নায় আমরা যে-প্রতিবিম্ব দেখি তাহা অসদ্; আয়নার পিছনে,—যেখানে প্রতিবিম্ব গঠিত হইতেছে,—সেখানে কোন পর্দা রাখিলে আমরা পর্দায় কোন প্রতিবিম্ব দেখি না।

সমতল দর্পণ অসদ্-বিম্ব তৈয়ারী করে :

8নং চিত্রে M_1M_2 দর্পণের সম্মুখে একটি মোমবাতি রাখা আছে। P একটি বিন্দু প্রভব। P হইতে রশ্মিগুচ্ছ বহির্গত হইয়া দর্পণ কর্তৃক

প্রতিফলিত হইতেছে এবং চোখে গিয়া পড়িতেছে। চোখ আলোকরশ্মির এই বাঁকা গতিপথ অনুসরণ করিতে পারিবে না। দর্পণের ভিতর দিয়া তাকাইলে মনে হইবে প্রতিফলিত রশ্মিগুলি দর্পণের পশ্চাতে অবস্থিত P' বিন্দু হইতে আসিতেছে। অর্থাৎ মনে হইবে P বিন্দু P' বিন্দুতে অবস্থিত। সুতরাং P' বিন্দু P বিন্দুর অসদ্-বিম্ব। এইভাবে সমগ্র মোমবাতির একটি প্রতিবিম্ব দেখা যাইবে। এস্থলে P' বিন্দুর স্থানে পর্দা রাখিলে পর্দায় কোন প্রতিবিম্ব পড়িবে না। সুতরাং অসদ্‌বিম্ব কেবলমাত্র চোখে দেখা যায়।
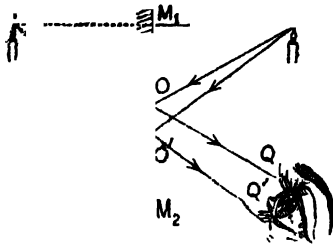
চিত্র ৪

এস্থলে লক্ষণীয় যে দর্পণ হইতে মোমবাতির দূরত্ব এবং প্রতিবিম্বের দূরত্ব সমান।

অসদ্-বিম্বের আরো অনেক সাধারণ উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। যেমন, পুকুরের পাড়ে গাছ থাকিলে জলের ভিতর গাছের প্রতিবিম্ব দেখা যায়। এই বিম্বও অসদ্। এক্ষেত্রে, জলের তল দর্পণের ন্যায় কাজ করে। গাছ হইতে আলোকরশ্মি জল-তল কর্তৃক প্রতিফলিত হইয়া যখন চোখে পৌঁছায় তখন গাছের অসদ্-বিম্ব সৃষ্টি হয়।

সমতল দর্পণে প্রতিবিম্বের পার্শ্বীয় পরিবর্তন :

আয়নার সামনে দাঁড়াইলে আমাদের বাম হাত মনে হয় ডান হাত এবং ডান হাত মনে হয় বাম হাত। একটি কাগজে 'R' কথাটি লিখিয়া আয়নার সামনে ধর। দেখিবে প্রতিবিম্ব পাশের দিকে উল্টাইয়া গিয়াছে (চিত্র 9)। প্রতিবিম্বের এই পরিবর্তনকে পার্শ্বীয় পরিবর্তন বলা হয়। প্রতিসম (symmetrical) বস্তুর প্রতিবিম্বে এইরূপ কোন পরিবর্তন দেখা যায় না।

পার্শ্বীয় পরিবর্তনের কারণ এই যে, দর্পণ হইতে বস্তুর দূরত্ব উহার প্রতিবিম্বের দূরত্বের সমান। প্রতিবিম্বের পার্শ্বীয় পরিবর্তন হইলেও প্রতিবিম্বের আকার সমান থাকে।

চিত্র 9
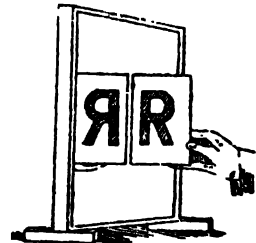
কাগজে কিছু লিখিয়া ব্লটিং কাগজে চাপিলে ব্লটিং কাগজে উল্টা ছাপ পড়ে। ঐ ব্লটিং কাগজখানি আয়নার সম্মুখে ধরিলে উল্টা লেখা পার্শ্বীয় পরিবর্তনের ফলে সোজা দেখা যাইবে।

4.6. আলোকের সমতলে প্রতিসরণ (Refraction of light at a plane surface) :

একটি জলপূর্ণ পাত্রের তলদেশে দৃষ্টিপাত কর। মনে হইবে যেন তলদেশ খানিকটা উপরে উঠিয়া আসিয়াছে। তেমনি, একটি লাঠি বাঁকাভাবে জলে খানিকটা ডুবাইয়া ধর। মনে হইবে যেন লাঠিটি যেখানে জল স্পর্শ করিয়াছে সেখান হইতে লাঠিটি বাঁকা। ইহাতে বোঝা যায়, আলোকরশ্মি জলে যে সরলরেখায় চলে, জল হইতে বায়ুতে প্রবেশ করিলে অন্য সরলরেখায় চলে। অর্থাৎ, **এক মাধ্যম হইতে অন্য মাধ্যমে প্রবেশ করিলে আলোকরশ্মি গতির অভিমুখ পরিবর্তন করে।** আলোকরশ্মির গতির অভিমুখের এই পরিবর্তনকে আলোকের প্রতিসরণ বলে।

ধরা যাউক, একটি আলোকরশ্মি বায়ু মাধ্যমে AB সরলরেখায় আসিয়া একটি কাচের ব্লকের উপর তির্যকভাবে আপতিত হইল (চিত্র 10)। আলোকরশ্মি এইবার কাচের ভিতরে প্রবেশ করিবে। কিন্তু কাচের ভিতরে রশ্মি যে সরলরেখায় যাইবে তাহা AB হইতে ভিন্ন—কারণ B বিন্দুতে আলোকের প্রতিসরণ হইবে। ধরা যাউক, কাচের ভিতর আলোকরশ্মি BC সরলরেখায় গমন করিল। এস্থলে AB আপতিত রশ্মি, BC প্রতিসৃত (refracted) রশ্মি, B আপতন বিন্দু (point of incidence) এবং PQ হইল দুই মাধ্যমের বিভাগ-তলের ছেদ-রেখা (line of section)। যদি B বিন্দু দিয়া PQ রেখার উপর লম্ব টানা যায় (চিত্রে NBN′) তবে উহাকে আপতন বিন্দুতে তলের উপর অভিলম্ব বলা হয়।
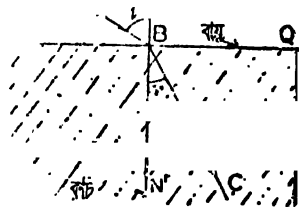
চিত্র 10

আপতিত রশ্মি AB অভিলম্ব BN-এর সহিত যে কোণ উৎপন্ন করে (অর্থাৎ ∠ABN) তাহাকে আপতন কোণ বলে এবং প্রতিসৃত রশ্মি BC উক্ত অভিলম্বের সহিত যে-কোণ উৎপন্ন করে (অর্থাৎ ∠CBN′) তাহাকে প্রতিসৃত কোণ বলে।

দেখা গিয়াছে যে, আলোকরশ্মি যখন লঘু মাধ্যম হইতে ঘন মাধ্যমে প্রতিসৃত হয় (যেমন বায়ু হইতে কাচে) তখন প্রতিসৃত রশ্মি অভিলম্বের দিকে বাঁকিয়া যায় অর্থাৎ প্রতিসৃত কোণ আপতন কোণ অপেক্ষা ছোট হয় (চিত্র 10)।

কিন্তু যদি আলোকরশ্মি ঘন মাধ্যম হইতে লঘু মাধ্যমে প্রতিসৃত হয় (যেমন কাচ হইতে বায়ুতে) তবে প্রতিসৃত রশ্মি অভিলম্ব হইতে দূরে সরিয়া যায়—অর্থাৎ প্রতিসৃত কোণ ($\angle r$) আপতন কোণ ($\angle i$) অপেক্ষা বড় হয় (চিত্র 11)।
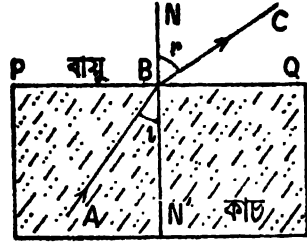
চিত্র 11

4.7. জলে এবং কাচে আলোকরশ্মির প্রতিসরণের পরীক্ষা (Experiments on refraction of light through water and glass) ঃ

(ক) জলের ভিতর প্রতিসরণ ঃ

একটি মাঝারি আকারের জলের টবে খানিকটা জল ঢাল। একখানা মোটা কালো কাগজে একটি ছিদ্র করিয়া টবের পাশে রাখ যাহাতে ছিদ্র দিয়া সূক্ষ্ম সূর্যরশ্মি টবের জলে পড়িতে পারে। পরিষ্কার দেখা যাইবে যে রশ্মি জলে প্রবেশ করিয়া ভিন্ন পথে অগ্রসর হইতেছে এবং টবের তলায় গোল আলোকচক্র সৃষ্টি করিয়াছে (চিত্র 12)। এইবার টব হইতে জল বাহির করিয়া ফেলিলে দেখা যাইবে টবের গায়ে আলোকচক্র পড়িয়াছে এবং উহা কাগজের ছিদ্রের সহিত একই রেখায় অবস্থিত। ইহা হইতে সহজেই বোঝা যায় যে আলোকরশ্মি বায়ু হইতে জলে প্রবেশ করিবার সময় প্রতিসৃত হইল।

চিত্র 12

(খ) কাচের ভিতর প্রতিসরণ ঃ

একটি কাগজের উপর কালির ফোঁটা ফেলিয়া উহার উপর একটি কাচের ব্লক রাখ। এইবার কাচের ভিতর দিয়া সোজাসুজি
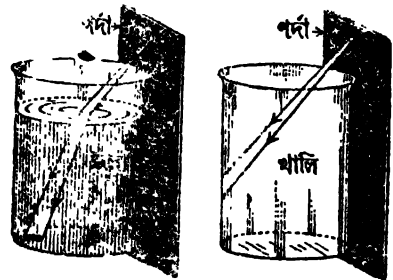
ফোঁটা লক্ষ্য করিলে মনে হইবে যেন উহা খানিকটা উপরে উঠিয়া আছে। আলোকের প্রতিসরণের জন্য এইরূপ মনে হয়।

মনে কর, O বিন্দু হইল ফোঁটা (13 নং চিত্র দেখ)। এখন O বিন্দু হইতে রশ্মি-গুচ্ছকে চোখে পৌঁছাইতে হইলে বায়ুতে প্রবেশ করিতে হইবে। সুতরাং দুই মাধ্যমের বিভাগ-তলে রশ্মির প্রতিসরণ হইবে। যেহেতু রশ্মি ঘন মাধ্যম হইতে লঘু মাধ্যমে যাইতেছে, সেইহেতু প্রতিসৃত রশ্মি অভিলম্ব হইতে দূরে সরিয়া যাইবে এবং দেখা যাইবে যেন রশ্মিগুলি O′ বিন্দু হইতে আসিতেছে।

চিত্র 13

একই কারণে জলভর্তি পাত্রের তলদেশে সোজাসুজি তাকাইলে মনে হয় পাত্রের জল তত গভীর নয়।
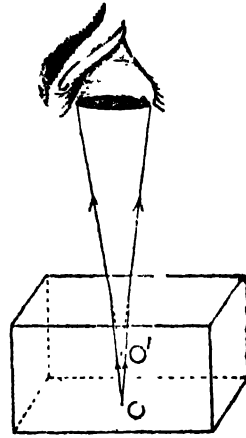
4.8. আলোর প্রতিসরণের কয়েকটি দৃষ্টান্ত (A few examples of refraction of light):

(ক) জলে নিমজ্জিত দণ্ডের বক্রতা :

একটি দণ্ড জলে তির্যকভাবে আংশিক ডুবাইয়া রাখিলে মনে হয় যেন দণ্ড যেখানে জল স্পর্শ করিয়াছে সেখান হইতে বাঁকিয়া গিয়াছে [চিত্র 14]। আলোকের প্রতিসরণের জন্য এইরূপ হয়।

দণ্ডের যে অংশ জলের বাহিরে আছে তাহা হইতে আলোকরশ্মি সোজাসুজি চোখে আসিবে। সুতরাং ঐ অংশকে দর্শক যথাস্থানেই দেখিবে। কিন্তু জলের ভিতরের অংশ হইতে আলোক-রশ্মি যখন চোখে আসিবে তখন জল ও বায়ুর বিভাগতলে প্রতিসৃত হইয়া চোখে পৌঁছাইবে। এস্থলে রশ্মি ঘনতর মাধ্যম হইতে লঘুতর মাধ্যমে প্রবেশ করায় প্রতিসৃত রশ্মি অভিলম্ব হইতে সরিয়া যাইবে এবং মনে হইবে যেন B
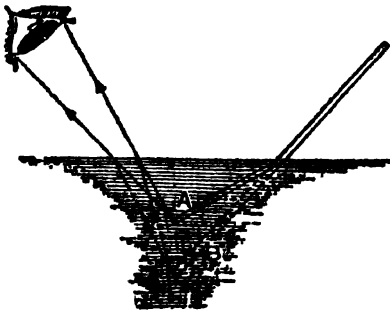
চিত্র 14

বিন্দুটি A বিন্দুতে রহিয়াছে। তেমনি নিমজ্জিত অংশের অন্যান্য বিন্দুগুলিও

ঐভাবে মনে হইবে খানিকটা উঠিয়া আছে। সুতরাং নিমজ্জিত অংশ ও বাহিরের অংশ একই সরলরেখায় না থাকায় মনে হয় লাঠিটা বাঁকিয়া আছে।

(খ) জলে নিমজ্জিত মুদ্রার প্রতিবিম্ব :

একটি কাঁসার বড় বাটিতে এক চক্‌চকে টাকা রাখ এবং চোখকে আস্তে আস্তে সরাইয়া এমন স্থানে আন যাহাতে টাকাটি সদ্য দৃষ্টির অগোচর হয়। এই অবস্থায় টাকা হইতে আলোকরশ্মি বাটির গাত্র দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় চোখে পৌঁছাইবে না।

চোখকে ঐ অবস্থায় রাখিয়া বাটি জলপূর্ণ কর। দেখিবে যে টাকাটি এইবার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। এইরূপ হইবার কারণ আলোকের প্রতিসরণ।
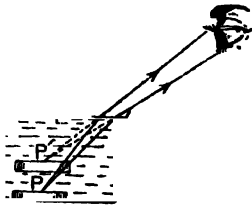
চিত্র 15

বাটিতে জল থাকায় টাকা হইতে আলোকরশ্মি প্রতিসৃত হইয়া চোখে আসিবে এবং মনে হইবে যেন P বিন্দু P´ বিন্দুতে অবস্থিত আছে (চিত্র 15)। অর্থাৎ টাকাটি মনে হইবে খানিকটা উপরে উঠিয়া আসিয়াছে। সুতরাং উহা দৃষ্টির গোচরে আসিবে।

(গ) পুরু আয়না কর্তৃক বস্তুর বহু প্রতিবিম্ব সৃষ্টি :

একটি পুরু কাচের আয়নার সামনে কোন বস্তু—ধর, একটা মোমবাতি রাখিয়া একটু তির্যকভাবে প্রতিবিম্ব দেখিলে দেখা যাইবে যে অনেকগুলি প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হইয়াছে। আলোকের প্রতিফলন ও প্রতিসরণের জন্য এইরূপ হইয়া থাকে।

ধরা যাউক, মোমবাতির P বিন্দু হইতে PA আলোকরশ্মি আয়নার উপর A বিন্দুতে পড়িল (চিত্র 16)। আলোকরশ্মির খুব সামান্য অংশ A বিন্দুতে প্রতিফলিত হইবে এবং উহার জন্য একটি অস্পষ্ট প্রতিবিম্ব Q_1 তৈয়ারী হইবে। আলোকরশ্মির বেশী অংশ কাচের ভিতর প্রতিসৃত হইয়া আয়নার পিছনে পারদ-প্রলেপে আপতিত হইবে এবং সেখান হইতে সম্পূর্ণ প্রতিফলিত হইয়া CD সরলরেখায় আসিয়া D বিন্দুতে আয়নার সম্মুখের তলে আপতিত হইবে। এই আলোকরশ্মির আবার বেশী অংশ D বিন্দুতে প্রতিসৃত হইয়া বায়ুতে প্রবেশ করিবে এবং তাহার ফলে Q_2 প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হইবে।

এই প্রতিবিম্ব খুব স্পষ্ট হইবে। সাধারণত আমরা ইহাকেই আয়নার ভিতর প্রতিফলিত হইতে দেখি। D বিন্দুতে রশ্মির কিছু অংশ প্রতিফলিত হইবে এবং একই পদ্ধতি অনুসারে বার বার প্রতিফলিত ও প্রতিসৃত হইয়া Q_3 ও অন্যান্য প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করিবে। কিন্তু ক্রমশ আলোর তীব্রতা কমিয়া আসায় প্রতিবিম্ব হইয়া যায়। এইভাবে পুরু আয়নায় অনেকগুলি প্রতিবিম্ব দেখা যায়।
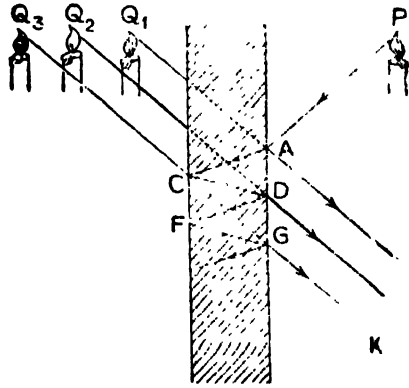
চিত্র 16

4.9. আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন (Total internal reflection) :

আলোকরশ্মি যখন লঘু মাধ্যম হইতে ঘন মাধ্যমে যায়, তখন আপতন কোণ যাহাই হউক না কেন সর্বদা রশ্মির কিছু অংশ দুই মাধ্যমের বিভেদতল হইতে প্রতিফলিত হয় এবং বেশীর ভাগ অংশ ঘন মাধ্যমে প্রতিসৃত হয় ; 17 নং চিত্রে আলোকরশ্মি প্রথমে বায়ু হইতে কাচে এবং পরে কাচ হইতে বায়ুতে প্রবেশ করিতেছে। উভয় ক্ষেত্রেই রশ্মির প্রতিফলন ও প্রতিসরণ হইয়াছে। কিন্তু আলোকরশ্মি ঘন মাধ্যম হইতে লঘু মাধ্যমে যাইবার সময় সর্বদা এইরূপ ঘটনা ঘটে না।
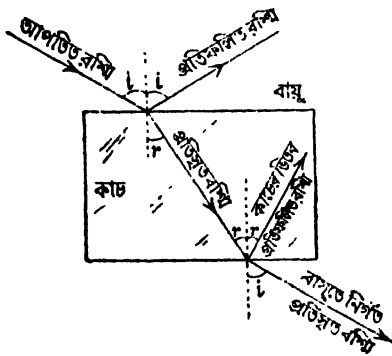
চিত্র 17

ধরা যাউক AB রেখা জল ও বায়ুমাধ্যমদ্বয়ের স্পর্শতল [চিত্র 18 (i)]। এখানে জল ঘন ও বায়ু লঘু মাধ্যম। জলের মধ্যে P_1 বিন্দু হইতে কোন রশ্মি P_1O খুব কম আপতন কোণে স্পর্শতলে O বিন্দুতে আপতিত হইল। এক্ষেত্রে বায়ুতে প্রতিসৃত রশ্মি OQ_1 এবং জলে প্রতিফলিত রশ্মি

OR_1 পাওয়া যাইবে। অবশ্য প্রতিফলিত রশ্মি অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হইবে। আপতন কোণ যত বৃদ্ধি করা যাইবে প্রতিসরণ কোণও তত বৃদ্ধি পাইবে এবং প্রতি ক্ষেত্রেই প্রতিসরণ ও প্রতিফলন হইবে। এইভাবে আপতন কোণ বৃদ্ধি করিয়া গেলে, অবশেষে একটি বিশেষ আপতন কোণে ($i=\theta$),
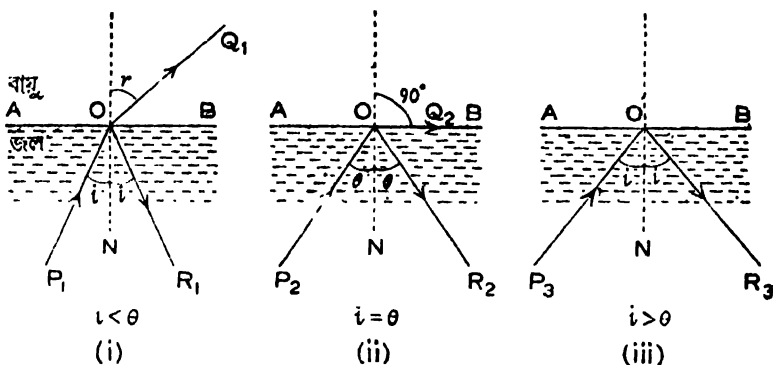
চিত্র 18

প্রতিসৃত রশ্মি OQ_2 মধ্যমদ্বয়ের বিভেদ-তল ঘেঁষিয়া যাইবে অর্থাৎ প্রতিসরণ কোণ 90° হইবে। তখনও একটি ক্ষীণ রশ্মি OR_2 জলের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়া আসিবে [চিত্র 18 (ii)]।

যেহেতু প্রতিসরণ কোণের মান 90° ডিগ্রীর বেশী হওয়া সম্ভব নয়, সেইহেতু বোঝা যাইতেছে যে আপতন কোণ আর একটু বাড়াইলে ($i>\theta$). আলোকরশ্মির সম্পূর্ণ অংশ জলে প্রতিফলিত হইবে এবং কোন প্রতিসৃত রশ্মি পাওয়া যাইবে না। চিত্র 18 (iii)-এ ঐরূপ বর্ধিত আপতন কোণ দেখানো হইয়াছে। তাহার ফলে OR_3 রশ্মি জলে প্রতিফলিত হইয়া আসিয়াছে। এই অবস্থায় মাধ্যমদ্বয়ের বিভেদ-তল আয়নার মত ব্যবহার করে। ইহাকেই **আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন** বলে।

তাছাড়া, যে-আপতন কোণের [চিত্র 18(ii)-এ $\angle P_2ON$] ফলে প্রতিসরণ কোণ 90° হয় তাহাকে উক্ত মাধ্যমদ্বয়ের **সন্ধি কোণ** (critical angle) বলা হয়।

সুতরাং, আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন হইতে গেলে নিম্নলিখিত দুইটি শর্তের অবশ্য প্রয়োজন :

(1) রশ্মিকে ঘন মাধ্যম হইতে লঘু মাধ্যমে যাইতে হইবে।

(2) আপতন কোণ মাধ্যমদ্বয়ের সন্ধি কোণ অপেক্ষা বড় হইবে।

4.10. পূর্ণ প্রতিফলনের কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

(1) একটি লোহার বলের গায়ে ভুসাকালি মাখাইয়া জলে ডুবাও। দেখিবে কালি মাখানো সত্বেও বলের গা চক্‌চকে দেখাইতেছে। পূর্ণ আভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের জন্য এইরূপ হয়।

ভুসাকালি মাখাইবার ফলে বলটিকে জলে রাখিলেও উহার গায়ে একটা পাতলা বায়ুস্তর লাগিয়া থাকে। আলোকরশ্মি জলের ভিতর দিয়া গিয়া ঐ বায়ুস্তরে পড়ে অর্থাৎ ঘন মাধ্যম হইতে লঘু মাধ্যমে যাইবার চেষ্টা করে। চোখ যদি এমনভাবে রাখা যায় যে আপতন কোণ জল ও বায়ুর সন্ধি কোণ অপেক্ষা বেশী হয় তবে আলোকরশ্মি পূর্ণ প্রতিফলিত হইয়া চোখে পৌঁছাইবে। সুতরাং বলের ঐ অংশ আয়নার মত চক্‌চকে দেখাইবে।

একই কারণে জলের ভিতর হইতে বুদ্‌বুদ্‌ উঠিবার সময় চক্‌চকে দেখায় বা কাচের কাগজ-চাপার (paper weight) ভিতর বুদ্‌বুদ্‌গুলি চক্‌চকে দেখায়। হীরা, চুনী, পান্না প্রভৃতি মূল্যবান পাথরের উজ্জ্বলতাও পূর্ণ প্রতিফলনের দরুন হইয়া থাকে।

(2) একটি পাত্র জলপূর্ণ করিয়া উহার ভিতরে একটি কাচের টেস্ট-টিউব আংশিক ডুবাইয়া রাখ। টেস্টটিউবে খানিকটা জল লও। উপর হইতে টেস্টটিউবের নিমজ্জিত খালি অংশে দৃষ্টিপাত করিলে উহা চক্‌চকে দেখাইবে। এইরূপ হইবার কারণ কি ?

আলোকরশ্মি জল হইতে গিয়া টেস্টটিউবের অভ্যন্তরস্থ বায়ুতে প্রবেশ করিতে চায় এবং আপতন কোণ সন্ধি কোণ অপেক্ষা বেশী হইলে পূর্ণ-প্রতিফলিত হইয়া চোখে পৌঁছায় [চিত্র 19]। এই কারণে টেস্ট-টিউবের গাত্র চক্‌চকে দেখায়।

টেস্টটিউবের জলপূর্ণ অংশের দিকে তাকাইলে কিন্তু উহা চক্‌চকে দেখাইবে না। কারণ, আলোকরশ্মি টেস্টটিউবের বাহিরের জল হইতে আসিয়া ভিতরের জলে প্রবেশ করিবে। সুতরাং পূর্ণ প্রতিফলন হইবে না।
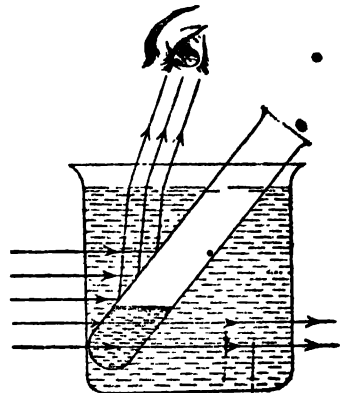
চিত্র 19

4·11. পূর্ণ প্রতিফলনের প্রাকৃতিক দৃষ্টান্ত :

মরু অঞ্চলে বা শীতপ্রধান দেশে কোন দূরের বস্তু সম্বন্ধে লোকের এক প্রকার দৃষ্টিভ্রম (optical illusion) হয়। মরু অঞ্চলে মনে হয়, কোন দূরের গাছপালা কোন জলাশয় কর্তৃক প্রতিফলিত হইতেছে এবং শীতপ্রধান দেশে মনে হয় কোন দূরের বস্তুর উল্টা প্রতিবিম্ব আকাশে ঝুলিয়া আছে। এই ধরণের দৃষ্টিভ্রমকে **মরীচিকা** (mirage) বলে। ইহা আলোকের পূর্ণ প্রতিফলনের জন্য হইয়া থাকে।

মরুভূমির মরীচিকা : মরুভূমিতে সূর্যের উত্তাপে বালি খুব উত্তপ্ত হয় এবং উহার সংলগ্ন বায়ুস্তরও উত্তপ্ত হয়। ফলে ঐ বায়ুস্তরের আয়তন বাড়িয়া যায় ও ঘনত্ব কমিয়া যায়। যত উপরে ওঠা যায় তাপমাত্রা তত কম থাকে এবং তাহার ফলে উপরে ক্রমশ ঘনতর বায়ুস্তর অবস্থান করে। দূরের একটি গাছের কোন বিন্দু P হইতে যে কোন নিম্নগামী আলোকরশ্মি শীতল বায়ুস্তর হইতে উত্তপ্ত বায়ুস্তরে (অর্থাৎ ঘন মাধ্যম হইতে লঘু মাধ্যমে) যাওয়ার ফলে প্রতিসৃত হইবে এবং অভিলম্ব হইতে দূরে সরিয়া যাইবে। এইভাবে ক্রমশ বাঁকিতে বাঁকিতে অবশেষে এমন একটি স্তরে—যেমন Q-স্তরে আসিয়া পৌঁছাইবে যখন আপতন কোণ সেই স্তর ও পরবর্তী নিম্ন স্তরের সন্ধি কোণ অপেক্ষা বেশী হইবে [চিত্র 20 (ক)]। তখন রশ্মির প্রতিসরণ না হইয়া আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন হইবে এবং প্রতিফলিত রশ্মি উপর দিকে যাত্রা সুরু করিবে। এইবার রশ্মি লঘুতর স্তর হইতে ঘনতর স্তরে প্রতিসৃত হওয়ায় ক্রমশ উপরের দিকে বাঁকিয়া যাইবে এবং অবশেষে মানুষের চোখে পৌঁছাইবে। চোখ রশ্মির এই বক্রপথ অনুসরণ করিতে পারিবে না। চোখ দেখিবে যেন রশ্মি P' বিন্দু হইতে আসিয়াছে। P' বিন্দু হইবে P বিন্দুর প্রতিবিম্ব। এই-ভাবে মানুষ সমগ্র গাছের একটা উল্টা প্রতিবিম্ব দেখিবে। তাছাড়া, তাপমাত্রার অনবরত পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন বায়ুস্তরের ঘনত্ব ও প্রতিসরাঙ্ক সর্বদা পরিবর্তিত হয়। ইহাতে প্রতিবিম্বের মৃদু আন্দোলন হইতেছে বলিয়া মনে হয়, যেমন বায়ুপ্রবাহের
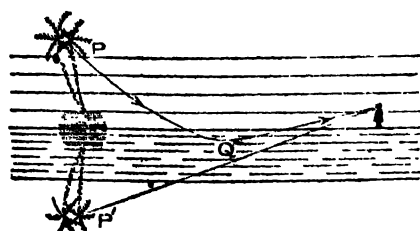
চিত্র 20(ক)

ফলে জলাশয়ের জল কম্পিত হইলে প্রতিবিম্ব আস্তে আস্তে আন্দোলিত হয়। গাছ হইতে সোজাসুজি যে-রশ্মি চোখে পৌঁছায় তাহার দরুন গাছকে যথাস্থানে দেখা যায়। এই সব মিলিয়া মানুষের চোখে জলাশয় কর্তৃক প্রতিবিম্বের সৃষ্টি হইয়াছে এইরূপ দৃষ্টিভ্রম হয়।

অনুরূপ কারণে গ্রীষ্মকালে প্রখর সূর্যকিরণে সোজা পীচের রাস্তার দিকে তাকাইলে কিছুদূরে রাস্তা চকচকে ও জলসিক্ত বলিয়া মনে হয়—যেন ঐ স্থানে বৃষ্টি হইয়াছে। ইহাও মরীচিকার ন্যায় একটি দৃষ্টিভ্রম।

শীতপ্রধান দেশে মরীচিকা : শীতের দেশে বায়ুস্তরের ঘনত্ব যত উপরে যাওয়া যায় তত কমিয়া যায়। সুতরাং কোন দূরের বস্তু হইতে যে আলোকরশ্মি ঊর্ধ্বগামী হয় তাহা ঘনতর মাধ্যম হইতে লঘু মাধ্যমে যাওয়ার ফলে অভিলম্ব হইতে দূরে প্রতিসৃত হয়। এইভাবে ক্রমশ আপতন কোণ বৃদ্ধি পাইয়া অবশেষে একটি স্তর হইতে পূর্ণ প্রতিফলন হয়। তখন রশ্মি নিম্নগামী হইয়া মানুষের চোখে পৌঁছায় এবং মনে হয় উপরের কোন এক বিন্দু হইতে আসিয়াছে। এইরূপে সমগ্র বস্তুর একটা উল্টা প্রতিবিম্ব আকাশে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখা যায় [20 (খ)]।
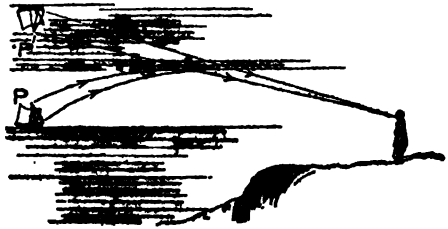
চিত্র 20(খ)

4.12. আলোর গতিবেগ (Velocity of light) :

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, আলো বায়ুমধ্যে সেকেণ্ডে প্রায় 186,000 মাইল গতিবেগ লইয়া চলে। সুতরাং আলোর গতিবেগ প্রচণ্ড। প্রকৃতপক্ষে কোন বস্তুর গতিবেগ আলোর গতিবেগকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে না।

সূর্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব প্রায় 93,000,000 মাইল। উপরোক্ত গতিবেগ লইয়া চলিবার ফলে সূর্য হইতে পৃথিবীতে পৌঁছাইতে আলোর প্রায় 8·3 মিনিট সময় লাগে। কিন্তু নভোমণ্ডলে এমন এমন নক্ষত্র বা গ্রহ আছে যাহাদের দূরত্ব সূর্যের দূরত্বের বহুগুণ। সুতরাং সেই সমস্ত বস্তু হইতে পৃথিবীতে

আলো আসিতে যথেষ্ট সময় লাগে। এই সমস্ত গ্রহ বা নক্ষত্রে কোন মুহূর্তে পৃথিবী হইতে কিছু লক্ষ্য করিলে তাহা ঠিক সেই মুহূর্তে ঘটে না ; তাহার বেশ কিছু পূর্বে ঘটে। যেমন পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা নিকটতম স্থির নক্ষত্র (fixed star) 'আল্ফা সেনটাউরী' (Alpha centauri) হইতে আজ যে আলো আসিয়া পৃথিবীতে পৌঁছাইবে তাহা উক্ত নক্ষত্র হইতে 4·4 বৎসর পূর্বে যাত্রা করিয়াছে। যদি নভোমণ্ডলের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল নক্ষত্র 'সাইরাস' (sirius) আজ হঠাৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তবে উহা হইতে আলো আরো 8·8 বৎসর ধরিয়া পৃথিবীতে পৌঁছাইবে অথবা, পৃথিবী হইতে উহাকে আরো 8·8 বৎসর ব্যাপী দেখা যাইবে। সুতরাং একথা বলা যাইতে পারে যে, পৃথিবী হইতে আমরা আজ যে-সকল নক্ষত্র দেখিতেছি তাহাদের অনেকেই হয়ত বহুবৎসর পূর্বেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

আলোর গতিবেগ নির্ণয়ের প্রথম পরীক্ষা করেন ডেনমার্কের জ্যোতির্বিজ্ঞানী রোমার। পরে ফিজু, মাইকেলসন, অ্যাণ্ডারসন এবং আরো অনেক বিজ্ঞানী এই সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়াছেন। সর্বাধুনিক পরিমাপ অনুযায়ী শূন্যে আলোর গতিবেগ, $V = 299{,}774 \pm 5$ কিলোমিটার/সে.

$= 2·99{,}774 \times 10^{10}$ সে.মি./সে.

$= 186{,}285$ মাইল/সে.

4.13. আলোক বর্ষ (Light year) :

বিরাট মহাকাশে যে অসংখ্য নক্ষত্ররাজি আছে তাহাদের পারস্পরিক দূরত্ব এত বেশি যে মাইলে প্রকাশ করিলে উহা বিরাট সংখ্যায় দাঁড়াইবে। এই সুবিশাল দূরত্ব সমূহকে প্রকাশ করিবার জন্য জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা 'আলোক বর্ষ'কে দূরত্বের একক হিসাবে ব্যবহার করেন।

সংজ্ঞা : প্রতি সেকেণ্ডে 186,000 মাইল গতিবেগ লইয়া আলো এক বৎসর সময়ে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাহাকে এক আলোক-বর্ষ ধরা হয়।

সুতরাং 1 আলোক-বর্ষ $= 186{,}000 \times 365 \times 24 \times 60 \times 60$ মাইল

$= 5·86 \times 10^{12}$ মাইল (প্রায়)।

অথবা, 1 আলোক-বর্ষ $= 300{,}000 \times 365 \times 24 \times 60 \times 60$ কিলোমিটার

$= 9·45 \times 10^{12}$ কিলোমিটার (প্রায়)।

4.14. লেন্স ও আলোর প্রতিসরণ (Lens and refraction of light) **:**

বহু পূর্বকাল হইতে লেন্স ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছকে একবিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করিবার যে-ক্ষমতা লেন্সের আছে তাহা বহুপূর্ব হইতেই জানা ছিল এবং লেন্সের এই ধর্মকে অবলম্বন করিয়া বহুশত বৎসর পূর্বে 'Furning glass' বা আতসী কাচের উদ্ভাবন হইয়াছিল। আধুনিককালে চশমা, ক্যামেরা, অণুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ প্রভৃতি নানারকম প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিতে লেন্সের বহুল প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়।

কোন স্বচ্ছ প্রতিসারক (refracting) মাধ্যমকে যদি দুইটি গোলীয় অথবা একটি গোলীয় ও একটি সমতল তল দ্বারা সীমাবদ্ধ করা যায়, তবে সেই মাধ্যমকে লেন্স বলে।

চিত্র 21

যে লেন্সের মধ্যস্থল মোটা এবং প্রান্তের দিকটা সরু এবং উভয়তল গোলীয় তাহাকে **উত্তল** বা **অভিসারী** (Converging) **লেন্স** বলে [চিত্র 21]।

উত্তল লেন্সের অভিসারী ক্ষমতা (Focussing action of a convex lens) **:** ধর, আমরা একটি উত্তল লেন্স লইলাম এবং একটি বস্তুবিন্দু P হইতে একটি আলোকরশ্মি PB লেন্সের উপর B বিন্দুতে গিয়া পড়িল [চিত্র 22]। যেহেতু রশ্মিটি বায়ু হইতে কাচে প্রবেশ করিবে সেইহেতু উহা B বিন্দুতে অঙ্কিত অভিলম্বের দিকে ঘেঁসিয়া BC পথে যাইবে কারণ বায়ু অপেক্ষা কাচ ঘনতর মাধ্যম। যখন উহা C বিন্দুতে কাচ হইতে পুনরায় বায়ুতে নির্গত হয় তখন উহা আবার অভিলম্ব হইতে দূরে সরিয়া গিয়া CQ বরাবর চলিয়া
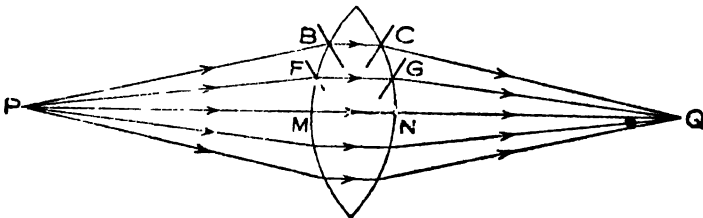
চিত্র 22

যায়। P বিন্দু হইতে আর একটি রশ্মি PF লেন্সের F বিন্দুতে অঙ্কিত অভিলম্বের সহিত পূর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতর কোণে গিয়া আপতিত হওয়ায়, উহা কম বাঁকিবে এবং FG বরাবর গিয়া G বিন্দু হইতে নির্গত হইবে। দেখা যাইবে এই রশ্মিও Q বিন্দুর ভিতর দিয়া যাইতেছে। অনুরূপভাবে লেন্সের মধ্যস্থলে

আপতিত আর একটি রশ্মি PM যাহা লেন্সের ঐ অঞ্চলে অভিলম্বভাবে পড়িল. তাহা প্রতিসৃত না হইয়া সোজাপথে Q বিন্দুর ভিতর দিয়া চলিয়া যাইবে। লেন্সের পৃষ্ঠদ্বয় গোলকের অংশ হওয়ায় P হইতে যা-কিছু রশ্মি উত্তল লেন্সের উপর পড়িবে, লেন্স কর্তৃক প্রতিসৃত হইবার পর উহারা সব Q বিন্দু দিয়া যাইবে। এই ঘটনাকে উত্তল লেন্সের ফোকাসিং বা অভিসারী ক্ষমতা বলা হয়।

লেন্সের দুই পৃষ্ঠ দুইটি গোলকের অংশ। ঐ গোলকদ্বয়ের কেন্দ্রবিন্দু P এবং Q হইলে [চিত্র 22], ঐ বিন্দুদ্বয়কে যোগ করিয়া যে সরলরেখা অর্থাৎ PMNQ সরলরেখা পাওয়া যায়, তাহাকে লেন্সের **প্রধান অক্ষ** বলে।

ফোকাস ও ফোকাস-দূরত্ব (Focus and focal length) : কোন উত্তল লেন্সের প্রধান অক্ষের সমান্তরাল কোন রশ্মিগুচ্ছ লেন্সের উপর আপতিত হইলে লেন্স কর্তৃক প্রতিসরণের ফলে রশ্মিগুচ্ছ অভিসারী রশ্মিগুচ্ছে পরিণত হয় এবং প্রধান অক্ষের উপরে অবস্থিত কোন এক বিন্দুতে মিলিত হয় [চিত্র 23]। উক্ত বিন্দুকে উত্তল লেন্সের **ফোকাস্** বলা হয়। চিত্রে F বিন্দু লেন্সের ফোকাস্।
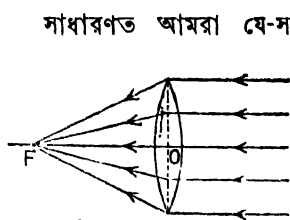
সাধারণত আমরা যে-সমস্ত লেন্স ব্যবহার করি তাহার দুইটি তলই সমানভাবে বাঁকানো। ঐ ধরনের লেন্সের প্রধান অক্ষের উপর অবস্থিত এবং লেন্সের উভয় তল হইতে সমদূরবর্তী বিন্দুকে (O) লেন্সের **আলোক কেন্দ্র** (optical centre) বলে। লেন্স সরু হইলে কোন আলোকরশ্মি আলোককেন্দ্রের ভিতর দিয়া গেলে সোজা বাহির হইয়া আসে ; উহার কোন প্রতিসরণ হয় না। লেন্সের আলোককেন্দ্র O হইতে ফোকাস্ F-র দূরত্বকে **ফোকাস দূরত্ব** বলে। 23 নং চিত্রে প্রদর্শিত লেন্সের ফোকাস দূরত্ব হইবে OF.

চিত্র 23

লেন্স কর্তৃক বস্তুর প্রতিবিম্ব গঠন (Formation of images by a lens) : আমরা জানি যে, কোন বস্তু হইতে নির্গত আলোকরশ্মি যদি প্রতিসৃত হয় তবে ঐ প্রতিসৃত রশ্মি বস্তুর প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে। প্রতিসৃত রশ্মিগুলি যদি কোন বিন্দুতে মিলিত হয় তবে ঐ বিন্দু হইবে বস্তু-বিন্দুর

সদ্-বিম্ব এবং যদি কোন বিন্দু হইতে অপসৃত হইতেছে বলিয়া মনে হয় তবে ঐ বিন্দু হইবে বস্তু-বিন্দুর অসদ্-বিম্ব। যেহেতু লেন্স একটি প্রতিসারক মাধ্যম, অতএব, লেন্স উপরোক্ত পদ্ধতিতে বস্তুর প্রতিবিম্ব গঠন করিতে সক্ষম। প্রকৃতপক্ষে উত্তল লেন্স দ্বারা আমরা বস্তুর সদ্ ও অসদ্-বিম্ব গঠন করিতে পারি।

পরীক্ষা: একটি মোমবাতির শিখা ও একটি দণ্ডে আবদ্ধ কাগজের পর্দা পরস্পর হইতে খানিকটা দূরে রাখ। এইবার আর একটি দণ্ডে

চিত্র 24
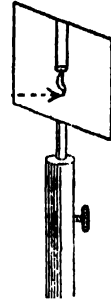
একটি উত্তল লেন্স আটকাও এবং পর্দা ও শিখার মাঝখানে বসাও। লক্ষ্য রাখ যে শিখার অগ্রভাগ, লেন্সের মধ্যস্থল এবং পর্দার মধ্যস্থল যেন এক সরলরেখায় থাকে। এখন লেন্সটিকে একটু অগ্র-পশ্চাৎ সরাও। দেখিবে লেন্সের কোন এক অবস্থানে কাগজের উপর শিখার একটি স্পষ্ট কিন্তু উল্টা প্রতিবিম্ব পড়িবে (চিত্র 24)। এস্থলে উত্তল-লেন্স সদ্‌বিম্ব গঠন করিল। সদ্‌বিম্ব সর্বদা উল্টা হইবে।

4·15. প্রতিবিম্ব অঙ্কনের নিয়ম :

উত্তল লেন্স বস্তুর যে প্রতিবিম্ব গঠন করে জ্যামিতিক উপায়ে তাহা অঙ্কন করিবার পদ্ধতি নিম্নে বলা হইল।

LO একটি উত্তল লেন্স এবং PQ একটি বস্তু লেন্সের
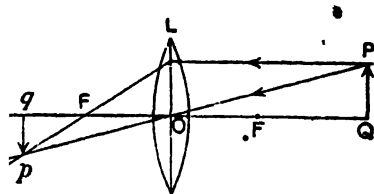
চিত্র 25 (ক)

প্রধান অক্ষের উপর লম্বভাবে দণ্ডায়মান এবং লেন্স হইতে যথেষ্ট দূরে অবস্থিত। একটি রশ্মি PL [চিত্র 25 (ক)] প্রধান অক্ষের সমান্তরালে আসিয়া

প্রতিসৃত হইবার পর ফোকাস বিন্দু F-এর মধ্য দিয়া LFp পথে যাইবে। আর একটি রশ্মি PO আলোক-কেন্দ্রের মধ্য দিয়া সোজাসুজি চলিয়া আসিল। দুইটি প্রতিসৃত রশ্মি p বিন্দুতে মিলিত হওয়ায় pq হইবে বস্তুর সদ্-বিম্ব। বস্তু PQ বহু দূরে থাকিলে প্রতিবিম্ব pq আকারে ছোট হইবে এবং উল্টা হইবে।
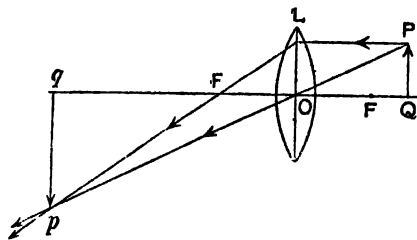
চিত্র 25 (খ)

যদি বস্তু PQ ফোকাস বিন্দুর ঠিক ডানদিকে থাকে তবে প্রতিবিম্ব আকারে বড় হয়। উহা কিরূপে অঙ্কন করিতে হয় তাহা চিত্র 25 (খ)-এ দেখানো হইয়াছে।

4·16. **বিবর্ধক কাচ হিসাবে উত্তল লেন্সের ব্যবহার** (Convex lens as a magnifying glass) ঃ

ধর, PQ একটি ক্ষুদ্রবস্তু বিবর্ধক কাচে বড় করিয়া দেখিতে হইবে [চিত্র 26 (ক)]। একটি উত্তল লেন্স L এমনভাবে বসানো হইল যে PQ বস্তু লেন্সের ফোকাস-দূরত্বের (OF) ভিতরে পড়ে। P বিন্দু হইতে একটি রশ্মি PL লেন্সের অক্ষের সমান্তরালভাবে লেন্সে পড়িলে, উহা
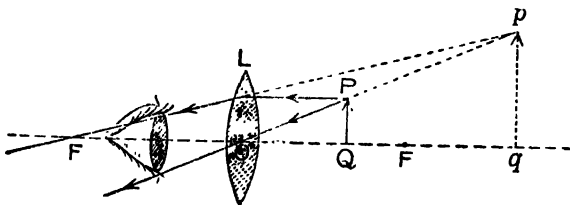
চিত্র 26 (ক)

ফোকাসবিন্দুর (F) ভিতর দিয়া চলিয়া যাইবে। আর একটি রশ্মি PO লেন্সের আলোক-কেন্দ্রে (O) আপতিত হইলে বিনা প্রতিসরণে সরাসরি নির্গত হইবে। এই রশ্মিদ্বয় পশ্চাতে অবস্থিত p বিন্দু হইতে আসিতেছে বলিয়া মনে হইবে। এইভাবে লেন্স বস্তুর সোজা, অসদ্ এবং বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব pq গঠন করিবে। লেন্সের অপর পার্শ্বে চোখ রাখিলে PQ বস্তুর পরিবর্তে বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব pq।

দেখা যাইবে। বস্তু হইতে লেন্সের দূরত্ব নিয়ন্ত্রিত করিলে চোখ ঐ বিবর্ধিত প্রতিবিম্বকে বিনা ক্লেশে স্পষ্ট দেখিতে পাইবে।

26 (খ) চিত্রে বিবর্ধক কাচের প্রকৃত আকৃতি দেখানো হইয়াছে। ছোট জিনিস—যেমন ছোট অক্ষর ইত্যাদি—যাহা খালি চোখে ভাল দেখা যায় না, তাহা স্পষ্ট ও বড় করিয়া দেখিবার জন্য বিবর্ধক কাচ ব্যবহার করা হয়। একটি গোল ফ্রেমে উত্তল লেন্সকে বসানো হয় এবং ফ্রেমের সহিত একটি হাতল যুক্ত করা থাকে।
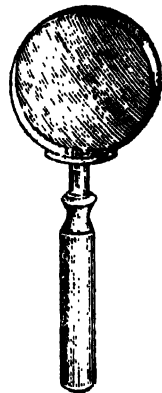
4.17. আলোর বিচ্ছুরণ (Dispersion of light)

1666 খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার আইজাক নিউটন আলোর বিচ্ছুরণ আবিষ্কার করেন। তিনি দেখিতে পান যে সূর্যরশ্মি (সাদা আলো) কাচের প্রিজমের (ইহা একটি ত্রিপার্শ্ব কাচ) ভিতর দিয়া গেলে সাতটি বর্ণের রশ্মিতে বিভক্ত হইয়া পড়ে।

চিত্র 26(খ)

পরীক্ষা : একটি অস্বচ্ছ পর্দায় H একটি ছিদ্র (চিত্র 27)। ছিদ্র দিয়া সাদা আলোকরশ্মি একটি ত্রিপার্শ্ব কাচ বা প্রিজম P-এর উপর গিয়া পড়িল। আলোকরশ্মি প্রিজম হইতে নির্গত হইয়া যখন একটি পর্দা S-এর উপর পড়িবে তখন পর্দায় বিভিন্ন বর্ণ বিশিষ্ট একটি পটি (band) দেখিতে পাওয়া যাইবে।

উক্ত বর্ণবিশিষ্ট পটিকে পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে, উহাতে রাম-

চিত্র 27
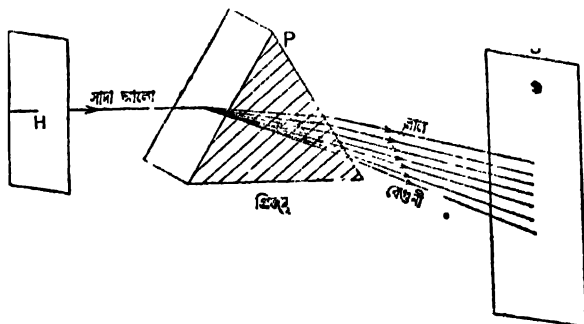
ধনুর সাতটি বর্ণ বর্তমান এবং উহার এক প্রান্তে লাল এবং অপর প্রান্তে

বেগুনী। অন্যান্য বর্ণগুলি হইতেছে কমলা (orange), হলদে (yellow), সবুজ (green), নীল (blue), গাঢ়নীল (indigo)। এই বর্ণগুলির ক্রমিক অবস্থান ইংরেজী VIBGYOR (প্রত্যেক বর্ণের প্রথম অক্ষর লইয়া গঠিত) কথা হইতে পাওয়া যাবে।

এই বর্ণবিশিষ্ট পটিকে **বর্ণালী** (spectrum) বলা হয়। প্রিজমের ভিতর দিয়া যাইবার ফলে সাদা রংয়ের আলো বিশ্লিষ্ট হইয়া সাতটি বর্ণের আলোতে বিভক্ত হইবার প্রণালীকে বলা হয় **আলোকের বিচ্ছুরণ**।

বর্ণালী প্রদর্শনের উপায় (Demonstration of spectrum) ঃ পরিষ্কার স্পষ্টভাবে বর্ণালী প্রদর্শন করিতে হইলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

S একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র L_1 উত্তল লেন্সের ফোকাসে অবস্থিত [চিত্র 28]। ছিদ্রটি সাদা আলোকে অলোকিত। ছিদ্র হইতে নির্গত সাদা আলোক-রশ্মিগুচ্ছ লেন্স কর্তৃক প্রতিসৃত হইয়া সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছে পরিণত হইবে। এই সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ অতঃপর একটি প্রিজম P-এর উপর আপতিত হইল।
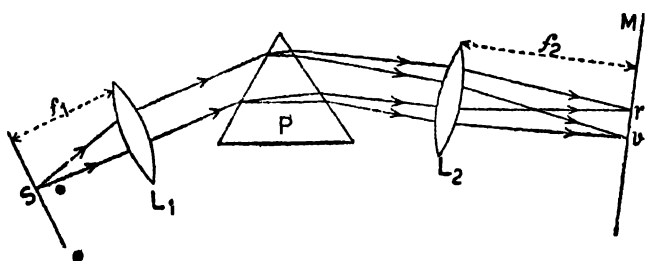
চিত্র 28

সাদা রশ্মিগুচ্ছ প্রিজম কর্তৃক বিচ্ছুরিত হইবে। বিচ্ছুরিত লালবর্ণের রশ্মিগুলি পরস্পর সমান্তরাল, সব বেগুনী বর্ণের রশ্মিগুলি পরস্পর সমান্তরাল ইত্যাদি। এবার এই বিভিন্ন বর্ণের সমান্তরাল রশ্মিগুলি আর একটি উত্তল লেন্স L_2-তে আপতিত হইলে এই লেন্স সব বর্ণরশ্মিগুলিকে পৃথক পৃথক ভাবে পর্দার উপর কেন্দ্রীভূত করিবে। তখন পর্দায় স্পষ্টভাবে সাতটি বর্ণ দেখা যাইবে। পর্দাকে এই লেন্সের ফোকাসে রাখিতে হইবে।

প্রশ্নাবলী

1. আলোক মাধ্যম কাহাকে বলে ? স্বচ্ছ, অস্বচ্ছ এবং ঈষৎ স্বচ্ছ মাধ্যম কাহাকে বলে ?

2. আলোকরশ্মি ও রশ্মিগুচ্ছের মধ্যে তফাৎ কি ? অপসারী, অভিসারী এবং সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ কাহাকে বলে ?

3. আলোকের প্রতিফলন কাহাকে বলে ? প্রতিফলনের নিয়ম কি ? প্রতিবিম্ব বলিতে কি বোঝ ? কয়প্রকার প্রতিবিম্ব আছে ? উহাদের পার্থক্য কি ?

4. সমতল দর্পণ কিরূপে বস্তুর প্রতিবিম্ব গঠন করে ? এইরূপ 'প্রতিবিম্বের পার্শ্বীয় পরিবর্তন হয়'—ইহা বলিতে কি বোঝ ?

5. আয়নায় আলো পড়িলে চক্‌চকে দেখায় কিন্তু দেওয়ালে আলো পড়িলে চক্‌চকে দেখায় না। কেন ?

6. (ক) সমতল দর্পণ, (খ) বাড়ীর দেওয়াল এবং (গ) পরিষ্কার কাচের প্লেট কর্তৃক প্রতিফলনের ভিতর পার্থক্য কি ?

7. কোন বিন্দুপ্রভব হইতে নির্গত আলোকরশ্মি সমতল দর্পণ কর্তৃক প্রতিফলিত হইয়া অপর একটি বিন্দু হইতে অপসৃত হয়, তাহা দেখাও। ঐ বিন্দুকে কি বলে ? উহার অবস্থান কোথায় ? উহার প্রকৃতি কিরূপ ?

8. আলোকের প্রতিসরণ কাহাকে বলে ? নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে কিরূপে আলোর প্রতিসরণ হয় তাহা ছবি আঁকিয়া বুঝাইয়া দাও :—(ক) বায়ু হইতে কাচে, (খ) জল হইতে বায়ুতে।

9. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির জবাব দাও :

(i) একটি দণ্ডকে কাত করিয়া আংশিক জলে ডুবাইলে বাঁকা দেখায় কেন ?

(ii) একটি জলপূর্ণ পাত্র একটু অগভীর মনে হয় কেন ?

(iii) পুরু দর্পণে বস্তুর বহু প্রতিবিম্ব দেখা যায় কেন ?

10. অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন ও সন্ধি কোণ কাহাকে বলে পরিষ্কার ভাবে বুঝাইয়া দাও। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সন্ধি কোণ পাওয়া যাইবে কি না বল : (ক) আলোকরশ্মি বায়ু হইতে কাচে যাইতেছে, (খ) আলোকরশ্মি কাচ হইতে বায়ুতে আসিতেছে।

11. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির জবাব লেখ : (ক) ভুষাকালি মাখা ধাতব বল জলে ডুবাইলে চক্‌চকে দেখায় কেন ? (খ) কাচের জানালায় ফাটল থাকিলে উহা চক্‌চকে দেখায় কেন ? (গ) একটি খালি কাচের নল জলপূর্ণ পাত্রে তির্যকভাবে রাখিলে নিমজ্জিত অংশ চক্‌চকে দেখায় কেন ? (ঘ) গ্রীষ্মকালে প্রখর সূর্যকিরণে পিচের রাস্তা বরাবর তাকাইলে কিছুদূরে রাস্তা জলসিক্ত বলিয়া মনে হয় যদিও প্রকৃতপক্ষে সেখানে জল নাই। এরূপ হয় কেন ?

12. মরীচিকা কাহাকে বলে ? সুন্দর নকশার সাহায্যে মরীচিকা কিরূপে সৃষ্টি হয় তাহা বর্ণনা কর।

13. বায়ুতে আলোর গতিবেগ কত ? রাত্রে আকাশে যত তারা দেখা যায় তাহাদের কাহারও কাহারও অস্তিত্ব বহু বৎসর পূর্বে লোপ পাইয়াছে। এই উক্তি ব্যাখ্যা কর।

14. আলোকবর্ষ কি ? কত মাইলে এক আলোকবর্ষ হয় ?

15. উত্তল লেন্স কাহাকে বলে? উহার ফোকাস ও ফোকাস-দূরত্বের সংজ্ঞা লেখ। লেন্সের ভিতর দিয়া আলোর প্রতিফলন হয় না প্রতিসরণ হয়?

16. বিবর্ধক কাচরূপে উত্তল লেন্সের কার্য প্রণালী চিত্রসহযোগে ব্যাখ্যা কর।

17. আলোর বিচ্ছুরণ কাহাকে বলে? বর্ণালী কি? সাদা আলো কি কি বর্ণের আলোর সংমিশ্রণ?

18. নিম্নে কতকগুলি প্রশ্ন দেওয়া হইল এবং উহাদের পাশে সম্ভাব্য কতকগুলি উত্তর দেওয়া হইল। যে উত্তরটি তোমার কাছে সর্বাপেক্ষা যুক্তিসংগত মনে হইবে তাহার পাশে √ চিহ্ন দাও:

(i) যে মাধ্যমের ভিতর দিয়া আলো আংশিকভাবে যাইতে পারে তাহাকে কি মাধ্যম বলা হয়? উঃ। স্বচ্ছ, ঈষৎস্বচ্ছ, অস্বচ্ছ।

(ii) সিনেমার পর্দা সাদা করা হয় কেন? উঃ। নিয়মিত প্রতিফলন হইবে বলিয়া, সাদা পশ্চাদপটে কালো ছবি ভালো ফুটিবে বলিয়া, বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন হইবে বলিয়া।

(iii) পুরু দর্পণে একাধিক প্রতিবিম্ব দেখা যায় কেন? উঃ। বারবার প্রতিফলনের জন্য, বারবার প্রতিসরণের জন্য; বারবার প্রতিফলন ও প্রতিসরণের জন্য।

(iv) সমতল দর্পণ যে প্রতিবিম্ব গঠন করে তাহার কি কি বৈশিষ্ট্য আছে? উঃ। সমান সাইজ; সদ্, উল্টা, অসদ্, সোজা ও দ্বিগুণ সাইজ।

(v) পূর্ণ আভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের শর্ত কি কি? উঃ। আলোকরশ্মি লঘু মাধ্যম হইতে ঘন মাধ্যমে যাইবে; আপতন কোণ সন্ধি কোণ অপেক্ষা বেশী হইবে; আলোকরশ্মি ঘন হইতে লঘু মাধ্যমে যাইবে।

(vi) উত্তল লেন্স কি ধরণের প্রতিবিম্ব গঠন করিতে পারে? উঃ। সদ্, বিবর্ধিত, অসদ্ ক্ষুদ্রতর; সমান সাইজের।

রসায়ন

প্রথম পরিচ্ছেদ

পদার্থের পরিচয়

1.1. পদার্থের তিন অবস্থা (Three states of matter) **:**

পৃথিবীর পদার্থরাশি বিপুল ও অজস্র। এই পদার্থরাশি পাওয়া যায় কঠিন, তরল ও গ্যাস—, এরূপ তিন অবস্থায়। লোহা, সোনা, রূপা, তামা, পাথর, কাঁকর, বালি, চিনি, লবণ ইত্যাদিকে বলা হয় কঠিন পদার্থ (solid)। জল, তেল, পারদ, পেট্রল ইত্যাদি কয়েকটি তরল পদার্থের (liquid) উদাহরণ। বায়ু, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড ইত্যাদিকে বলা হয় গ্যাসীয় পদার্থ (gas)।

কঠিন পদার্থের বৈশিষ্ট্য : (i) স্বাভাবিক অবস্থায় কঠিন পদার্থের আকার ও আয়তন সর্বদা অপরিবর্তিত অর্থাৎ নির্দিষ্ট থাকে। (ii) কঠিন পদার্থের উপর প্রচণ্ড চাপ দিলেও উহার প্রভাবে কঠিন পদার্থের আয়তন গ্যাসীয় পদার্থের ন্যায় হ্রাস পায় না। (iii) কঠিন পদার্থ গ্যাসের ন্যায় ছড়াইয়া পড়ে না বা স্বাভাবিক তাপে ইহা বাষ্পায়িত হয় না,—কারণ, কঠিন পদার্থের আকার সর্বদা নির্দিষ্ট থাকে। কিন্তু আয়োডিন, কর্পূর, ন্যাপথালিন ইত্যাদি কয়েকটি বিশেষ-ধর্মী কঠিন পদার্থ সাধারণ তাপমাত্রার পরিবেশেও ধীরে ধীরে গ্যাসীয় অবস্থা লাভ করে। (iv) সাধারণ অবস্থায় এক শ্রেণীর কঠিন পদার্থের আকার দানাদার বা নিয়তাকার ; যথা : ফটকিরি, লবণ, গন্ধক, বরফ ইত্যাদি নিয়তাকার পদার্থের উদাহরণ ; কিন্তু পিচ, কাচ, ইত্যাদি পদার্থ অনিয়তাকার, অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় দানাদার নয়।

তরল পদার্থের বৈশিষ্ট্য : (i) তরল পদার্থের আয়তন সর্বদা সুনির্দিষ্ট থাকে। কিন্তু তরল পদার্থের নিজস্ব কোন আকার নাই। যে পাত্রে রাখা যায়, আপাত দৃষ্টিতে তরল পদার্থ সেই পাত্রের আকার লাভ করে। 50 সি.সি. জল বা তেল যে-কোন পাত্রে রাখিলে সর্বদা ইহার আয়তন হইবে 50 সি.সি. (ii) প্রচণ্ড চাপ প্রয়োগে তরল পদার্থের আয়তন অতি নগণ্য মাত্রায় হ্রাস পায়। (iii) তাপের প্রভাবে তরলের আয়তন বৃদ্ধি পায় এবং তাপমাত্রা

একটি নির্দিষ্ট মানে পৌঁছিলে স্ফুটনের ফলে তরল গ্যাসীয় অবস্থা লাভ করে। যথা, জল উত্তপ্ত করিলে ধীরে ধীরে স্ফীত হইতে থাকে, কিন্তু 100°C তাপমাত্রায় বা উষ্ণতায় জল ষ্টীমে পরিণত হয়। (iv) একাধিক তরল পদার্থকে পরস্পরের সঙ্গে মিশ্রিত করা যায়, কিন্তু এরূপ মিশ্রণ নির্ভর করে তরলের সমধর্মী প্রকৃতির উপরে। জল ও অ্যালকোহল যে কোন পরিমাণে মিশ্রিত করা যায়, কিন্তু জল তেল বা জল ও পারদ মিশ্রিত করা যায় না। এরূপ ভিন্নধর্মী তরলের অসম মিশ্রণে বিভিন্ন তরল ইহাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুযায়ী বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত হয় এবং লঘু তরলের স্তর ভারী তরলের উপরে ভাসিতে থাকে। (v) দুইটি তরল মিশ্রিত করা সম্ভব হইলে মিশ্র তরলের আয়তনের পরিমাণ হয় বিভিন্ন তরলের আয়তনের যোগফল। (vi) কোন তরল পদার্থ মুখ-খোলা পাত্রে রাখিলে ইহার বাষ্পায়নের ক্ষমতা অনুযায়ী স্বাভাবিক তাপেও এই তরল পদার্থ টি ধীরে ধীরে বাষ্পায়িত হয়। (vii) কোন পাত্রের মধ্যে তরল পদার্থ সর্বদা সমান সমতল অবস্থায় পাওয়া যায়।

গ্যাসীয় পদার্থের বৈশিষ্ট্য : (i) গ্যাসীয় পদার্থের কোন স্থায়ী আকার বা আয়তন নাই। (ii) আবদ্ধ পাত্রে না রাখিলে গ্যাস সর্বদা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে অর্থাৎ মুক্ত অবস্থায় গ্যাসের ব্যাপন (diffusion) ঘটে। (iii) উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে গ্যাসের আয়তন বৃদ্ধি পায় ; কিন্তু উষ্ণতা হ্রাস করিলে গ্যাসের আয়তন হ্রাস পায়। পক্ষান্তরে, গ্যাসের উপরে চাপ বৃদ্ধি করিলে ইহার আয়তন হ্রাস পায় এবং চাপ হ্রাস করিলে আয়তন বৃদ্ধি পায়। গ্যাসের এরূপ আয়তন হ্রাস ও বৃদ্ধির মাত্রা নির্ভর করে তাপ ও চাপের হ্রাস বৃদ্ধির মাত্রার উপরে। (vi) একাধিক গ্যাস যথা : হাইড্রোজেন অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি যে-কোন আয়তনে পরস্পরের সঙ্গে মিশ্রিত করা যায়।

1.2. পদার্থের তিন অবস্থার কারণ (Reasons of existence of three states) :

কোন পদার্থের কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় আকার সব অবস্থায় স্থায়ী নয়। ইহাদের অবস্থার প্রকৃতি নির্ভর করে এরূপ পদার্থ যে পরিবেশে অবস্থিত তাহার তাপমাত্রার উপরে। সূর্য এবং অন্যান্য নক্ষত্র বা বৃহস্পতি গ্রহের তাপমাত্রা এত প্রচণ্ড যে সেখানে কোন পদার্থ ই কঠিন বা তরল অবস্থায় পাওয়া যায় না, সব পদার্থ ই পাওয়া যায় গ্যাসীয় অবস্থায়।

পরীক্ষা : একটি পাত্রে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় এক টুকরা বরফ রাখা হইল। কিছুক্ষণ বাদে দেখা যায় এই কঠিন বরফ প্রথমে তরল জলে পরিণত হইয়াছে এবং আরও বেশ কিছু পরে দেখা যাইবে পাত্রের জল বাষ্পীভূত হইয়া বায়ুর সহিত মিশিয়া গিয়াছে। সূর্য-তাপ বা উত্তাপে এই বাষ্পীভবন আরও ত্বরান্বিত হয়।

পৃথিবীর আবহাওয়ার উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে জল বাষ্পে পরিণত হয়। আবার, বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা হ্রাস পাইলে বাষ্প মেঘে, এবং উষ্ণতা আরও হ্রাস পাইলে মেঘ জলে পরিণত হইয়া বৃষ্টিরূপে ঝরিয়া পড়ে। কোন বিশেষ কারণে বায়ুমণ্ডলের কোন অংশের তাপমাত্রা অতিরিক্ত হ্রাস পাইলে জলীয় বাষ্প কঠিনাকার লাভ করিয়া শিলাবৃষ্টিরূপে মাটিতে পড়ে।

সুতরাং, দেখা যায় যে পদার্থের অবস্থায় পরিবর্তন নির্ভর করে তাপমাত্রার হ্রাস বা বৃদ্ধির উপরে। সাধারণত, উষ্ণতা বৃদ্ধি করিলে কঠিন পদার্থ প্রথমে তরল অবস্থায় পরিণত হয় এবং এই তরলের উষ্ণতা বিশেষ তাপমাত্রা পর্যন্ত বৃদ্ধি করিলে তরল্ পদার্থ বাষ্পায়িত হইয়া গ্যাসীয় অবস্থা লাভ করে। উষ্ণতা হ্রাস করিলে গ্যাসীয় পদার্থ পুনরায় তরল পদার্থে এবং ইহা পরিশেষে কঠিন পদার্থের অবস্থায় পরিণত হয়।
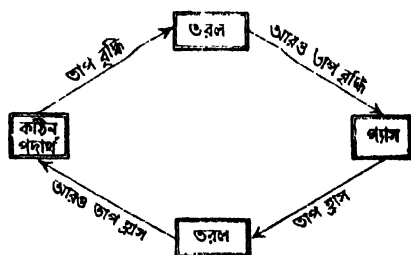
পদার্থের অবস্থান্তর
[পদার্থের অবস্থা পরিবর্তনের সাধারণ নিয়ম চিত্রাকারে দেখানো হইল]

তরল পারদকে অতি শীতল করিয়া কঠিন পারদে (দেখিতে রূপার মত) এবং উচ্চতর উষ্ণতায় উত্তপ্ত করিয়া গ্যাসীয় পারদে রূপান্তরিত করা যায়।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, স্বাভাবিক তরলাকার জলের উষ্ণতা 0° সেন্টিগ্রেড (C) পর্যন্ত হ্রাস করিলে জল কঠিনাকার বরফে এবং জলের উষ্ণতা 100°C তাপমাত্রা পর্যন্ত বৃদ্ধি করিলে তরলাকার জল বাষ্পে অর্থাৎ গ্যাসীয় অবস্থায় পরিণত হয়। পারদ একটি ধাতুজাতীয় পদার্থ এবং স্বাভাবিক উষ্ণতায় তরলাকার। কিন্তু এই তরলাকার পারদ –39°C তাপমাত্রায় শীতল করিলে রূপার ন্যায় দেখিতে কঠিনাকার পারদে পরিণত হয়। আবার, তরল পারদ 357°C তাপমাত্রা পর্যন্ত উত্তপ্ত করিলে পারদ বাষ্পীয় অবস্থা অর্থাৎ গ্যাসীয় আকার লাভ করে।

কর্পূর, আয়োডিন ও ন্যাপথালিনের ন্যায় কোন কোন কঠিন পদার্থ স্বাভাবিক অবস্থায় ধীরে ধীরে এবং উত্তপ্ত করিলে দ্রুতগতিতে (তরলাকার লাভ না করিয়া) এক ধাপেই বাষ্পীয় বা গ্যাসীয় আকার লাভ করে।

উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে যে সকল পদার্থ ভাঙ্গিয়া যায় বা রাসায়নিক ক্রিয়ায় বিশ্লিষ্ট হইয়া যায় এবং ভিন্ন পদার্থে পরিণত হয়, সেরূপ পদার্থের ক্ষেত্রে 'কঠিন তরল-গ্যাসীয় অবস্থান্তরের সূত্র' কার্যকর হয় না। কয়লা উত্তপ্ত করিলে—কয়লার পাতনের ফলে অর্থাৎ কয়লার সংগঠন ভাঙ্গিয়া যাইবার ফলে বিভিন্ন তরল ও গ্যাসীয় পদার্থ উৎপন্ন হয়। কোল গ্যাস, আলকাতরা, কোক, পিচ ইত্যাদি এরূপ পদার্থ।

সব রকম পদার্থই অতি সূক্ষ্মকণার সমষ্টিরূপে গঠিত। এরূপ কণাগুলিকে বলা হয় অণু বা মলিকুল। কঠিন অবস্থায় পদার্থের অণুগুলি পরস্পরের প্রতি প্রবল আকর্ষণে অতি ঘনিষ্টভাবে সংযুক্ত হইয়া সুদৃঢ় সমষ্টিরূপে সন্নিবিষ্ট থাকে। তাই, কঠিন পদার্থের আকার ও আয়তন সর্বদা সুনির্দিষ্ট। তরল পদার্থের অণুগুলি শিথিলভাবে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। কিন্তু পারস্পরিক সংযোগের শিথিলতা সত্ত্বেও তরল পদার্থের অণুগুলি পারস্পরিক বন্ধনের আকর্ষণে আবদ্ধ থাকে।
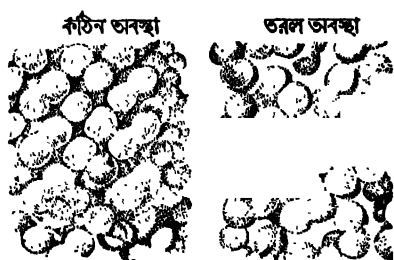
কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় আয়োডিন অণুর সমাবেশের অতিবর্ধিত চিত্র

তাই, তরল পদার্থের অণুগুলির অবস্থান সুনির্দিষ্ট নয়। পারস্পরিক আকর্ষণের পরিধির মধ্যে থাকার জন্য তরলের আয়তন সুনির্দিষ্ট কিন্তু কোন নির্দিষ্ট আকার নাই; যে পাত্রে রাখা যায়, উহা সেই পাত্রের আকার ধারণ করে। আবার গ্যাসীয় পদার্থের অণুগুলি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে বলিয়া অণুগুলির পারস্পরিক আকর্ষণ খুব কম। তাই সুযোগ পাইলেই উহারা চারিদিকে ছড়াইয়া

পড়ে। ইহার ফলে গ্যাসীয় পদার্থের কোন নির্দিষ্ট আকার বা আয়তন থাকে না।

তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে কঠিন পদার্থের অণুকণাগুলির মধ্যে চঞ্চলতা বা স্পন্দন সৃষ্টি হয় এবং তাপমাত্রা যথেষ্ট বৃদ্ধি করিলে অণুকণাগুলির পারস্পরিক সংযোগ শিথিল হইয়া যায়। এই অবস্থায় কঠিন পদার্থটি তরলাকার লাভ করে। সেই তরল পদার্থের উষ্ণতা আরও বৃদ্ধি করিলে অণুকণাগুলির চঞ্চলতা বা স্পন্দন আরও বৃদ্ধি পায় এবং একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় পৌছিলে চঞ্চলতর অণুকণাগুলি পরস্পরের বন্ধন হইতে ছিন্ন হইয়া যায়। এই পরিবেশে তরল পদার্থটি গ্যাসীয় অবস্থায় পরিণত হয় এবং ইহার বিচ্ছিন্ন অণুকণাগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। তাই গ্যাসীয় পদার্থের এরূপ বিচ্ছিন্ন ও চঞ্চল অণুকণাগুলি মুখবন্ধ কোন পাত্রে আবদ্ধ রাখা হয়।

1-3. স্ফুটনাংক ও গলনাংক : কোন্ তাপমাত্রায় পদার্থের অবস্থান্তর ঘটিবে তাহা পদার্থের নিজস্ব ধর্ম অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট ; অর্থাৎ বিভিন্ন পদার্থের অবস্থা পরিবর্তনের তাপমাত্রা বিভিন্ন। কঠিন পদার্থের তরল অবস্থায় রূপান্তরের পদ্ধতিকে বলা হয় **গলন** বা **মেল্টিং**। তরলের সর্বাঙ্গীন বাষ্পায়নকে বলা হয় **স্ফুটন** বা **বয়েলিং**।

স্ফুটনাংক (Boiling point) **:** একটি পাত্রে খানিকটা জল লইয়া কিছুক্ষণ উত্তপ্ত করিলে দেখা যাইবে যে জলের সমস্ত অংশ হইতে বুদ্বুদ গঠিত হইয়া বাষ্প (স্টীম) উত্থিত হইতেছে। এই অবস্থাকে অর্থাৎ যখন তরল পদার্থ উহার সমস্ত অংশ হইতেই বাষ্পাকারে (স্টীমে) পরিবর্তিত হইতে থাকে, তখন উহাকে বলা হয় স্ফুটন। পদার্থটি বিশুদ্ধ হইলে প্রমাণ বায়ুচাপে (76 সেন্টিমিটার) একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় উহা বুদ্বুদ গঠিত হইয়া বাষ্পীভূত অর্থাৎ স্টীমে পরিণত হয় এবং এই তাপমাত্রাকে বলা হয় পদার্থটির স্ফুটনাংক।

গলনাংক (Melting point) **:** উষ্ণতার প্রভাবে পদার্থের কঠিন অবস্থা হইতে তরল অবস্থায় পরিণতিকে বলে গলন। পদার্থটি বিশুদ্ধ হইলে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় উহা গলিয়া যাইবে। এই তাপমাত্রাকে বলা হয় উক্ত পদার্থের গলনাংক।

যে-কোন বিশেষ আয়তনের সমগ্র পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত স্ফুটনাংক এবং গলনাংক স্থির থাকে। কোন বিশেষ আকারের বরফ

সম্পূর্ণরূপে জলে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত তাপাংক 0° সেন্টিগ্রেডে স্থির থাকে। সেইরূপ কোন পাত্রপূর্ণ জল সম্পূর্ণ পরিমাণে স্টীমে অর্থাৎ 100°C তাপমাত্রায় গ্যাসীয় অবস্থায় পরিণত না হওয়া পর্যন্ত প্রমাণ চাপে জলের উষ্ণতা 100° সেন্টিগ্রেড মাত্রায় স্থির থাকে। কয়েকটি পদার্থের গলনাংক ও স্ফুটনাংক :

পদার্থ	গলনাংক	স্ফুটনাংক
বরফ	0°C	100°C
পারদ	−39°C	375°C
লোহা	1527°C	3235°C

1-4. পদার্থের পরিচিতি (Identification of matter) :

পদার্থের সাধারণ পরিচয় নির্ণয় করা হয় বিভিন্ন পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন স্পর্শানুভূতি, বর্ণ, গন্ধ, দ্রবণীয়তা, স্ফুটনাংক, চুম্বকাকর্ষণ ইত্যাদি সম্বন্ধে সেই পদার্থের নিজস্ব ধর্ম এবং এরূপ বিভিন্ন পদার্থের উপর জল, অ্যাসিড, ক্ষার ইত্যাদির ক্রিয়া নির্ধারণ করিয়া। যথা :

(i) **স্পর্শ :** স্পর্শানুভূতিতে সোনা, রূপা, লোহা, তামা ইত্যাদি ধাতব পদার্থ কঠিন ; সাদা ফসরাস মোমের মত নরম ; হীরক কঠিনতম পদার্থ এবং গ্রাফাইট নরম ও পিচ্ছিল। জল, তেল ইত্যাদি তরল স্পর্শে আর্দ্রতাব্যঞ্জক।

(ii) **বর্ণ :** সোনা দেখিতে হরিদ্রাভ উজ্জল, তামা লালাভ, অ্যালুমিনিয়াম ও জিংক রূপালী, লোহা বাদামী, কয়লা কালো, তুঁতে নীল, লবণ ও চিনি সাদা, তরল ব্রোমিন বর্ণে লালাভ, তরল ক্লোরিন হরিদ্রাভ এবং পারদ রূপালী। ক্লোরিন গ্যাস সবুজাভ কিন্তু হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন বর্ণহীন।

(iii) **গন্ধ :** জল গন্ধহীন কিন্তু জৈব তরল বেঞ্জিন, পেট্রল ইত্যাদির বিশেষ গন্ধ পাওয়া যায়। অ্যামোনিয়ার ঝাঁঝাল গন্ধে চোখে জল আসে। হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাসে পচা ডিমের গন্ধ পাওয়া যায়। ক্লোরিনের গন্ধ তীব্র ঝাঁঝাল।

(iv) **দ্রবণীয়তা ;** গন্ধক, লোহা প্রভৃতি পদার্থ জলে অদ্রবণীয়। চিনি, লবণ, ক্ষার ইত্যাদি জলে দ্রবণীয়। ক্লোরিন, অ্যামোনিয়া, সালফার ডাই-অক্সাইড; কার্বন ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি গ্যাস জলে দ্রবণীয়। ক্লোরিনের জলীয় দ্রবণ বর্ণে হরিদ্রাভ, ব্রোমিনের দ্রবণ লালাভ, তুঁতের

(কপার সালফেট) দ্রবণ নীল, ফেরাস সালফেটের দ্রবণ সবুজাভ, পারম্যাংগানেটের দ্রবণ বেগুনী ইত্যাদি। তরল পদার্থ পারদ জলে অদ্রবণীয়। অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি গ্যাস জলে অদ্রবণীয়।

(v) **চৌম্বক ধর্ম :** লোহা এবং অল্পমাত্রায় নিকেল ধাতুও চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয়। এরূপ আকর্ষণ লক্ষ্য করিয়া ধাতুটির পরিচয় নির্ণয় করা যায়।

(vi) **স্ফুটনাংক ও গলনাংক :** প্রত্যেকটি বিশুদ্ধ তরল ও কঠিন পদার্থের স্ফুটনাংক ও গলনাংক নির্দিষ্ট। এরূপ স্ফুটনাংক ও গলনাংক নির্ণয় করিয়া পদার্থের পরিচয় নির্ণয় করা যায়। যেমন, প্রমাণ বায়ুচাপে যে পদার্থের গলনাংক 0°C এবং স্ফুটনাংক 100°C তাহা জল।

(vii) **অ্যাসিডের বিক্রিয়া :** বিভিন্ন ধাতু বা অন্যান্য পদার্থের উপরে অ্যাসিডের বিভিন্ন প্রকার বিক্রিয়া ঘটে। সেই বিক্রিয়া পদার্থের পরিচিতির সংকেত দেয়। জিংকের উপরে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় যে গ্যাস তৈরী হয় তাহা হাইড্রোজেন। সোনার সহিত অ্যাসিডের অনুরূপ বিক্রিয়া নাই।

1-5. **পদার্থের ধর্ম** (Properties of matter) :

পদার্থের ধর্মের পরিচয় দুই প্রকার, যথা : (i) ভৌত ধর্ম ও

(ii) রাসায়নিক ধর্ম।

ভৌত ধর্ম (Physical properties) : পদার্থের স্বাভাবিক অবস্থা, বর্ণ, গন্ধ, স্পর্শ, স্বাদ, স্ফুটনাংক, গলনাংক, ঘনত্ব, গুরুত্ব, দ্রবণীয়তা, তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবহনের ক্ষমতা ইত্যাদি বাহ্যিক প্রকৃতি ও আচরণ নির্ণয় করিয়া পদার্থের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহাকে বলা হয় পদার্থের ভৌত ধর্ম।

রাসায়নিক ধর্ম (Chemical properties) : কোন পদার্থের উপরে জল, বায়ু, উত্তাপ, অ্যাসিড, ক্ষার ইত্যাদি পদার্থের ক্রিয়ার ফলে সেই পদার্থের মূল সংগঠনের যে পরিবর্তন ঘটে এবং তাহার ফলে সেই পদার্থটি যে এক বা একাধিক সংখ্যক ভিন্ন পদার্থে পরিণত হয় তাহার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া ঐ পদার্থের যে নিজস্ব ধর্মের পরিচয় পাওয়া যায় তাহাকে বলা হয় সেই পদার্থের রাসায়নিক ধর্ম।

ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া যে-কোন কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের পরিচয় নির্ণয় করা যায়।

ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তন (Physical & chemical changes) :

প্রকৃতিতে বা বিজ্ঞানীর রসায়নাগারে পদার্থের মধ্যে নানা পরিবর্তন ঘটে বা বৈজ্ঞানিক উপায়ে ঘটান হয়। তাপের প্রভাবে জল বাষ্পে বা তাপের অভাবে বরফে পরিণত হয়। কাঠ ও কয়লা পুড়িবার পরে অবশিষ্ট থাকে অল্প ছাই মাত্র। কিন্তু জল এবং কয়লার এরূপ পরিবর্তনের প্রকৃতি একরকম নয়, ইহাদের পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্য দুই রকম। জল বরফ বা বাষ্পীয় আকারে মূলত জলই থাকে, পক্ষান্তরে উত্তাপের ফলে কয়লা বিভিন্ন প্রকার ভিন্ন প্রকৃতির পদার্থ উৎপন্ন করে। জলের বাহ্যিক পরিবর্তনকে বলা হয় (i) **ভৌত পরিবর্তন** (physical change) ; এবং (ii) কয়লার মূল গঠনের পরিবর্তনকে বলা হয় **রাসায়নিক পরিবর্তন** (chemical change)।

ভৌত পরিবর্তন : যে পরিবর্তনের ফলে পদার্থের মূল বা আভ্যন্তরীণ সংগঠনের কোন পরিবর্তন ঘটে না, অর্থাৎ শুধু বাহ্যিক অবস্থার রূপান্তর ঘটে, তাহাকে বলা হয় ভৌত পরিবর্তন।

রাসায়নিক পরিবর্তন : যে পরিবর্তনের ফলে পদার্থের মূল সংগঠনের পরিবর্তন ঘটে এবং তাহার ফলে সেই পদার্থটি এক বা একাধিক ভিন্ন ধর্মের পদার্থে পরিণত হয়—সেইরূপ পরিবর্তনকে বলা হয় রাসায়নিক পরিবর্তন।

কোন পদার্থের ভৌতিক ও রাসায়নিক পরিবর্তন স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে না,— এরূপ পরিবর্তন ঘটাইবার জন্য কোন-না-কোন কারণ অবশ্যই বর্তমান থাকে।

ভৌত পরিবর্তনের উদাহরণ (Some examples of physical changes) :

(i) **জল, বরফ ও বাষ্প** (Water, ice, and vapour) : তরল জল 0°C তাপমাত্রায় শীতল করিলে কঠিন বরফে অথবা 100°C তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করিলে বাষ্পে পরিণত হয়। বরফ বা বাষ্প জলের ভৌত পরিবর্তনের উদাহরণ মাত্র। কারণ বরফ বা বাষ্পরূপে ইহাদের মধ্যে জলের মূল রাসায়নিক ধর্ম, ওজন ও সংগঠন অপরিবর্তিত থাকে।

(ii) **মোমের গলন** (Melting of wax) : তাপের প্রভাবে কঠিন মোম তরলাকার লাভ করে। তরল মোমও মূলত মোম। তরল মোম ঠাণ্ডা হইলে কঠিন মোমে পরিণত হয়, কিন্তু ইহার ওজনের কোন পরিবর্তন হয় না, এবং গলনের ফলে কোন তাপও সৃষ্টি হয় না।

(iii) **লোহার চুম্বকে পরিবর্তন** (Magnetisation of iron): কোন লৌহ খণ্ডের উপর দিয়া একটি শক্তিশালী চুম্বক একই দিকে একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত বারে বারে বুলাইলে, ঐ লৌহখণ্ড চুম্বকে পরিবর্তিত হয়। ইহাতে লৌহখণ্ডের ওজন, রং ও সংগঠনের কোন পরিবর্তন হয় না। কিন্তু লোহার মধ্যে চুম্বকের ন্যায় অন্য লোহাকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা সৃষ্টি হয়।

(iv) **প্ল্যাটিনাম তার উত্তপ্তকরণ** (Heating of platinum wire): বুনসেন দীপের প্রদীপ্ত শিখায় প্লাটিনামের তার ধরিলে তারটি শ্বেততপ্ত হইয়া আলো বিচ্ছুরণ করে কিন্তু প্লাটিনাম ধাতুর মূল গঠনের কোন পরিবর্তন হয় না। ঠাণ্ডা হইলে উহা পূর্বরূপ প্রাপ্ত হয়। তারের ওজনের কোন পরিবর্তন হয় না। তামা, লোহা ইত্যাদি যে-কোন ধাতুর তার উচ্চতর তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করিলে, অনেকাংশে এরূপ শ্বেততপ্ত দেখায়। বিদ্যুৎ বাল্বের ভিতরের তারও তড়িৎ প্রবাহের ফলে উত্তপ্ত হইয়া আলোক বিকীর্ণ করে, কিন্তু তড়িৎ-প্রবাহ বন্ধ করিলেই আবার সাধারণ ধাতব তারে পরিণত হয়।

(v) **লবণ অথবা চিনি বা তুঁতের দ্রবণ**: এরূপ দ্রবণে কঠিন পদার্থ অদৃশ্য হইলেও দ্রবণের স্বাদে এবং অনেক সময় বর্ণে (তুঁতের নীল দ্রবণ) কঠিন পদার্থের অপরিবর্তিত অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। দ্রবণকে বাষ্পায়িত করিলে দ্রবণে মিশ্রিত সমান ওজনের লবণ, চিনি বা তুঁতে কঠিন পদার্থরূপে আবার ফিরিয়া পাওয়া যায়। সাধারণত দ্রবণ প্রস্তুত করার সময় তাপের কোন হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। [কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে তাপের পরিবর্তন ঘটে। যথা, সালফিউরিক অ্যাসিড ও জলের মিশ্রণে তাপ সৃষ্টি হয়।]

(vi) **লোহা ও সোনা**: কর্মকার হাপরের সাহায্যে উনানের উচ্চতাপে রাখিয়া লোহার পাত গলাইয়া লোহার বিভিন্ন যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করে। স্বর্ণকার কাঠ-কয়লার উচ্চতাপে সোহাগার সাহায্যে সোনা গলাইয়া নানা অলঙ্কার প্রস্তুত করে। লোহা বা সোনার এরূপ গলন ভৌত পরিবর্তনের উদাহরণ।

ভৌত পরিবর্তনের আরও উদাহরণ দেওয়া যায়। এই পরিবর্তনের বিশেষত্ব এই যে, যে সকল কারণে এরূপ পরিবর্তন ঘটে, সেই সকল কারণ অপসারণ করিলেই মূল পদার্থের পূর্বাবস্থা ফিরিয়া আসে। কাজেই বলা যায় যে, **ভৌত পরিবর্তন অস্থায়ী অর্থাৎ এরূপ পরিবর্তনের ফলে পদার্থের মধ্যে কোন স্থায়ী পরিবর্তন ঘটে না।**

রাসায়নিক পরিবর্তনের উদাহরণ ঃ

(i) **লোহার মরিচা** (Rusting of iron) ঃ লোহা আর্দ্র বায়ু বা জলের সংস্পর্শে রাখিলে উহার উপরে লাল রংয়ের ভঙ্গুর স্তর পড়ে ; এরূপ স্তরকে লোহার মরিচা বলে। মরিচা লোহার চেয়ে ওজনে ভারী। ইহা লোহার রাসায়নিক পরিবর্তন, কারণ লোহা মরিচা রূপে অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হইয়া লোহার অক্সাইডে পরিণত হয়।

(ii) **বায়ুর সংস্পর্শে চুন-জল** (Lime water kept exposed to air) ঃ স্বচ্ছ চুন-জলের দ্রবণ বায়ুর সংস্পর্শে ঘোলা হইয়া যায় এবং উহার উপরে সর্বদা একটি সর পড়িতে দেখা যায়। চুন জল বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইডের সংযোগে একটি নূতন পদার্থ (ক্যালসিয়াম কার্বনেট) তৈরী করে। ইহা রাসায়নিক পরিবর্তনের উদাহরণ।

রাসায়নিক পরিবর্তনে নূতন পদার্থ গঠিত হয়। পরিবর্তিত পদার্থকে মূল পদার্থে পুনর্গঠন করা সহজ সাধ্য নয়। কাজেই বলা যায় রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে মূল পদার্থের গঠনে স্থায়ী পরিবর্তন ঘটে।

1-6. **রাসায়নিক পরিবর্তনের কারণ** (Factors inducing & regulating chemical change) ঃ রাসায়নিক পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন আলো, উত্তাপ, বিদ্যুৎ, শব্দ, চাপ, দুইটি পদার্থের ঘনিষ্ঠ সংযোগ বা অনুঘটকের প্রভাব। এরূপ কোন-না-কোন প্ররোচনা ছাড়া রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে না। এরূপ পরিবর্তনের ফলে মূল পদার্থ রূপান্তরিত হয়। যথা :—

(i) **আলোক** ঃ ফটো তুলিবার জন্য আলোকপাতের প্রয়োজন। আলোকপাতে ফটোর প্লেটে রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটে। ফটোর প্লেটের পদার্থ ভিন্ন পদার্থে পরিণত হয়। হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন গ্যাস অন্ধকারে মিশ্রিত করিয়া রাখিলে মিশ্র গ্যাস দুইটির স্বধর্ম বজায় থাকে। কিন্তু সূর্যের আলোকে বা অন্য কোন তীব্র আলোকের প্রভাবে গ্যাস দুইটিতে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মের পদার্থ (হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড) উৎপন্ন হয়।

(ii) **তাপ** ঃ রাসায়নিক পরিবর্তনের একটি প্রধান কারণ তাপ। পটাশিয়াম ক্লোরেট উত্তপ্ত করিলে গলিয়া যায় এবং ক্রমে উহা তাপের প্রভাবে বিশ্লিষ্ট হইয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন-ধর্মী অক্সিজেন গ্যাস উৎপাদন করে এবং পাত্রে পড়িয়া থাকে পটাশিয়াম ক্লোরাইড। কয়লা পোড়াইলে নানা-

প্রকার গ্যাস ও ছাই উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ কয়লার গঠনের পরিবর্তনের ফলে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ তৈরী হয়। তেল, মোম বা যে কোন জৈব পদার্থ দগ্ধ করিলে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ও জলীয় বাষ্প তৈরী হওয়ার ফলে মূল পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে।

(iii) **বিদ্যুৎ** : অ্যাসিড মিশ্রিত জলে বিদ্যুৎ অর্থাৎ তড়িৎ প্রবাহ চালাইলে জল বিশ্লেষিত হইয়া ভিন্নধর্মী হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস উৎপন্ন করে। গলিত (fused) লবণে (সোডিয়াম ক্লোরাইড) বিদ্যুৎ প্রবাহিত করিলে লবণ বিশ্লিষ্ট হইয়া তেজী সোডিয়াম ধাতু ও তীব্রগন্ধী ক্লোরিন গ্যাস উৎপন্ন হয়। এরূপ রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটায় তড়িৎপ্রবাহ।

(iv) **পদার্থের ঘনিষ্ঠ সংযোগ** : এক টুকরা আয়োডিনের সঙ্গে এক টুকরা ফসফরাসের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে সঙ্গে সঙ্গে আগুন জ্বলিয়া ওঠে এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মের ফসফরাস আইয়োডাইড নামক অপর একটি তৃতীয় পদার্থে পরিণত হয়।

(v) **দ্রবণীয়তা** : দুইটি পদার্থ চূর্ণ করিয়া ঘনিষ্ঠভাবে মিশ্রিত করিলেও অনেক ক্ষেত্রে কোন রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে না, কিন্তু এই মিশ্রণ জলে বা অন্য তরলে দ্রবীভূত করিলে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে। সোডার সঙ্গে টারটারিক অ্যাসিড দানা মিশ্রিত করিয়া একত্র চূর্ণ করিলেও কোন রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে না, কিন্তু এই মিশ্রণ জলে দ্রবীভূত করিলে ইহাদের মধ্যে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়।

(vi) **চাপ** : অ্যামোনিয়া গ্যাস ও কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের মিশ্রণ সাধারণ অবস্থায় অবিকৃত থাকে, কিন্তু তাপ এবং উচ্চচাপের প্রয়োগে ঐ মিশ্রণ ইউরিয়া নামক সারজাতীয় (manure) পদার্থে পরিণত হয়।

(vii) **শব্দ** : অনেক ক্ষেত্রে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে শব্দের প্রভাবে। অ্যাসিটিলিন গ্যাসের মধ্যে প্রচণ্ড শব্দ করিলে অ্যাসিটিলিন গ্যাস বিশ্লিষ্ট হইয়া ভিন্ন ধর্মের পদার্থ তথা কঠিন অঙ্গার (কার্বন) ও হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে।

(viii) **অনুঘটন** : কোন কোন ক্ষেত্রে দুইটি পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া বা পরিবর্তন ঘটাইবার জন্য ঘটক জাতীয় পদার্থের প্রয়োজন হয়। এরূপ ঘটককে রাসায়নিক ভাষায় বলা হয় অনুঘটক বা ক্যাটালিষ্ট (catalyst)

এবং ঐরূপ পদ্ধতিকে বলা হয় অনুঘটন বা ক্যাটালিসিস (catalysis)। এরূপ রাসায়নিক পরিবর্তনে সংঘটকের ভূমিকা গ্রহণ করিলেও অনুঘটক নিজে অপরিবর্তিত থাকে। অনুঘটকরূপে উত্তপ্ত প্লাটিনামের সংস্পর্শে অক্সিজেন ও সালফার ডাই-অক্সাইড সংযুক্ত হইয়া সালফার ট্রাই-অক্সাইড যৌগ উৎপাদন করে।

(ix) **জলের প্রভাব :** চুনের মধ্যে জল মিশাইলে চুন গরম হইয়া ফুটিতে আরম্ভ করে এবং কলিচুন তথা চুনের হাইড্রোকসাইড তৈরী হয়। অর্থাৎ জলের প্রভাবে চুনের ওজন, ধর্ম ও সংগঠনের পরিবর্তন হয় বলিয়া ইহাও রাসায়নিক পরিবর্তনের একটি উদাহরণ। জলের মধ্যে এক টুকরা সোডিয়াম বা পটাশিয়াম ফেলিয়া দিলে উত্তাপ সৃষ্টি হয়, এমন কি আগুনও জলিয়া ওঠে এবং জলীয় দ্রবণে সাবানের ন্যায় পিচ্ছিল কষ্টিক সোডা বা কষ্টিক পটাস ক্ষার তৈরী হয় বলিয়া ইহাও রাসায়নিক পরিবর্তনে উদাহরণ।

(x) **অ্যাসিডের প্রক্রিয়া :** তামার উপর নাইট্রিক অ্যাসিড ঢালিলে বাদামীবর্ণের একটি গ্যাস তৈরী হয় এবং পাত্রে পড়িয়া থাকে নীলবর্ণের একটি দ্রবণ। সেইরূপ লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডে অশুদ্ধ জিংক দানা ফেলিলে ভুরভুর করিয়া এক প্রকার বর্ণহীন গ্যাস তথা হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরী হয় এবং পাত্রে পড়িয়া থাকে একটি বর্ণহীন দ্রবণ। অ্যাসিডের প্রভাবে তামা ও জিংকের (দস্তার) রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। অধিকাংশ ধাতু স্বাভাবিক অবস্থায় বা উত্তপ্ত অবস্থায় অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটাইয়া ভিন্ন পদার্থ উৎপন্ন করে।

ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তনের তুলনা

ভৌত পরিবর্তন	রাসায়নিক পরিবর্তন
1. ভৌত পরিবর্তনের ফলে পদার্থের অবস্থার রূপান্তর ঘটে মাত্র, পদার্থের অণুগুলির ধর্ম অবিকৃত থাকে।	1. রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে মূল পদার্থের অণুগুলির সংগঠন বা সংযুক্তির পরিবর্তন ঘটে এবং মূল পদার্থ ভিন্ন ধর্মের এক বা একাধিক নূতন পদার্থে পরিবর্তিত হয়।
উদাহরণ—জল, বরফ ও জলীয় বাষ্প মূলত জলের অবস্থান্তর মাত্র, পৃথক পদার্থ নহে।	উদাহরণ—তড়িৎ-বিশ্লেষণের ফলে জল বিশ্লিষ্ট হইয়া হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন উৎপন্ন করে। ইহাদের ধর্ম জল হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।

ভৌত পরিবর্তন	রাসায়নিক পরিবর্তন
2. ভৌত পরিবর্তন অস্থায়ী। পরিবর্তনের কারণ অপসারিত করিলে মূল পদার্থটিকে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনা যায়।	2 পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্তন স্থায়ী,- বিশেষ রাসায়নিক বিক্রিয়া ব্যতীত পরিবর্তিত এক বা একাধিক পদার্থের মূল পদার্থে পুনর্গঠিত করা যায় না।
উদাহরণ—বৈদ্যুতিক বাতির তার তড়িৎ-প্রবাহ চালনার ফলে আলো বিকীর্ণ করে, তড়িৎ প্রবাহ বন্ধ করিলে আলোক বিকিরণ বন্ধ হয় এবং তার অবিকৃত থাকে।	উদাহরণ—কয়লা জ্বলিয়া গ্যাস, আলকাতরা ও ছাইয়ে পরিণত হয়। কিন্তু কয়লার ছাই হইতে কোন উপায়েই কয়লা ফেরৎ পাওয়া যায় না।
3 ভৌত পরিবর্তনের সময়ে সাধারণত পদার্থের মধ্যে তাপের কোন হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না।	3. কোন পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অবশ্যই তাপ উৎপন্ন হয় অথবা তাপ হ্রাস পায়।
উদাহরণ—চিনি জলে মিশিয়া গেলে উষ্ণতায় বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় না। উপাদানদ্বয় অবিকৃত থাকে।	উদাহরণ—বায়ুতে হাইড্রোজেন গ্যাস দহন করিয়া জল সৃষ্টির সময়ে তাপ উৎপন্ন হয়। অধিকাংশ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাপ উৎপন্ন হয়।
কিন্তু জল ও সালফিউরিক অ্যাসিডের মিশ্রণে তাপ সৃষ্টি হয় এবং জল ও নিশাদলের মিশ্রণে তাপ হ্রাস পায়। ইহা ব্যতিক্রম মাত্র।	হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় জল তৈরী হওয়ার সময়ে তাপ সৃষ্টি হয় কিন্তু নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের সংযোগে নাইট্রিক অক্সাইড তৈরী হওয়ার সময় তাপ হ্রাস পায়।

1-7. তাপোৎপাদী এবং তাপগ্রাহী রাসায়নিক পরিবর্তন (Exothermic and endothermic changes) :

প্রত্যেক রাসায়নিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অনিবার্যভাবে তাপ সৃষ্টি হয় অথবা তাপ শোষিত হয়। কয়েকটি মাত্র বিশেষ পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তাপ হ্রাস পায় কিন্তু অধিকাংশ রাসায়নিক পরিবর্তনের সময় তাপ উৎপন্ন হয়।

তাপোৎপাদী রাসায়নিক পরিবর্তন (Exothermic chemical change) : তাপ উৎপাদন অথবা তাপ শোষণ রাসায়নিক বিক্রিয়ার একটি

বৈশিষ্ট্য। যে সকল রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে তাপ উৎপন্ন হয় তাহাকে বলা হয় তাপোৎপাদী পরিবর্তন বা এক্সোথারমিক চেঞ্জ।

উদাহরণ: বায়ু বা অক্সিজেনের মধ্যে কয়লার দহন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সংযোগে জল উৎপাদন, ক্লোরিন ও হাইড্রোজেন গ্যাসের সংযোগে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড উৎপাদন তাপোৎপাদী প্রক্রিয়ার উদাহরণ।

তাপগ্রাহী রাসায়নিক পরিবর্তন (Endothermic chemical change): যে সকল রাসায়নিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে তাপ শোষিত বা গৃহীত হয় সেরূপ পরিবর্তনকে তাপগ্রাহী পরিবর্তন বা এণ্ডোথার্মিক চেঞ্জ বলা হয়।

উদাহরণ: বাষ্পীয় গন্ধক লালতপ্ত অঙ্গারের উপরে প্রবাহিত করিলে কার্বন ডাই-সালফাইড নামক একপ্রকার বর্ণহীন তরল সৃষ্টি হয়। এরূপ রাসায়নিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তাপ শোষিত হয়; নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় নাইট্রিক অক্সাইড গঠনের সময় তাপ গৃহীত হয়।

1-8. মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ (Element and Compound):

পদার্থের সংগঠনের বা সংযুক্তির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বস্তুরাশিকে মূলত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা:—

(i) মৌল বা মৌলিক পদার্থ (element),

(ii) যৌগ বা যৌগিক পদার্থ (compound) এবং

(iii মিশ্র পদার্থ (mixture)।

মৌল বা মৌলিক পদার্থ: যে পদার্থকে সর্বভাবে বিশ্লেষণ করা সত্ত্বেও সেই মূল পদার্থ হইতে ভিন্ন ধর্মের অন্য কোন নূতন পদার্থ পাওয়া যায় না, তাহাকে বলা হয় মৌল বা মৌলিক পদার্থ বা এলিমেণ্ট।

হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, সোনা, রূপা, পারদ ইত্যাদি এরূপ পদার্থ। পৃথিবীর বস্তুরাশি প্রায় 92 রকম মৌলিক পদার্থ দ্বারা গঠিত। ভূপৃষ্ঠের প্রায় 75 ভাগ পদার্থ অক্সিজেন, সিলিকন, অ্যালুমিনিয়াম, লোহা, ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, হাইড্রোজেন ও কার্বন নামের দশটি মৌলিক পদার্থ দ্বারা গঠিত। পৃথিবীর অধিকাংশ পদার্থই যৌগিক অথবা বিবিধ মৌল ও যৌগের মিশ্রণ। [বর্তমানে অন্তত দশটি কৃত্রিম মৌলিক পদার্থ গঠন করা সম্ভব হইয়াছে। অধিকাংশ মৌল আবিষ্কৃত হইয়াছে আঠার ও উনিশ শতাব্দীতে। কৃত্রিম মৌল আবিষ্কৃত হইয়াছে এই শতাব্দীর

মধ্যভাগে। অনেকের মতে লোহা, তামা ও সীসা প্রাচীনকালে ভারতের বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন। প্রাচীন কাল ও মধ্যযুগের প্রথম ভাগেও ভারত বিজ্ঞানে অগ্রসর ছিল।]

1-9. **ধাতু ও অ-ধাতু বা মেটাল ও নন-মেটাল** (Metal and Non-metal) : মৌলগুলিকে সাধারণত ধাতু ও অ-ধাতু বা মেটাল ও নন-মেটাল নামে দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

প্রকৃতিতে স্বাভাবিক অবস্থায় এই ধাতু ও অ-ধাতু জাতীয় মৌলগুলি কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় অবস্থায় পাওয়া যায়। মৌলিক পদার্থের চার ভাগের তিনভাগই ধাতুজাতীয়। এরূপ কয়েকটি ধাতু ও অ-ধাতু জাতীয় মৌলের নাম :

ধাতু (Metal)	অ-ধাতু (Non metal)
সোডিয়াম (কঠিন)	হাইড্রোজেন (গ্যাস)
অ্যালুমিনিয়াম ,,	অক্সিজেন ,,
তামা বা কপার ,,	নাইট্রোজেন ,,
জিংক বা দস্তা ,,	ব্রোমিন (তরল)
লোহা বা আয়রন ,,	গন্ধক বা সালফার (কঠিন)
পারদ বা মার্কারী (তরল)	ফসফরাস, ,,

ধাতুজাতীয় মৌলের বৈশিষ্ট্য	অ-ধাতুজাতীয় মৌলের বৈশিষ্ট্য
(i) ধাতু স্বাভাবিক অবস্থায় কঠিন এবং চকচকে বা উজ্জ্বল ও আলোক প্রতিফলনে সক্ষম। ইহাদের ঔজ্জ্বল্যকে বলা হয় ধাতব ঔজ্জ্বল্য।	(i) অ-ধাতু সাধারণত গ্যাসীয় বা তরল। কঠিন অবস্থায়ও সাধাণত অ-ধাতু অনুজ্জ্বল ও আলোক প্রতিফলনে অক্ষম। ইহাদের ধাতব ঔজ্জ্বল্য নাই।
(ii) ধাতু ভারী অর্থাৎ ইহাদের গুরুত্ব উচ্চতর ; ইহারা শক্ত ও সুদৃঢ় এবং নমনীয় ও প্রসারশীল। অধিকাংশ ধাতুর পাত তৈরী করা যায় এবং ইহাদের হাতুড়ী দিয়া পিটাইলে একপ্রকার ধাতব শব্দ হয়।	(ii) অ-ধাতু হালকা, অর্থাৎ ইহাদের গুরুত্ব নিম্নতর ; ইহারা শিথিল, ভঙ্গুর ও কাঠিন্যহীন। ইহাদের নমনীয়তা বা প্রসারশীলতা নাই এবং ইহারা ধাতব শব্দ করিতে সক্ষম নয়।
(iii) ধাতুর গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাংক উচ্চতর।	(iii) কঠিন অ-ধাতুর গলনাংক ও স্ফুটনাংক নিম্নতর।

ধাতুজাতীয় মৌলের বৈশিষ্ট্য	অ-ধাতুজাতীয় মৌলের বৈশিষ্ট্য
(iv) ধাতু তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবহনে বিশেষভাবে সক্ষম।	(iv) অ-ধাতু সাধারণত তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবহনে দুর্বল বা অক্ষম।
*(v) ধাতব মৌল পজেটিভধর্মী বলিয়া তড়িৎ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ইহারা পজেটিভ আয়ন গঠন করে এবং ক্যাথোড তড়িৎ দ্বারে সঞ্চিত হয়।	(v) অ-ধাতব মৌল নেগেটিভধর্মী বলিয়া তড়িৎ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ইহারা নেগেটিভ আয়ন গঠন করে এবং অ্যানোড তড়িৎ দ্বারে উৎপন্ন হয়।
*(vi) ধাতু সাধারণত হাইড্রোক্লোরিক ও লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডে দ্রবীভূত হয় এবং লবণ তৈরী করে	(vi) সাধারণত অ-ধাতু হাইড্রোক্লোরিক ও লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডে দ্রবীভূত হয় না।
*(vii) ধাতু ও অক্সিজেনের সংযোগে গঠিত অক্সাইড যৌগ ক্ষারক ধর্মী	(iv) অ-ধাতু ও অক্সিজেনের সংযোগে গঠিত অক্সাইড যৌগ বহু ক্ষেত্রে অ্যাসিড ধর্মী।

ধাতুর ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম : মৌলিক পদার্থ পারদ ধাতু হওয়া সত্ত্বেও কঠিন নয়, স্বাভাবিক অবস্থায় কোন কোন অ-ধাতু ন্যায় তরল। সোডিয়াম ও পটাসিয়াম ধাতুধর্মী হওয়া সত্ত্বেও জল অপেক্ষা হালকা।

অ-ধাতুর ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম : হাইড্রোজেন অ-ধাতু হওয়া সত্ত্বেও পজেটিভ বিদ্যুৎধর্মী। অ-ধাতু হওয়া সত্ত্বেও কার্বন, সালফার, ফসফরাস ও আয়োডিন স্বাভাবিক অবস্থায় ধাতুর ন্যায় কঠিন কিন্তু ইহাদের হাতুড়ি দিয়া পিটাইয়া পাতলা পাত তৈরী করা যায় না। অ-ধাতু আয়োডিন ও গ্র্যাফাইট ধাতুর ন্যায় উজ্জ্বল।

1-10. যৌগ বা যৌগিক পদার্থ (Compound) **:** দুইটি বা তাহার বেশি মৌল নির্দিষ্ট ওজনের অনুপাতে রাসায়নিক পদ্ধতিতে সংযুক্ত হইয়া যে ভিন্নধর্মী পদার্থ গঠন করে এবং যে পদার্থ বিশ্লেষণ করিয়া দুইটি বা তাহার বেশি মৌল পাওয়া যায় তাহাকে যৌগ বা যৌগিক পদার্থ বলা হয়। যথা :

জল,—হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মৌলদ্বয়ের রাসায়নিক সংযোগে গঠিত

* চিহ্নিত বিষয়গুলি পরবর্তী পরিচ্ছেদ পুনঃ পঠনের সময় অনুধাবন যোগ্য।

একটি যৌগ ; ওজন অনুযায়ী মৌলদ্বয়ের অনুপাত $H : O = 1 : 8$। কার্বন ডাই-অক্সাইড,—কার্বন ও অক্সিজেন মৌলদ্বয়ের রাসায়নিক সংযোগে গঠিত একটি যৌগ ; ওজন অনুযায়ী অনুপাত $C : O = 3 : 8$। অ্যামোনিয়া,—নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন মৌলদ্বয়ের রাসায়নিক সংযোগে গঠিত একটি যৌগ ; অনুপাত $N : H = 14 : 3$।

যৌগিক পদার্থ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা :

(i) **অজৈব যৌগিক পদার্থ** (Inorganic compound): জল, কপার অক্সাইড, সোডিয়াম ক্লোরাইড, কার্বন ডাই-অক্সাইড, অ্যামোনিয়া, সালফার ডাই-অক্সাইড, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, সালফিউরিক অ্যাসিড নাইট্রিক অ্যাসিড, কষ্টিক পটাশ ও কষ্টিক সোডা জাতীয় ক্ষার, কপার সালফেট, ক্যালসিয়াম কার্বনেট ইত্যাদি অজৈব যৌগের উদাহরণ।

(ii) **জৈব যৌগিক পদার্থ** (Organic compound): সাধারণত উদ্ভিদ বা প্রাণীর দেহজাত পদার্থ সমূহকে জৈব যৌগ বলা হয়। প্রতিটি জৈব যৌগে কার্বন ও হাইড্রোজেন বর্তমান এবং অগণিত জৈব যৌগে কার্বন ও হাইড্রোজেন ছাড়াও অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন থাকে। পৃথিবীর অগণিত প্রাকৃতিক জৈব যৌগ মূলতঃ কার্বন, হাইড্রোজেন, আক্সিজেন ও নাইট্রোজেন দ্বারা গঠিত। কয়লা, কাঠ, মোম, মিথেন, অ্যাসেটিক অ্যাসিড, বেঞ্জিন, পেট্রোলিয়াম, প্রোটিন, চিনি ইত্যাদি জৈব যৌগের কয়েকটি উদাহরণ।

প্রধানত যে বিজ্ঞান অজৈব পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্তনের তত্ত্ব ও সংযুতি চর্চা করে, তাহাকে বলা হয় **অজৈব রসায়ন** (Inorganic chemistry) এবং যে বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু প্রধানত জৈব পদার্থের চর্চা করা, তাহাকে বলা হয় **জৈব রসায়ন** (Organic chemistry)। কার্বন প্রতিটি জৈব যৌগের মূল উপাদান বলিয়া ইহাকে **কার্বন যৌগের রসায়নও** (Chemistry of carbon compounds) বলা হয়।

1-11. যৌগিক পদার্থের বৈশিষ্ট্য : যৌগিক পদার্থের মধ্যে—

(i) উপাদানরূপে একাধিক মৌল সর্বদা নির্দিষ্ট ওজনের অনুপাতে বর্তমান থাকে,—সংযোগী মৌলের ঐ তৌলিক (ওজনগত) অনুপাতের পরিবর্তন কখনও সম্ভব নয়।

(ii) যৌগিক পদার্থ গঠনের ক্ষেত্রে অপরিহার্যভাবে তাপের উদ্ভব বা শোষণ ঘটে।

(iii) যৌগিক পদার্থের মধ্যে মৌলিক পদার্থগুলির স্বধর্ম সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং যৌগিক পদার্থের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র নূতন ধর্ম সৃষ্টি হয়।

(iv) যৌগিক পদার্থের উপাদানগুলিকে সাধারণ ভৌত পদ্ধতিতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। যৌগিক পদার্থের বিশ্লেষণ একমাত্র রাসায়নিক পদ্ধতিতে ।

জলের উপাদান গ্যাসীয় মৌল হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন, কিন্তু ইহাদের সংযোগে গঠিত যৌগ অর্থাৎ জল একটি তরল পদার্থ। এরূপ মৌলদ্বয়ের সংযোগে উৎপন্ন যৌগ জলের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম সম্পূর্ণ ভিন্ন। জলের স্ফুটনাংক +100°C কিন্তু তরল হাইড্রোজেনের স্ফুটনাঙ্ক −252°C এবং তরল অক্সিজেনের −183°C। যৌগিক পদার্থ জলের মধ্যে হাইড্রোজেন বা অক্সিজেনের ধর্ম বা ভৌত অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যায়। জলীয় অণু বা মলিকুলের মধ্যে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন সর্বদা যুক্ত থাকে 2 : 16, এরূপ ওজনগত অনুপাতে।

সাধারণ সাদা বর্ণের লবণ সোডিয়াম ক্লোরাইড আমরা খাই। যে সোডিয়াম ও ক্লোরিন মৌলদ্বয় দ্বারা এই যৌগ গঠিত সেই সোডিয়াম একটি প্রচণ্ড দাহ্য ধাতু এবং ক্লোরিন সবুজাভ বর্ণের একটি প্রবল বিষাক্ত গ্যাস। লবণের অর্থাৎ সোডিয়াম ক্লোরাইডের ভৌত রাসায়নিক ধর্ম সোডিয়াম ও ক্লোরিনের ধর্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। লবণে এই মৌলদ্বয়ের কোন অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না এবং কোন ভৌত উপায়ে ইহাদের বিচ্ছিন্ন করাও সম্ভব নয়। সোডিয়াম ক্লোরাইড যৌগে সোডিয়াম ও ক্লোরিনের ভৌলিক অনুপাত সর্বদা, 23 : 35·5।

1-12. **মিশ্র পদার্থ বা মিক্সার** (Mixture): (i) মিশ্র পদার্থ বলা হয় সেরূপ পদার্থকে যাহা যে কোন পরিমাণে যে-কোন সংখ্যক মৌল বা যৌগের সংমিশ্রণে গঠিত হয়, (ii) যাহার মধ্যে কোন স্বতন্ত্র ভৌত বা রাসায়নিক ধর্ম সৃষ্টি হয় না, অর্থাৎ যাহার মধ্যে উপাদানের স্বধর্মগুলি মিশ্র পদার্থের মধ্যে অপরিবর্তিত থাকে, (iii) যাহা তৈরী করার সময়ে তাপের উদ্ভব বা অভাব ঘটে না (iv) যাহার উপাদানগুলি ভৌত উপায়ে বিচ্ছিন্ন করা যায়, (v) যাহার উপাদানগুলি মিশ্রণের মধ্যে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত অর্থাৎ

অ-সমসত্ত্ব ভাবে (heterogeneous) মিশ্রিত থাকে এবং (vi) যাহার নির্দিষ্ট কোন স্ফুটনাংক বা গলনাংক থাকে না।

কিন্তু সম্পৃক্ত দ্রবণে মিশ্র পদার্থের উপাদানগুলি সমসত্ত্বভাবে মিশ্রিত থাকে এবং ইহাদের স্ফুটনাংক বা গলনাংকও নির্দিষ্ট।

সমুদ্র-জল, পিত্তল, সোডাওয়াটার ইত্যাদি মিশ্র পদার্থের উদাহরণ; [পরবর্তী অধ্যায়ে দ্রবণ জাতীয় মিশ্র পদার্থের উদাহরণ দেখ।]

প্রশ্নাবলী

1. পৃথিবীর বস্তুরাশি কি কি শ্রেণীতে বিভক্ত? ইহাদের সংজ্ঞা লেখ এবং উদাহরণ দাও।

2. স্ফুটনাংক ও গলনাংক কাহাকে বলে? মৌল ও সেই মৌলের যৌগ বা মিশ্র পদার্থের গলনাংক কি একই?

3. খাদ্য, লবণ, চিনি, সমুদ্র জল, দুধ, গন্ধক, সোরা, পেট্রল, মরিচা, বায়ু, ইস্পাত, লঘু অ্যাসিড, পিত্তল, কষ্টিক ক্ষার, চুন, গ্র্যাফাইট, লিমোনেড, হীরা, সোডা—ইহাদের মৌলিক ও যৌগিক পদার্থে শ্রেণীবদ্ধ কর এবং এরূপ শ্রেণীবিভাগের সংক্ষিপ্ত কারণ লেখ।

4. ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তনের সংজ্ঞা লেখ। উদাহরণসহ ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তনের তুলনা কর।

5. নিম্নলিখিত পরিবর্তন ভৌত না রাসায়নিক? এরূপ পরিবর্তনের কারণ কি?

(ক) লোহার চুম্বকে পরিবর্তন, (খ) মরিচা পড়া, (গ) চুন ফুটানো, (ঘ) মোমের দহন (ঙ) ফটো তোলা (চ) জলের তড়িৎ বিশ্লেষণ (ছ) ম্যাগনেশিয়াম তারের দহন এবং (জ) তুঁতের দ্রবণ।

6. কি কি কারণে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে? উদাহরণসহ কারণ নির্দেশ কর।

7. উদাহরণসহ তাপোৎপাদী ও তাপগ্রাহী পরিবর্তনের সংজ্ঞা লেখ।

8। যৌগিক পদার্থের বৈশিষ্ট্য কি? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর। দ্রবণ কোন্ শ্রেণীভুক্ত পদার্থ?

9. ধাতু ও অধাতুর সংজ্ঞাসহ পার্থক্য লেখ। এরূপ সংজ্ঞার কয়েকটি ব্যতিক্রম নির্দেশ কর।

10. হীরা, গ্রাফাইট, তামা, ক্লোরিন, ব্রোমিন, সোনা, সীসা, পারদ—ইহাদের ধাতু ও অধাতু মৌলরূপে শ্রেণীবদ্ধ কর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দ্রবণ, দ্রাব ও দ্রাবক

জলের সহিত কাদা, বালি বা খড়িমাটি জাতীয় কঠিন পদার্থ মিশাইলে এরূপ পদার্থগুলি জলের নিচে থিতাইয়া পড়ে ; কিন্তু জলের সহিত চিনি, লবণ, তুঁতে, সোরা নিশাদল মিশ্রিত করিলে ইহারা জলের সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে একাকার হইয়া মিশিয়া যায়। এরূপ মিশ্রণকে বলা হয় জলের দ্রবণ।

জলে অনেক পদার্থ দ্রবীভূত হয় বটে কিন্তু তেল, রঙ, বার্ণিশ, মোম, ইত্যাদি জৈব পদার্থ জলে দ্রবীভূত হয় না। এরূপ জৈব পদার্থ পেট্রোল, কেরোসিন, ইথার, বেঞ্জিন, ইত্যাদি তরল পদার্থে দ্রবীভূত হয়। কার্বন-ডাই-সালফাইড নামক তরলে গন্ধক ও আইয়োডিন দ্রবীভূত হয়। সুতরাং দ্রবণ তৈরি করার ক্ষমতায় জল সর্বশ্রেষ্ঠ দ্রাবক হইলেও অন্যান্য জৈব বা অজৈব তরলের দ্রবণ ক্ষমতা আছে।

2-1. **দ্রবণ** (Solution) : জল বা অন্য কোন তরলের মধ্যে কোন কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় পদার্থের সমসত্ত্ববিশিষ্ট মিশ্রণে যে পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহাকে বলা হয় **দ্রবণ**। এরূপ দ্রবণের প্রতিবিন্দুর গঠন অভিন্ন থাকে বলিয়া এই দ্রবণকে বলা হয় **সমসত্ত্ব মিশ্রণ** (homogeneous mixture)। সমসত্ত্ব দ্রবণের প্রতি বিন্দুর ঘনত্ব বা গুরুত্ব সমান।

দ্রবণের দুইটি অংশ ; যথা : **দ্রাব ও দ্রাবক**।

যে পদার্থকে জলে বা অপর কোন তরলে দ্রবীভূত করা হয় তাহাকে বলা হয় **দ্রাব** (solute) এবং যাহার মধ্যে এরূপ দ্রাব দ্রবীভূত করা হয় তাহাকে বলা হয় **দ্রাবক** (solvent)। সুতরাং দেখা যায় যে, দ্রাব ও দ্রাবকের মিশ্রণে তৈরী হয় দ্রবণ। অর্থাৎ **দ্রবণ=দ্রাব+দ্রাবক** (Solution=solute+solvent)। উপরের উদাহরণ অনুযায়ী চিনি, লবণ, তুঁতে ইত্যাদি পদার্থ দ্রাব এবং জল দ্রাবক পদার্থ।

দুইটি তরল পদার্থের পারস্পরিক দ্রবণ ক্ষমতা উহাদের নিজস্ব ধর্মের উপর নির্ভর করে।

পরীক্ষা ঃ (i) একটি পরীক্ষা নলে কিছু জল ও অ্যালকোহল মিশ্রিত করিয়া ঝাঁকাইয়া রাখিয়া দাও। তরল দুইটি সমসত্ত্বভাবে মিশিয়া একটি দ্রবণ উৎপন্ন করিবে।

(ii) অপর একটি পরীক্ষা-নলে আংশিক জল ও আংশিক পেট্রল মিশ্রিত করিয়া পরীক্ষা-নলটি স্থিরভাবে রাখিয়া দাও। কিছুক্ষণ পরে তরল দুইটি পৃথক স্তরে বিভক্ত হইবে এবং জলের উপরের স্তরে থাকিবে পেট্রল। অর্থাৎ যে-তরলের গুরুত্ব বেশি তাহা নীচের স্তরে থাকিবে। এক্ষেত্রে দ্রবণ উৎপন্ন হইল না।

পেট্রলের স্তর
জলের স্তর
জল + পেট্রল
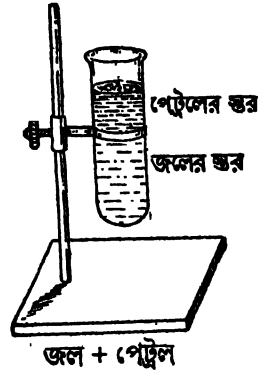
দ্রাব ও দ্রাবকের শ্রেণীভেদে বিভিন্ন দ্রবণের উদাহরণ :

(i) **তরল + কঠিন ঃ সাধারণ দ্রবণ ঃ** লবণ, তুঁতে, চিনি বা নিশাদলের জলীয় দ্রবণ। জল—(দ্রাবক) + লবণ—(দ্রাব); তার্পিনের তেলের মধ্যে গালার দ্রবণ তৈরী হইলে এরূপ দ্রবণে তার্পিন—দ্রাবক এবং গালা—দ্রাব।

(ii) **তরল + তরল ঃ তরল দ্রবণ ঃ** লঘু অ্যাসিড দ্রবণ ঃ জল—(দ্রাবক) + অ্যাসিড—(দ্রাব); গ্লিসারিন দ্রবণ ঃ গ্লিসারিন—(দ্রাব) + জল—(দ্রাবক)।

(iii) **তরল + গ্যাস ঃ গ্যাসীয় দ্রবণ ঃ** কার্বন-ডাই অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড এবং ক্লোরিন জলে দ্রবীভূত হয়। কার্বন ডাই-অক্সাইডের জলীয় দ্রবণকে সোডাওয়াটার বলা হয়।

কঠিন ও তরল পদার্থের দ্রবণে তরল পদার্থ দ্রাবক এবং কঠিন পদার্থ দ্রাব। তরল দ্রবণে যে তরলের পরিমাণ বেশি তাহা দ্রাবক ও অন্য তরল দ্রাব।

দ্রবণের শ্রেণীবিভাগ ঃ দ্রবণ তিন প্রকারের হইতে পারে। যথা : (i) অসম্পৃক্ত দ্রবণ, (ii) সম্পৃক্ত দ্রবণ এবং (iii) অতিপৃক্ত দ্রবণ।

পরীক্ষা ঃ 1. এক বীকার জলে এক চামচ চিনি বা তুঁতে মিশাও। বীকারে চিনি বা তুঁতের দ্রবণ প্রস্তুত হইল।

2. এই দ্রবণে যতক্ষণ পর্যন্ত বীকারের নিচে চিনি বা তুঁতে থিতাইয়া না পড়ে ততক্ষণ পর্যন্ত চিনি বা তুঁতে মিশাইয়া কাচের দণ্ড দিয়া নাড়িয়া দাও। চিনি বা তুঁতের দ্রবীভূত হওয়ার

ক্ষমতা সম্পূর্ণ হইলে অতিরিক্ত চিনি বা তুঁতে বীকারের তলায় পড়িবে এবং দ্রবণ প্রস্তুত করা সম্পূর্ণ হইবে।

এই পরিষ্কার দ্রবণ উপর হইতে অন্য একটি বীকারে ঢালিয়া রাখ।

৪. বীকারের দ্রবণ উত্তপ্ত করিয়া ইহাতে আরো চিনি বা তুঁতে মিশাও। এরূপ উত্তপ্ত দ্রবণে অতিরিক্ত চিনি বা তুঁতে মিশ্রিত করা যাইবে। ইহা বিকারের তলায় পড়িবে না। তলায় পড়িতে আরম্ভ করিলে অতিরিক্ত চিনি বা তুঁতে মিশানো বন্ধ কর।

(1)-নং পরীক্ষায় জানা যায় যে দ্রবণ প্রস্তুত সম্পূর্ণ হয় নাই। (2)-নং পরীক্ষায় দেখা যায় যে দ্রবণ তৈরী সম্পূর্ণ হইয়াছে। (3)-নং পরীক্ষায় দেখা যায় যে দ্রবণ উত্তপ্ত করিলে দ্রবণের দ্রাব অর্থাৎ চিনি বা তুঁতে গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

2-2. **অসম্পৃক্ত দ্রবণ** (Unsaturated solution) : নির্দিষ্ট উষ্ণতায় কোন কঠিন পদার্থের জলীয় বা অন্য তরলের দ্রবণের মধ্যে যদি আরও কঠিন পদার্থ দ্রবীভূত করা যায় তবে সেই অসম্পূর্ণ দ্রবণকে বলা হয় অসম্পৃক্ত দ্রবণ।

দুইটি ভিন্ন ধর্মী তরল পদার্থকে মিশ্রিত করা সম্ভব হইলে দুইটি তরলের অসম্পৃক্ত ও সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরী করা যায়। সেইরূপ কোন তরলের মধ্যে গ্যাসের মিশ্রণ সম্ভব হইলেও অসম্পৃক্ত ও সম্পৃক্ত গ্যাসীয় দ্রবণ তৈরী করা যায়। জলের সঙ্গে অ্যাসিড বা গ্লিসারিণ অল্প মাত্রায় মিশ্রিত করিলে অ্যাসিড বা গ্লিসারিণের অসম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরী হয় এবং পূর্ণ মাত্রায় মিশ্রিত করিলে ইহাদের সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরী হয়। সেইরূপ জলের সঙ্গে কার্বন ডাই-অক্সাইড বা সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাস অল্পমাত্রায় মিশ্রিত করিলে অসম্পৃক্ত গ্যাসীয় দ্রবণ এবং পূর্ণমাত্রায় মিশ্রিত করিলে সম্পৃক্ত গ্যাসীয় দ্রবণ তৈরী করা যায়।

অসম্পৃক্ত দ্রবণে দ্রাবের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম থাকিলে তাহাকে বলা হয় লঘু দ্রবণ (dilute solution); পক্ষান্তরে দ্রবণ সম্পৃক্ত বা প্রায় সম্পৃক্ত হইলে তাহাকে বলা হয় **গাঢ়দ্রবণ** (concentrated solution)। লঘু অ্যাসিড (dilute acid) ও গাঢ় অ্যাসিড (concentrated acid) এরূপ উদাহরণ।

2-3. **সম্পৃক্ত দ্রবণ** (Saturated solution) : কোন তরলের মধ্যে কোন দ্রাব (কঠিন, তরল বা গ্যাস) কোন নির্দিষ্ট উষ্ণতায় যতখানি পরিমাণে দ্রবীভূত করা যায় তাহা পূর্ণমাত্রায় দ্রবীভূত করিয়া যে-দ্রবণ প্রস্তুত করা হয় তাহাকে বলা হয় ঐ উষ্ণতায় সেই দ্রাবের সম্পৃক্ত দ্রবণ। এরূপ সম্পৃক্ত

দ্রবণ প্রস্তুত করার পরে দ্রবণে অতিরিক্ত দ্রাব আর দ্রবীভূত করা সম্ভব নয়। অতিরিক্ত দ্রাব্য মিশ্রিত করিলে তাহা অদ্রাব্য পদার্থ রূপে পাত্রের তলায় থিতাইয়া পড়ে।

দ্রবণের উপর উষ্ণতার প্রভাব : জলের মধ্যে কঠিন পদার্থের দ্রবণের সম্পৃক্তি দ্রবণের উষ্ণতা বা তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে। সাধারণত দ্রবণের উষ্ণতা বৃদ্ধি করিলে সম্পৃক্ত দ্রবণ অসম্পৃক্ত দ্রবণে পরিণত হয় এবং এরূপ দ্রবণে অতিরিক্ত দ্রাব দ্রবীভূত করা যায়। তাই, কোন দ্রাবকের মধ্যে দ্রাবের দ্রবণীয়তা সাধারণত উষ্ণতার উপর নির্ভরশীল।

উদাহরণ : 30° সেন্টিগ্রেড (C) তাপমাত্রায় 100 গ্রাম জলে 45 গ্রাম পটাসিয়াম নাইট্রেট দ্রবীভূত হইলে সম্পৃক্ত দ্রবণ প্রস্তুত হয়। 100 গ্রাম জল 50°C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরী করার জন্য 85 গ্রাম পটাসিয়াম নাইট্রেট দ্রবীভূত করে। 60°C তাপমাত্রায় এরূপ সম্পৃক্ত দ্রবণ অসম্পৃক্ত দ্রবণে পরিণত হয় এবং এরূপ অসম্পৃক্ত দ্রবণে 110 গ্রাম পর্যন্ত পটাসিয়াম নাইট্রেট মিশ্রিত করিলে সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরী হয়।

2-4. **অতিপৃক্ত দ্রবণ** (Super-saturated solution) : কোন নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত দ্রবণ প্রস্তুত করার জন্য যে পরিমাণ দ্রাবের প্রয়োজন, যদি কোন বিশেষ অবস্থায় সেই দ্রবণে তার চেয়ে বেশী পরিমাণে দ্রাব দ্রবীভূত থাকে তাহা হইলে এরূপ দ্রবণকে বলা হয় অতিপৃক্ত দ্রবণ।

উদাহরণ : একটি পরীক্ষা-নলে সোডিয়াম থায়োসালফেটের স্ফটিক বা কেলাস রাখিয়া ধীরে ধীরে উত্তপ্ত করিলে এরূপ স্ফটিক গলিয়া তরল পদার্থে পরিণত হয় এবং প্রস্তুত হয় একটি স্বচ্ছ দ্রবণ। সোডিয়াম থায়োসালফেট স্ফটিকের অণুতে যে জল কণা থাকে সেই জল-কণার মধ্যে উহা দ্রবীভূত হওয়ায় দ্রবণ তৈরী হয়। এই পরীক্ষা-নলের মুখ কর্ক বা তুলা দ্বারা বন্ধ করিয়া রাখিলে এরূপ দ্রবণ তরল অবস্থায় থাকে বলিয়া উহাকে অতিপৃক্ত দ্রবণ বলা হয়। এরূপ দ্রবণে এক টুকরা সোডিয়াম থায়োসালফাইড দানা ফেলিলে দ্রবণটি জমিয়া পুনরায় কঠিন অবস্থায় পরিণত হয়।

2-5. **দ্রবণীয়তা** (Solubility) : কোন নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় 100 গ্রাম ওজনের দ্রাবক সর্বাধিক যে পরিমাণে দ্রাব বা দ্রবণীয় পদার্থ দ্রবীভূত করিতে পারে, সেই নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ঐ ওজন সংখ্যাকে বলা হয় উক্ত পদার্থটির

দ্রবণীয়তা। অর্থাৎ নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় 100 গ্রাম দ্রাবক-কে সংপৃক্ত দ্রবণে পরিণত করিতে যত গ্রাম দ্রাব বা দ্রবণীয় পদার্থ প্রয়োজন হয়, ঐ তাপমাত্রায় উক্ত পদার্থের দ্রবণীয়তা সেই সংখ্যার সমান।

2-6. দ্রবণীয়তার সহিত তাপের সম্পর্ক (Relation of solubility with temperature): কঠিন পদার্থের দ্রবণীয়তা দ্রবণের উষ্ণতার উপর নির্ভর করে। স্বাভাবিক উষ্ণতায় 100 গ্রাম জলে যত গ্রাম কপার সালফেট বা পটাসিয়াম নাইট্রেট দ্রবীভূত হয়, দ্রবণের উষ্ণতা বৃদ্ধি করিলে কপার সালফেট বা পটাসিয়াম নাইট্রেট অধিকতর পরিমাণে দ্রবীভূত হয়। সাধারণত দেখা যায় যে, উষ্ণতা বৃদ্ধি করিলে দ্রবণীয় কঠিন পদার্থের দ্রবণীয়তা বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে উষ্ণতা হ্রাস করিলে দ্রবণীয়তা হ্রাস পায়।

উদাহরণ: 30° সেন্টিগ্রেড (C) উষ্ণতায় 100 গ্রাম জল 36 গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইড (খাদ্য লবণ) দ্রবীভূত করিয়া সংপৃক্ত দ্রবণ তৈরী করে। সুতরাং 30°C-এ লবণের দ্রাব্যতা 36।

কঠিন পদার্থের দ্রবণীয়তা বিভিন্ন। আবার দ্রাবক যদি বিভিন্ন হয় তবে কঠিন পদার্থের দ্রবণীয়তাও বিভিন্ন হয়। জলের বদলে, যদি অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন পারক্সাইড, ইথার বেঞ্জিন বা স্পিরিট দ্রাবকরূপে ব্যবহার করা হয়, তবে পদার্থের দ্রবণীয়তাও বিভিন্ন হয়। সুতরাং কোন পদার্থের দ্রবণীয়তা—(i) দ্রাব অর্থাৎ দ্রবণীয় পদার্থের ধর্ম, (ii) দ্রাবকের ধর্ম এবং (iii) দ্রবণের উষ্ণতার উপতার উপরে নির্ভর করে।

বিভিন্ন উষ্ণতায় 100 গ্রাম জলে বিভিন্ন পদার্থের দ্রণীয়তা কিরূপ নিম্নে তাহার তিনটি উদাহরণ দেওয়া হইল।

100 গ্রাম দ্রবণীয় পদার্থের নাম উষ্ণতা—	0°C	50°C	100°C
পটাসিয়াম নাইট্রেট	13·3	85·5	246·0
সোডিয়াম ক্লোরাইড	35·6	36·7	39·1
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট	35·0	45·5	74·0

ইহার অর্থ 100°C উষ্ণতায় সম্পৃক্ত 100 গ্রাম পটাসিয়াম নাইট্রেটের দ্রবণকে 50°C তাপমাত্রায় শীতল করিলে দ্রবণ হইতে (246·0−85·5)=160·5 গ্রাম পটাসিয়াম নাইট্রেট দ্রবণের তলায় থিতাইয়া পড়িবে। সেইভাবে 50°C তাপমাত্রায় 100 গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইডের দ্রবণকে 0°C তাপমাত্রায় শীতল করিলে (36·7—35·6)=1·1 গ্রাম লবণ দ্রবণের তলায় থিতাইয়া পড়িবে।

2-7. **দ্রবণীয়তা-লেখ** (Solubility curve) : উলম্ব অক্ষে দ্রবণীয়তা এবং অনুভূমিক অক্ষে উষ্ণতা নির্দেশ করিয়া বিভিন্ন উষ্ণতায় কোন দ্রবণীয় পদার্থের দ্রবণীয়তা কত তাহা চিহ্নিত করিয়া সেই চিহ্নগুলিকে একটি রেখা দ্বারা সংযুক্ত করিলে যে রেখা অঙ্কিত হয় তাহাকে দ্রবণীয়তা-লেখ বা সলিউবিলিটি কার্ভ বলা হয়।

2-8. **দ্রবণীয়তা-লেখ-র প্রয়োজনীয়তা** (Utility of solubility curve) : দ্রবণীয়তা লেখ হইতে নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি নির্ণয় করা যায় :—

(1) বাস্তব পরীক্ষা না করিয়াও যে কোন তাপমাত্রায় পদার্থের দ্রবণীয়তা কত তাহা নির্ণয় করা যায়। যথা, 50°C তাপমাত্রায় সোডিয়াম ক্লোরাইডের দ্রবণীয়তা 36.

(2) একই তাপ-মাত্রায় বিভিন্ন পদার্থের দ্রবণীয়তার তুলনামূলক মাত্রা নির্ণয় করা যায়। যথা, 100°C তাপমাত্রায় সোডিয়াম ক্লোরাইডের দ্রবণীয়তা 39 ; ম্যাগনেসিয়াম সালফেটের দ্রবণীয়তা 74.

(3) তাপমাত্রা হ্রাস বা বৃদ্ধির সঙ্গে কিরূপ মাত্রায় পদার্থের দ্রবণীয়তা হ্রাস বা বৃদ্ধি পায় তাহা নির্দেশ করা যায়। যথা : ম্যাগনেসিয়াম সালফেটের দ্রবণীয়তা বৃদ্ধি পায় ধীরে ধীরে ; পটাসিয়াম নাইট্রেটের দ্রবণীয়তা অত্যন্ত উচ্চহারে বৃদ্ধি পায়
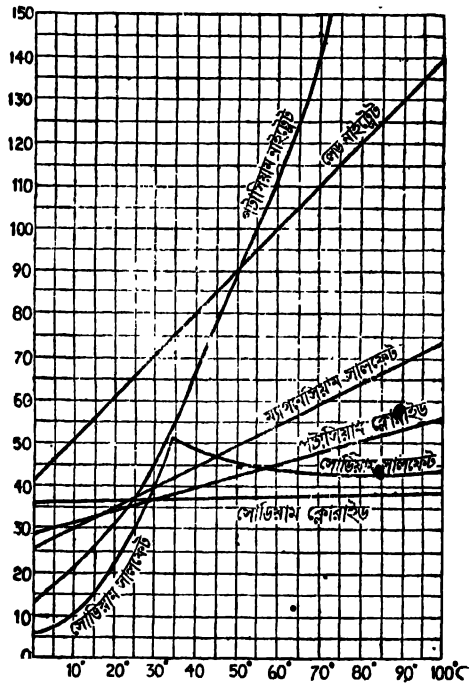
দ্রবণীয়তা-লেখ বা সলিউবিলিটি কার্ভ

(4) দুইটি পদার্থের সম্পৃক্ত দ্রবণ মিশ্রিত করিয়া শীতল করিলে কোন্ পদার্থ আগে বিচ্ছিন্ন হইয়া থিতাইয়া পড়িবে তাহাও নির্ণয় করা যায়। যথা: সোডিয়াম ক্লোরাইড ও লেড নাইট্রেটের মিশ্র সম্পৃক্ত দ্রবণ শীতল করিলে সোডিয়াম ক্লোরাইডের দ্রবণীয়তা কম বলিয়া উহা আগে থিতাইয়া পড়িবে।

2-9. **দ্রাব ও দ্রাবকের পৃথকীকরণ** (Separation of solute from solvent): (i) তাপের সাহায্যে দ্রবণ উত্তপ্ত করিলে জল বাষ্পীভূত হয় এবং পাত্রে অবশেষরূপে পড়িয়া থাকে কঠিনাকার দ্রাব। কপার সালফেটের (তুঁতের) নীল দ্রবণ বাষ্পীভূত করিলে পাত্রে কঠিন তুঁতে অবশেষরূপে পড়িয়া থাকিবে। (ii) উচ্চ তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত দ্রবণ শীতল করিলে দ্রাবের একাংশ স্ফটিকাকারে থিতাইয়া পড়ে। এইভাবে পটাসিয়াম নাইট্রেটের ন্যায় দ্রাবের স্ফটিক তৈরী করা যায়। (iii) যে কোন দ্রবণ পাতিত করিলে পাতন পাত্রে অবশেষরূপে পড়িয়া থাকে কঠিনাকার দ্রাব এবং গ্রাহকপাত্রে সঞ্চিত হয় দ্রাবক।

প্রশ্নাবলী

1. অসম্পৃক্ত, সম্পৃক্ত ও অতিপৃক্ত দ্রবণের সংজ্ঞা লেখ ও উদাহরণ দাও।

2. কি প্রকারে সম্পৃক্ত দ্রবণকে অসম্পৃক্ত এবং অসম্পৃক্ত দ্রবণকে সম্পৃক্ত দ্রবণে পরিণত করা যায়?

3. দ্রবণীয়তার সংজ্ঞা লেখ। দ্রবণের উপর তাপের প্রভাব উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

4. দ্রবণীয়তার সহিত উষ্ণতার সম্পর্ক বিবৃত কর। একটি পদার্থের দ্রবণীয়তা 80°C-এ-300 45°C-এ-40, 60°C-এ-15 এবং 60°C-এ-75 ; 80°C তাপমাত্রায় প্রাপ্ত 100 গ্রাম দ্রবণকে 30°C এবং 15°C তাপমাত্রায় শীতল করিলে কি হইবে?

5. দ্রবণীয়তা-লেখ কি? উহার উপযোগিতা বর্ণনা কর।

6. নিম্নলিখিত দ্রবণে দ্রাব্য ও দ্রাবকের সঠিক উত্তর দাও :—

(ক) চিনির জলীয় দ্রবণ; (খ) গ্লিসারিনের দ্রবণ; (গ) ক্লোরিনের জলীয় দ্রবণ; (ঘ) বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের গ্যাসীয় দ্রবণ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রতীক চিহ্ন, ফর্মুলা, রাসায়নিক বিক্রিয়া ও সমীকরণ

প্রকৃতিতে এবং রসায়নাগারে যে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে বা ঘটানো হয় সেই ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার প্রকৃতি, পদ্ধতি ও পরিণতির তাৎপর্য বিশ্লেষণ ও অনুধাবন করা রসায়ন বিজ্ঞানচর্চার বিষয়বস্তু।

আমাদের পৃথিবীর বস্তুরাশি মৌলিক পদার্থের সূক্ষ্মতম কণা দ্বারা গঠিত। এরূপ কণাগুলিকে বলা হয় **পরমাণু** বা **অ্যাটম**।

3-1. **পরমাণু** (atom) : যে-কোন মৌলিক পদার্থের অবিভাজ্য সূক্ষ্মতম কণাকে বলা হয় ঐ মৌলের পরমাণু বা অ্যাটম।

[বিশেষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বর্তমানে পরমাণুকে খণ্ডিত করা যায়।]

3-2. **অণু** (Molecule) : কোন মৌল অথবা যৌগের স্বাধীন সত্ত্বাবিশিষ্ট ক্ষুদ্রতম কণিকাকে ঐ মৌলের অথবা যৌগের অণু বলা হয়। প্রকৃতিতে পদার্থ পাওয়া যায় প্রধানত অণু-কণারূপে। অণু গঠিত হয় দুই প্রকারে—

3-3. **মৌল অণু** (Elementary molecule) : একই মৌলের একাধিক পরমাণুর সংযোগে যে অণু গঠিত হয় তাহাকে বলা হয় মৌল অণু।

হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ক্লোরিন ইত্যাদি প্রকৃতিতে মৌল অণু রূপে পাওয়া যায়। ইহারা দুইটি করিয়া পরমাণু দ্বারা গঠিত বলিয়া এরূপ মৌলের অণুকে মৌল অণু বলা হয়।

যৌগ অণু (Compound molecule) : দুইটি বা তার বেশী মৌলের পরমাণু দ্বারা গঠিত অণুকে বলা হয় যৌগ অণু।

জলের যৌগ অণু দুইটি হাইড্রোজেন এবং একটি অক্সিজেন পরমাণু দ্বারা গঠিত। সোডিয়াম ক্লোরাইডের অণু একটি সোডিয়াম পরমাণু ও একটি ক্লোরিন পরমাণু দ্বারা গঠিত। একটি কার্বন ডাই-অক্সাইড অণু একটি কার্বন ও দুইটি অক্সিজেন পরমাণু দ্বারা গঠিত। একটি অ্যামোনিয়া অণু একটি নাইট্রোজেন ও তিনটি হাইড্রোজেন পরমাণু দ্বারা গঠিত।

মনে কর মৌলের পরমাণুর প্রতীক চিহ্ন নিম্নরূপ—

সুতরাং প্রতীক চিহ্ন অনুযায়ী মৌল অণু ও যৌগ অণুর চিত্র অঙ্কিত করা যায় নিম্নরূপে :
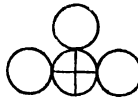
প্রকৃতিতে হিলিয়াম, আরগন, নিয়ন, ক্রিপটন ইত্যাদি কয়েকটি নিষ্ক্রিয় গ্যাসীয় পদার্থের পরমাণু ব্যতীত অন্যান্য গ্যাসীয় মৌলের পরমাণু স্বাধীন অবস্থায় পাওয়া যায় না। বিভিন্ন মৌলের কণাকে প্রকৃতিতে পাওয়া যায় মূলত স্বাধীন সত্তাবিশিষ্ট অণু বা মলিকুলরূপে।

3-4. **মৌলের পরমাণুর প্রতীক-চিহ্ন** (Symbol of atom of an element) : যে কোন মৌলের পরমাণুর প্রতীক চিহ্ন বা সিমবল নির্দিষ্ট করা হয় সেই মৌলের নামের প্রথম অক্ষর বা সেই অক্ষরের সঙ্গে নামের আরেকটি অক্ষর যুক্ত করিয়া। মৌলের নামগুলি সাধারণত ল্যাটিন শব্দে লিখিত হয়। কোন কোন মৌলের ক্ষেত্রে ইংরাজী শব্দও ব্যবহৃত হয়। নিচে কয়েকটি মৌলের নাম এবং প্রতীক চিহ্ন প্রদত্ত হইল :

বাংলা নাম	ইংরেজী নাম	ল্যাটিন নাম	প্রতীক চিহ্ন
হাইড্রোজেন	Hydrogen	...	H
অক্সিজেন	Oxygen	...	O
নাইট্রোজেন	Nitrogen	...	N
কার্বন (অঙ্গার)	Carbon	...	C

বাংলা নাম	ইংরেজী নাম	ল্যাটিন নাম	প্রতীক চিহ্ন
সোডিয়াম	Sodium	Natrum	Na
অ্যালুমিনিয়াম	Aluminium	... ...	Al
লোহা	Iron	Ferrum	Fe
তামা	Copper	Cuprum	Cu
সোনা	Gold	Aurum	Au
পারদ	Mercury	Hydrargyum	Hg
গন্ধক	Sulphur	... ...	S
ফসফরাস	Phosphorous	... ...	P
পটাসিয়াম	Potassium	Kalium	K
ম্যাগনেসিয়াম	Magnesium	... ...	Mg
ক্যালসিয়াম	Calcium	... ...	Ca
দস্তা (জিংক)	Zinc	... ...	Zn
সীসা	Lead	Plumbum	Pb
ইয়ুরেনিয়াম	Uranium	... ...	U

3-5. **আণবিক সংকেত বা মলিকুলার ফর্মুলা** (Molecular formula) এক বা একাধিক একরকম বা ভিন্ন মৌলের যে কয়টি পরমাণুর সংযোগে একটি মৌল বা যৌগ অণু গঠিত হয় সেই পরমাণুগুলির প্রতীক চিহ্ন সংযুক্তভাবে লিখিত হইলে সেই পারমাণবিক চিহ্নসমূহের সংযুক্তির পরিচয়কে বলা হয় অণুর সংকেত বা **আণবিক সংকেত** বা **মলিকুলার ফর্মুলা**।

হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও ক্লোরিনের মৌল অণু বা মলিকুল দুইটি করিয়া পরমাণু দ্বারা গঠিত বলিয়া এরূপ মৌল অণুগুলির ফর্মুলা যথাক্রমে, —H_2, O_2, N_2, Cl_2, ইত্যাদি।

সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, আয়রন (লোহা), কপার (তামা) জিংক ইত্যাদি ধাতু জাতীয় মৌলের অণু একটি করিয়া পরমাণু দ্বারা গঠিত। তাই, যথাক্রমে ইহাদের আণবিক ফর্মুলা বা সংকেত হইবে,—Na, K, Ca, Fe, Cu, Zn ইত্যাদি।

লবণ (সোডিয়াম ক্লোরাইড) একটি সোডিয়াম ও একটি ক্লোরিন পরমাণু দ্বারা গঠিত বলিয়া যৌগ অণুরূপে লবণের ফর্মুলা বা সংকেত—NaCl। জলের যৌগ অণু দুইটি হাইড্রোজেন এবং একটি অক্সিজেন পরমাণু দ্বারা গঠিত। তাই, ইহার ফর্মুলা—H_2O; কার্বন ডাই-অক্সাইডের যৌগ অণু

একটি কার্বন পরমাণু ও দুইটি অক্সিজেন পরমাণু দ্বারা গঠিত। তাই, ইহার ফর্মুলা—CO_2 ;

অণু গঠনের প্রণালী : যে-কোন মৌলের পরমাণুর সঙ্গে যে-কোন মৌলের পরমাণু ইচ্ছামত পরস্পরে যুক্ত হইয়া অণু গঠন করিতে পারে না। যে সকল মৌল পরস্পরে যুক্ত হইয়া অণু গঠনে সক্ষম তাহারাও যে-কোন সংখ্যায় পরস্পরে যুক্ত হইতে পারে না। কিরূপ মৌল অন্য কোন মৌলের সঙ্গে এবং কত সংখ্যক পরমাণু পরস্পরে যুক্ত হইয়া অণু গঠন করে তাহার প্রকৃতি ও প্রণালী সুনির্দিষ্ট। সাধারণভাবে বলা যায় :

(i) ধাতু জাতীয় মৌল অধাতু জাতীয় মৌলের সঙ্গে যুক্ত হইয়া যৌগ অণু গঠন করে। ধাতু জাতীয় মৌল ধনাত্মক বা পজিটিভ তড়িৎ ধর্মী এবং অধাতু জাতীয় মৌল ঋণাত্মক বা নেগেটিভ তড়িৎ ধর্মী। এরূপ ধনাত্মক ও ঋণাত্মক তড়িৎ ধর্মী মৌল পরস্পরে যুক্ত হইয়া যৌগ গঠন করে।

(ii) কোন ধাতু জাতীয় মৌলের কয়টি পরমাণু অধাতু জাতীয় মৌলের কয়টি পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হইয়া যৌগ অণু গঠন করিবে তাহা নির্ভর করে ঐ মৌলের যোজন ক্ষমতা বা যৌজ্যতা তথা মৌলের ভ্যালেন্সীর উপরে।

মৌলের যোজ্যতা বা ভ্যালেন্সী (Valency) **:** সমধর্মী বা ভিন্ন ধর্মী মৌলগুলি যে ক্ষমতায় পরস্পরে রাসায়নিক সংযোগ স্থাপন করিয়া অণু গঠন করে সেই ক্ষমতাকে বলা হয় **যোজ্যতা** বা **যোজন ক্ষমতা** বা **কম্বাইনিং ক্যাপাসিটি** (combining capacity).

কোন মৌলের পরমাণু কয়টি হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হইয়া রাসায়নিক যৌগ গঠনে সক্ষম সেই সংখ্যা দ্বারা সেই মৌলের যোজ্যতা নির্ণয় করা হয়। **হাইড্রোজেনের যোজ্যতা ধরা হয় এক** (1) ; সুতরাং কোন মৌলের পরমাণু যে কয়টি হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে রাসায়নিক সংযোজনে অণু গঠন করে সেই সংখ্যাকেই বলা হয় সেই মৌলের যোজ্যতা। যথা :

একটি H-পরমাণু এবং **একটি Cl পরমাণু** একটি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড অণু (HCl) গঠন করে ;

দুইটি H-পরমাণু এবং **একটি O-পরমাণু** একটি জল-অণু (H_2O) গঠন করে ;

H-পরমাণু এবং **একটি N পরমাণু** একটি অ্যামোনিয়া অণু (NH_3) গঠন করে ;

চারটি H-পরমাণু এবং একটি কার্বন পরমাণু একটি মিথেন অণু (CH_4) গঠন করে ;

সুতরাং, ক্লোরিনের যোজ্যতা এক (1), অক্সিজেনের দুই (2), নাইট্রোজেনের তিন (3) এবং কার্বনের চার (4) ;

হাইড্রোজেন প্রতিটি মৌলের সঙ্গে যুক্ত হইয়া যৌগ গঠন করিতে পারে না। কিন্তু ক্লোরিন প্রায় সমস্ত মৌলের সঙ্গে রাসায়নিক যৌগ গঠনে সক্ষম। তাই, যে কয়টি ক্লোরিন পরমাণুর সঙ্গে কোন মৌলের একটি পরমাণু যুক্ত হয় তাহাই সেই মৌলের যোজ্যতা বা যোজন ক্ষমতা।

বিভিন্ন মৌলের যোজ্যতার তালিকা—

যোজ্যতা এক (1) : হাইড্রোজেন (H), ক্লোরিন (Cl), সোডিয়াম (Na), পটাসিয়াম (K) ইত্যাদি ;

যোজ্যতা দুই (2) : অক্সিজেন (O), ক্যালসিয়াম (Ca), ম্যাগনেসিয়াম (Mg) জিংক (Zn), সালফার (S), আয়রণ (Fe) ইত্যাদি ;

যোজ্যতা তিন (3) : নাইট্রোজেন (N), অ্যালুমিনিয়াম (Al), গোল্ড (Au), আয়রণ (Fe), ফসফরাস (P) ইত্যাদি ;

যোজ্যতা চার (4) : কার্বন (C), সিলিকন (Si), টিন (Sn), লেড (Pb) ইত্যাদি ;

যোজ্যতা পাঁচ (5) : নাইট্রোজেন (N), ফসফরাস (P) ইত্যাদি ;

যোজ্যতা ছয় (6) : সালফার (S), ক্রোমিয়াম (Cr) ইত্যাদি ;

যোজ্যতা সাত (7) : ম্যাঙ্গানীজ (Mn) ইত্যাদি ;

যোজ্যতা আট (8) : অসমিয়াম (Os) ইত্যাদি ;

হিলিয়াম (He), নিয়ম (Ne), আরগণ (Ar) ইত্যাদি নিষ্ক্রিয় মৌল অন্য কোন মৌলের সঙ্গে যুক্ত হইয়া অণু গঠন করিতে পারে না বলিয়া যোজ্যতা শূন্য বা যোজন ক্ষমতাহীন।

একাধিক বা পরিবর্তনশীল যোজ্যতা (Variable valency) ; কপার (Cu), আয়রণ (Fe), নাইট্রোজেন (N), সালফার (S), লেড (Pb) ফসফরাস (P) ইত্যাদির একাধিক যোজ্যতা বর্তমান। যথা : **কপারের**—1, 2 ; **আয়রনের**—2, 3 ; **নাইট্রোজেনের**—1, 2, 3, 4, 5 ; **সালফারের**—2, 4, 6 এবং **ফসফরাসের**—3, 5 ;

3-6. **মূলক ও মূলকের যোজ্যতা :** কখন কখন একাধিক মৌলের জোটকে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অবিভাজ্য পরমাণুর ন্যায় ব্যবহার করিতে দেখা

যায়। এরূপ মৌল জোটকে স্বাধীনভাবে সংগ্রহ করা যায় না, কিন্তু ইহারা যৌগের আণবিক কাঠামোতে আবদ্ধ থাকে। এরূপ বিশেষ ধরণের মৌল-জোটকে বলা হয় **যৌগ মূলক** বা কম্পাউণ্ড র‍্যাডিক্যাল (compound radical)।

এরূপ এক একটি যৌগ মূলকের মৌলের ন্যায় যোজ্যতা বর্তমান। যথা :

যৌগ-মুলক	প্রকৃতি	সংকেত	যোজ্যতা
হাইড্রোক্সিল	অ-ধাতু ধর্মী (ঋণাত্মক)	OH^-	1
সালফেট	অ-ধাতু ধর্মী (ঋণাত্মক)	$SO_4^=$	2
নাইট্রেট	অ-ধাতু ধর্মী (ঋণাত্মক)	NO_3^-	1
কার্বনেট	অ-ধাতু ধর্মী (ঋণাত্মক)	$CO_3^=$	2
ফসফেট	অ-ধাতু ধর্মী (ঋণাত্মক)	$PO_4^{\equiv}$	3
অ্যামোনিয়াম	ধাতুধর্মী (ধনাত্মক)	NH_4^+	1

এরূপ যৌগ মূলকের কয়েকটি যৌগের নমুনা : সোডিয়াম হাইড্রক-সাইড বা কষ্টিক সোডা—NaOH ; জিংক সালফেট—$ZnSO_4$; পটাসিয়াম নাইট্রেট (সোরা)—KNO_3 ; ক্যালসিয়াম কার্বনেট (চুনা-পাথর)—$CaCO_3$; ক্যালসিয়াম ফসফেট (হাড় বা প্রাকৃতিক সার)—$Ca_3(PO_4)_2$ এবং অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড (নিশাদল)—NH_4Cl ;

3·7. **আণবিক সংকেত বা মলিকুলার ফর্মুলা** (Molecular Formula) **রচনার পদ্ধতি :** যোজ্যতাই যে বিভিন্ন মৌলের পারস্পরিক সংযোগে রাসায়নিক যৌগ গঠনের কারণ তাহা জানার ফলে বিভিন্ন যৌগের অণুর নির্ভুল আণবিক সংকেত রচনা করার পদ্ধতি জানা সম্ভব হইয়াছে। আণবিক সংকেত রচনার মূল পদ্ধতি নিম্নরূপ :

(i) বিভিন্ন মৌলের পরমাণুগুলি এমন সংখ্যায় পরস্পরে সংযুক্ত হইবে যাহাতে সংযোগী মৌলদ্বয় বা মৌল ও মূলকের মোট যোজ্যতার সংখ্যা সমান হইবে।

(ii) সংযোগী মৌলদ্বয় বা মৌল ও মূলকের একের যোজ্যতার সংখ্যাটি অপরের গায়ে এবং ইহাদের ডানপাশে ও নিচে লিখিতে হইবে।

(iii) ধাতু জাতীয় মৌল বা ধাতুধর্মী মূলকের প্রতীক চিহ্ন প্রথমে লিখিতে হইবে এবং অধাতু জাতীয় মৌল বা মূলক পরে লিখিতে হইবে।

(iv) দুইটি অধাতু জাতীয় মৌল যৌগ গঠন করিলে ইহাদের মধ্যে যে

মৌলটিকে প্রকৃতিতে কঠিন অবস্থায় পাওয়া যায় সেই মৌলের প্রতীক চিহ্ন প্রথমে লিখিতে হইবে।

আণবিক সংকেত রচনার কয়েকটি উদাহরণ—

জল অণু (H_2O): জলের যৌগ অণু হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন দ্বারা গঠিত। যেহেতু হাইড্রোজেন ধাতুধর্মী সেজন্য ইহার প্রতীক চিহ্ন প্রথমে বসিবে। যথা HO ; কিন্তু এই সংকেত অসম্পূর্ণ। অক্সিজেনের যোজ্যতা দুই (2) এবং ইহা হাইড্রোজেনের প্রতীক চিহ্নের ডান পাশে ও নিচে বসিবে। যথা : H_2 ; হাইড্রোজেনের যোজ্যতা এক (1) এবং ইহা অক্সিজেনের প্রতীক চিহ্নের ডান পাশে ও নিচে বসিবে। যথা : O_1 ; সুতরাং আণবিক সংকেত বা মলিকুলার ফর্মুলা লিখিতে হইবে এইভাবে—H_2O_1 বা H_2O ; দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণুর যোজ্যতা—2 এবং একটি অক্সিজেন পরমাণুর যোজ্যতা—2 ;

কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2): কার্বন মৌলকে কঠিন অবস্থায় পাওয়া যায়। তাই সংযোগী দুইটি মৌলই অধাতু হওয়া সত্ত্বেও কার্বনের প্রতীক চিহ্ন প্রথমে বসিবে। কার্বনের যোজ্যতা—4 এবং অক্সিজেনের 2 ; সুতরাং কার্বনের যোজ্যতার সংখ্যা অক্সিজেনের প্রতীক চিহ্নের গায়ে এবং অক্সিজেনের যোজ্যতার সংখ্যা কার্বনের প্রতীক চিহ্নের গায়ে বসিবে। যথা : C_2 এবং O_4 ; দুইটি কার্বন পরমাণুর মোট যোজ্যতা—$4 \times 2 = 8$ এবং চারটি অক্সিজেন পরমাণুর মোট যোজ্যতার সংখ্যা—$2 \times 4 = 8$; তাই, যোজ্যতার সমতা স্থাপিত হইল। সুতরাং কার্বন ডাই-অক্সাইডের আণবিক সংকেত লিখিতে হইবে এইভাবে,—C_2O_4 বা CO_2 ;

সোডিয়াম সালফেট (Na_2SO_4): সোডিয়াম ধাতুধর্মী এবং সালফেট মূলক (SO_4) অধাতুধর্মী, তাই সোডিয়ামের প্রতীক চিহ্ন সালফেট মূলকের আগে বসিবে। সোডিয়ামের যোজ্যতা—1, সালফেট মূলকের 2 ; সুতরাং সোডিয়ামের গায়ে লিখিতে হইবে সালফেট মূলকের যোজ্যতার সংখ্যা এবং সালফেট মূলকের গায়ে সোডিয়ামের যোজ্যতার সংখ্যা। যথা : Na_2 এবং $(SO_4)_1$; দুইটি সোডিয়াম পরমাণুর যোজ্যতা—$2 \times 1 = 2$ এবং একটি সালফেট মূলকের যোজ্যতা 2 ; সুতরাং সোডিয়াম সালফেটের আণবিক সংকেত লিখিতে হইবে এইভাবে,—$Na_2(SO_4)_1$ বা Na_2SO_4 ;

অ্যামোনিয়াম কার্বনেট [$(NH_4)_2CO_3$]: অ্যামোনিয়াম মূলক

(NH_4) ধাতুধর্মী এবং কার্বনেট মূলক (CO_3) অধাতুধর্মী। তাই অ্যামোনিয়াম মূলকের প্রতীক চিহ্ন কার্বনেট মূলকের আগে বসিবে। NH_4-এর যোজ্যতা —1; CO_3-এর যোজ্যতা—2; সুতরাং NH_4-এর গায়ে কার্বনেটের যোজ্যতার সংখ্যা এবং কার্বনেটের গায়ে NH_4-এর যোজ্যতার সংখ্যা বসিবে। যথা: $(NH_4)_2$ এবং $(CO_3)_2$; দুইটি NH_4 মূলকের যোজ্যতা— $2\times1=2$ এবং একটি CO_3 মূলকের যোজ্যতা—2; সুতরাং অ্যামোনিয়াম কার্বনেটের আণবিক সংকেত হইবে—$(NH_4)_2(CO_3)_1$ বা NH_4CO_3;

অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড (Al_2O_3): ধাতুধর্মী Al-এর প্রতীক চিহ্ন অধাতুধর্মী O-এর আগে বসিবে। Al-এর যোজ্যতা-3 এবং O-এর যোজ্যতা—2; সুতরাং O-এর যোজ্যতা সংখ্যা Al-এর গায়ে এবং Al-এর যোজ্যতা সংখ্যা O-এর গায়ে বসিবে। যথা: Al_2 এবং O_3; দুই Al-পরমাণুর যোজ্যতা—$2\times3=6$; তিনটি O-পরমাণুর যোজ্যতা—$3\times2=6$; সুতরাং অ্যালুমিনিয়াম অকসাইডের আণবিক সংকেত লেখা হইবে— Al_2O_3;

সংযোগী মৌল বা মূলক	যোজ্যতা	যোজ্যতা লিখন	যোজ্যতার সমতা	আণবিক ফর্মুলা
$Na+Cl$	1, 1	Na_1+Cl_1	1=1	$NaCl$
$Cu+O$	2, 2	Cu_2+O_2	2=2	Cu_2O_2 বা CuO
$Na+OH$	1, 1	$Na_1+(OH)_1$	1=1	$Na_1(OH)_1$ বা $NaOH$
H_2+SO_4	1, 2	$H_2+(SO_4)_1$	2=2	H_2SO_4
$Ca+PO_4$	2, 3	$Ca_3+(PO_4)_2$	6=6	$Ca_3(PO_4)_2$

3-8. রাসায়নিক বিক্রিয়া ও সমীকরণ:

রাসায়নিক বিক্রিয়া (Chemical reaction): কোন একটি যৌগ অণু ভাঙ্গিয়া অথবা বিভিন্নধর্মী যৌগের একাধিক অণু পারস্পরিক বিক্রিয়ার যে পদ্ধতিতে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে এবং তাহার ফলে যে এক বা একাধিক ভিন্নধর্মী যৌগের অণু গঠিত হয় তাহাকে বলা হয় রাসায়নিক বিক্রিয়া বা কেমিকেল রি-অ্যাকশন। এরূপ বিক্রিয়ার উদাহরণ:

$$H_2 + O_2 \xrightarrow{\text{বিস্ফোরণ}} H_2O$$

$$C + O_2 \xrightarrow{\text{দহন}} CO_2$$
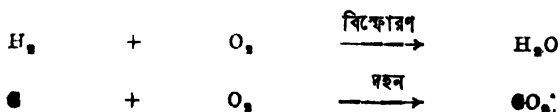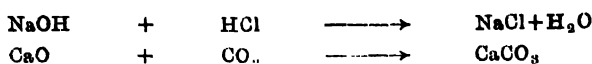
$NaOH$	+	HCl	——→	$NaCl+H_2O$
CaO	+	CO_2	——→	$CaCO_3$
$MgCO_3$			দহণ ——→	$MgO+CO_2$
Na	+	Cl_2	দহণ ——→	$NaCl$ (সোডিয়াম ক্লোরাইড অণু)

রাসায়নিক সমীকরণ (Chemical equation): যে প্রণালীতে রাসায়নিক বিক্রিয়ার চিহ্ন ও সংকেতের সাহায্যে বিকারক ও বিক্রিয়ালব্ধ অণুগুলির মধ্যে সমতা স্থাপনের সাংকেতিক পরিচয় প্রকাশ করা হয় তাহাকে বলা হয় রাসায়নিক সমীকরণ।

যে অণু বা অণুগুলির মধ্যে বিক্রিয়া ঘটে তাহাদের বলা হয় বিকারক অণু এবং বিক্রিয়ার ফলে যে ভিন্নধর্মী এক বা একাধিক অণু গঠিত হয় তাহাকে বলা হয় বিক্রিয়ালব্ধ অণু।

3-9 সমীকরণ লেখার প্রণালী: যে-কোন বিক্রিয়ার সমীকরণ লেখার জন্য (i) প্রথমে বামপাশে বিকারক অণুর ফর্মুলাগুলি পর পর যোগ (+) চিহ্ন দ্বারা যুক্ত করিয়া লিখিতে হয়; (ii) বিক্রিয়ার ফলে গঠিত অণুগুলির ফর্মুলাও অনুরূপভাবে যোগ চিহ্নসহ পর পর ডানপাশে লিখিতে হয়। (iii) বিক্রিয়ার আগে বিভিন্ন অণুর কাঠামোতে বিভিন্ন পরমাণুর যে মোট সংখ্যা থাকে, বিক্রিয়ার পরেও বিভিন্ন অণুতে সেই একই সংখ্যক পরমাণু থাকে। ইহা মনে রাখিয়া বিক্রিয়ার আগের এবং বিক্রিয়ার পরের পরমাণুগুলির সংখ্যার সমতা বিধানের জন্য বিক্রিয়ার আগে অণুগুলির সংখ্যা এবং বিক্রিয়ার পরের অণুগুলির সংখ্যা স্থির করা হয়। (iv) এরূপভাবে অণুর সংখ্যা স্থির করার পরে সমতা চিহ্ন (=) দ্বারা বিক্রিয়ার আগের বিভিন্ন অণুসমূহের মোট পরমাণুর সংখ্যার সঙ্গে বিক্রিয়ার পরের বিভিন্ন অণুগুলির মোট পরমাণু সংখ্যার সাম্য বা সমীকরণ স্থির করা হয়। উদাহরণ:

(i) **জল** (H_2O): হাইড্রোজেনের সঙ্গে অক্সিজেনের বিক্রিয়ার ফলে জল তৈরী হয়, যথা: হাইড্রোজেন + অক্সিজেন → জল;

এরূপ বিক্রিয়ায় কমপক্ষে এক অণু করিয়া হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের প্রয়োজন এবং বিক্রিয়ায় কমপক্ষে এক অণু জল গঠিত হইবে। সুতরাং লেখা যায়: $H_2+O_2 \rightarrow H_2O$;

একটি অক্সিজেন অণুতে পরমাণুর সংখ্যা দুই ; সুতরাং দুইটি অক্সিজেন পরমাণু বিক্রিয়ায় কমপক্ষে দুই অণু জল তৈরী করিবে এবং এরূপ দুই অণু জলে হাইড্রোজেনের পরমাণুর সংখ্যা হইবে চার। সেজন্য সমীকরণ লিখিতে হইবে এইভাবে ;

$$2H_2+O_2=2H_2O$$
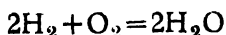
বিক্রিয়ার আগে পরমাণুর সংখ্যা : $H=4$; $O=2$; মোট$=6$

বিক্রিয়ার পরে পরমাণুর সংখ্যা : $H=4$; $O=2$; মোট$=6$

(ii) **হাইড্রোজেন ক্লোরাইড** (HCl) : এক অণু হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গঠন করার জন্য কমপক্ষে এক অণু হাইড্রোজেন ও এক অণু ক্লোরিন প্রয়োজন। সুতরাং লেখা যায় : $H_2+Cl_2 \rightarrow HCl$; কিন্তু এক একটি হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন অণুতে আছে দুইটি করিয়া পরমাণু ; সুতরাং, পরমাণু সংখ্যার সমতা বিধান করিয়া সমীকরণ লেখা যায় : $H_2+Cl_2=2HCl$।

বিক্রিয়ার আগে পরমাণুর সংখ্যা : $H=2$; $Cl=2$; মোট$=4$

বিক্রিয়ার পরে পরমাণুর সংখ্যা : $H=2$; $Cl=2$; মোট$=4$

(iii) **ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড** (MgO) : ম্যাগনেসিয়াম বায়ুতে দগ্ধ করিলে ম্যাগেনেসিয়াম অক্সাইড গঠিত হয়। যথা : $Mg+O_2 \rightarrow MgO$; একটি অক্সিজেন অণুতে আছে দুইটি অক্সিজেন পরমাণু। সুতরাং পরমাণুর সংখ্যা সমতার জন্য সমীকরণ হইবে : $2Mg+O_2=2MgO$

বিক্রিয়ার আগে পরমাণুর সংখ্যা : $Mg=2$; $O=2$; মোট$=4$

বিক্রিয়ার পরে পরমাণুর সংখ্যা : $Mg=2$; $O=2$; মোট$=4$

(iv) **অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড** (Al_2O_3) : অক্সিজেনের সঙ্গে অ্যালুমিনিয়ামের বিক্রিয়ায় অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড গঠিত হয় যথা : $Al+O_2 \rightarrow Al_2O_3$; সুতরাং Al ও O_2-এর পরমাণুর সংখ্যা সমতার —— অণুর সংখ্যা নির্দেশ করিলে—

সমীকরণ হইবে : $4Al+3O_2=2Al_2O_3$

বিক্রিয়ার আগে : $Al=4$; $O=6$; মোট$=10$

বিক্রিয়ার পরে : $Al=4$; $O=6$; মোট$=10$

$Zn+H_2SO_4=ZnSO_4$; $CaCO_3+2HCl=CaCl_2+H_2O+CO_2$

$NH_3+HCl=NH_4Cl$; $NaOH+HCl=NaCl+H_2O$
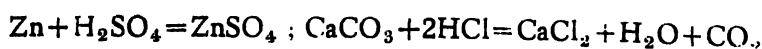
উপরোক্ত ক্রিয়াগুলির সমীকরণ ব্যাখ্যা কর।

3-10. রাসায়নিক সমীকরণের তাৎপর্য : রাসায়নিক বিক্রিয়ার সমীকরণ বিশ্লেষণে জানা যায় ; (i) বিকারক ও বিক্রিয়ালব্ধ অণুগুলির রাসায়নিক পরিচয় ; (ii) বিক্রিয়ার আগের ও পরের অণু-সংখ্যা ; এবং (iii) কত ওজনের বিকারক পরিবর্তনের ফলে কত ওজনের বিভিন্ন পদার্থ উৎপন্ন করে ; এবং (iv) বিকারক ও উৎপন্ন দ্রব্যগুলি গ্যাস হইলে কত আয়তন বিকারক কত আয়তন বিক্রিয়ালব্ধ যৌগ উৎপন্ন করে তাহাও জানা যায়। $2H_2+O_2=2H_2O$; এই বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস বাষ্পাকারে জল তৈরী করে। গ্যাসীয় পদার্থের একটি অণুসৃষ্ট গ্যাসের আয়তন ধরা হয় 1 আয়তন। সুতরাং বলা যায় : 2 আয়তন H_2 এবং 1 আয়তন O_2 উৎপন্ন করে 2 আয়তন জলীয় বাষ্প।

সমীকরণের অসম্পূর্ণতা : সমীকরণ বিশ্লেষণ করিয়া : (i) কি কারণে বিক্রিয়া ঘটে ; (ii) বিক্রিয়ার আগের ও পরের অণুগুলি কঠিন বা তরল অথবা গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে কিনা ; (iii) বিক্রিয়া সম্পূর্ণ করার জন্য কত সময়ের প্রয়োজন ; (iv) বিক্রিয়ার ফলে তাপের উদ্ভব বা শোষণ ঘটে কিনা ; এবং (v) বিক্রিয়ার পরে বিক্রিয়ালব্ধ অণুগুলির মধ্যে আবার কোন বিক্রিয়া ঘটে কিনা,—এই সব তথ্যগুলি জানা সম্ভব হয় না।

সমীকরণ : $HCl+NaOH=NaCl+H_2O$

এই বিক্রিয়ায় সমীকরণটি পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, (i) হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ও সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড (কষ্টিক সোডা) বিকারক এবং সোডিয়াম ক্লোরাইড ও জল বিক্রিয়ায় উৎপন্ন পদার্থ ; (ii) বিকারক এক অণু HCl ও এক অণু NaOH ; বিক্রিয়ালব্ধ যৌগ এক অণু NaCl এবং এক অণু H_2O ; (iii) 36·5 গ্রাম HCl ও 40 গ্রাম NaOH বিক্রিয়ায় 58·5 গ্রাম NaCl এবং 18 গ্রাম জল উৎপন্ন করে ; [এরূপ গণনা দশম শ্রেণীর মৌলের পারমাণবিক ওজনের সংজ্ঞা জানার পর পুনঃ পঠনের সময় বোঝা যাইবে।] (iv) এই বিক্রিয়ায় বিকারকে আছে হাইড্রোজেন পরমাণু 2, অক্সিজেন 1, ক্লোরিন 1 এবং সোডিয়াম 1 ; বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থেও এরূপ একই সংখ্যক বিভিন্ন মৌলের পরমাণু পাওয়া যায়। (v) যেহেতু এই বিক্রিয়ায় বিকারক বা বিক্রিয়ালব্ধ কোন যৌগই গ্যাসীয় নয়, তাই ইহাদের গ্যাসীয় আয়তন নির্ণয়ের প্রশ্ন ওঠে না।

এই সমীকরণের অসম্পূর্ণতা: (i) কি কারণে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড কষ্টিক সোডার সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটায় সমীকরণ দেখিয়া তাহা জানা সম্ভব নয়; (ii) যদিও বিকারক—HCl তরল এবং NaOH-দেখিতে কঠিন এবং বিক্রিয়ায় উৎপন্ন NaCl কঠিন (দ্রবীভূত) এবং H_2O তরল,—কিন্তু বিক্রিয়ার সমীকরণ দেখিয়া এরূপ অবস্থা জানা যায় না; (iii) এই বিক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করার জন্য অর্থাৎ কতক্ষণে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ও সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড বিক্রিয়ার ফলে লবণ ও জল অণুগুলি গঠিত হয় তাহা বলা সম্ভব নয়; (iv) এরূপ বিক্রিয়ায় তাপ সৃষ্টি হয়, কিন্তু বিক্রিয়ার সমীকরণ তাহা নির্দেশ করিতে অক্ষম; এবং (v) বিক্রিয়ালব্ধ লবণ ও জল অণুদ্বয় যে পরস্পরে পুনরায় আর কোন বিক্রিয়া ঘটায় না,—সমীকরণ তাহাও নির্দেশ করিতে পারে না।

প্রশ্নাবলী

1. পরমাণু ও অণুর সংজ্ঞা লেখ।

2. আণবিক ফর্মুলা বলিতে কি বোঝ? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

3. যোজ্যতার সংজ্ঞা লেখ। মৌলের যোজ্যতা অনুযায়ী আণবিক ফর্মুলা রচনার চারিটি উদাহরণ দাও।

4. H, O, N_2, C, Ca, SO_4, OH, NH_4 এবং CO_3—এরূপ মৌল ও মূলকের যোজ্যতা যথাক্রমে—1, 2, 2, 4, 2, 2, 1, 1, 2; এরূপ যোজ্যতার ভিত্তিতে: (i) H+Cl, (ii) Ca+O; (iii) H_2+SO_4; (iv) C+O; (v) Ca+OH, (vi) NH_4+OH; (vii) NH_4+CO_3; ইহাদের আণবিক সংকেত লিখ।

5. রাসায়নিক বিক্রিয়ার সংজ্ঞা লেখ। রাসায়নিক সমীকরণের সংজ্ঞা লিখ। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় যে জল গঠিত হয় সমীকরণ লিখিয়া তাহার তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

6. সমীকরণের তাৎপর্য এবং সম্পূর্ণতা উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা কর।

7. নিম্নলিখিত বিক্রিয়াগুলির সমীকরণ লিখ:

$H_2+O_2 \rightarrow H_2O$; $Mg+O_2 \rightarrow MgO$,

$H_2+Cl_2 \rightarrow HCl$, $C+O \rightarrow CO_2$,

$CaCO_3+HCl \rightarrow CaCl_2+H_2O+CO_2$

8. নিম্নলিখিত সমীকরণ পূর্ণ কর:

$C+2H_2=$......	$N_2+3H_2=$......
$HCl+NaOH=$......	$Zn+2HCl=$......
$Zn+H_2SO_4=$......	$2Ca+2H_2O=$......
$4Al+3O_2=$......	$2Ca+O_2=$......
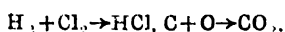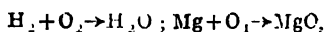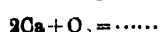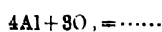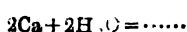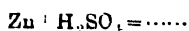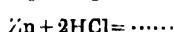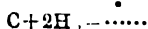
চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইলেকট্রিক সুইচ খুলিয়া দিলে বিদ্যু

করিলেই বাতি নিভিয়া যায়। ইলেকট্রিকের তার তামা অর্থাৎ কপার দ্বারা তৈরী। তাই দেখা যায় যে, তামার তারের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ বা তড়িৎ প্রবাহিত হইতে পারে। কিন্তু তামার তারের পরিবর্তে রবারের বা সিল্কের মোটা সুতা দিয়া বাল্‌ব যুক্ত করিলে সুইচ খুলিলেও বাতি জ্বলিবে না। কারণ, রবার বা সিল্ক তড়িৎ-প্রবাহ পরিবহন করিতে পারে না। সুতরাং একথা বলা যায় যে, তড়িৎ পরিবহনের ক্ষমতা অনুযায়ী পদার্থ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীর পদার্থ তড়িৎ পরিবহনে সক্ষম এবং অপর শ্রেণী এরূপ তড়িৎ পরিবহনে অক্ষম।

4-1. **তড়িৎ-পরিবাহী পদার্থ** (Conductor) : যে সকল পদার্থ তড়িৎ পরিবহনে সক্ষম অর্থাৎ যাহাদের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চলাচল করিতে পারে তাহাদের বলা হয় **তড়িৎ-পরিবাহী পদার্থ** বা **কণ্ডাকটর**।

সকল ধাতু এবং অ্যাসিড ক্ষার ও লবণের জলীয় দ্রবণ তড়িৎ পরিবহনে সক্ষম বলিয়া ইহাদের তড়িৎ পরিবাহী পদার্থ বলা হয়। [যখন এরূপ পদার্থের ভিতর দিয়া তড়িৎ-প্রবাহিত হয় তখন প্রাণী ইহাদের স্পর্শ করিলে তড়িতাহত হয় এবং বেশিক্ষণ সংস্পর্শ ঘটিলে প্রাণীর মৃত্যুও ঘটে।] রূপার তড়িৎ বহনের ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি, তামার স্থান দ্বিতীয়। লোহার চেয়ে তামার তড়িৎ পরিবহনের ক্ষমতা ছয়গুণ বেশি।

4-2. **তড়িৎ-অপরিবাহী পদার্থ** (Non-Conductor) : যে সকল পদার্থ তড়িৎ বা বিদ্যুৎ পরিবহনে অক্ষম, অর্থাৎ যাহাদের ভিতর দিয়া তড়িৎ চলাচল করিতে পারে না, তাহাদের বলা হয় **তড়িৎ-অপরিবাহী পদার্থ** বা **নন-কণ্ডাকটর**।

রবার, কাঠ, গন্ধক, চিনি, সাধারণ অঙ্গার, মোম, পোরসেলিন, সিল্ক ইত্যাদি কঠিন পদার্থ এবং চিনির দ্রবণ, অ্যালকোহল বা তরল গ্লিসারিনও তড়িৎ পরিবহনে অক্ষম বলিয়া ইহারা তড়িৎ-অপরিবাহী পদার্থ।

তামার তার রবার বা সিল্ক দ্বারা মুড়িয়া দিলে, তামার তারের ভিতর দিয়া

তড়িৎ প্রবাহের সময় উহার সঙ্গে প্রত্যক্ষ স্পর্শ ঘটে না বলিয়া ঐ তার স্পর্শ করা যায়। এজন্য রবার বা সিল্ক জাতীয় পদার্থকে বলা হয় **তড়িৎ-অপরিবাহী**। বিদ্যুতের তার মেরামতির সময়ে তাই কাঠের বা রবারের পাদপ ব্যবহার করা হয় অন্তরক বা ইনসুলেটাররূপে (insulator)।

রূপা, তামা, লোহা, গ্রাফাইট জাতীয় অঙ্গারের ভিতর দিয়া তড়িৎ প্রবাহের ফলে ঐ সকল পদার্থের মধ্যে কোন রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে না, শুধু ভৌত পরিবর্তন ঘটে অর্থাৎ তার উত্তপ্ত হয় এবং ইহার মধ্যে তড়িৎ-শক্তি সঞ্চালিত হয়। এরূপ পদার্থকে বলা হয় **ধাতব-পরিবাহক**। কিন্তু লঘু অ্যাসিড, ক্ষারের দ্রবণ, লবণের জলীয় দ্রবণ এবং উচ্চতাপে গলিত (fused) কঠিন ক্ষার বা ধাতব-লবণের ভিতর দিয়া তড়িৎ প্রবাহিত করিলে ঐ সকল যৌগ বা যৌগিক পদার্থ-গুলির মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটার ফলে ইহারা বিশ্লিষ্ট হইয়া যায় অর্থাৎ ঐ যৌগের মধ্যে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু বিশুদ্ধ অ্যাসিডের মধ্যে ঐ ধরণের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে না।

4-3. **তড়িৎ-বিশ্লেষ্য** (Electrolyte) : যে সকল যৌগিক পদার্থ বা যৌগ দ্রবীভূত অথবা গলিত অবস্থায় তড়িৎ পরিবহনে সক্ষম এবং তড়িৎ-প্রবাহের ফলে যাহাদের মধ্যে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে সেরূপ যৌগিক পদার্থগুলিকে তড়িৎ-বিশ্লেষ্য বা ইলেক্‌ট্রোলাইট বলা হয়। জলে দ্রবীভূত বা গলিত অবস্থায় অ্যাসিড, ক্ষার বা লবণ এরূপ তড়িৎ-বিশ্লেষ্য। জল ও সোডিয়াম ক্লোরাইডের তড়িৎ-বিশ্লেষণের উদাহরণ :

অ্যাসিড মিশ্রিত জল(H_2O)→হাইড্রোজেন (H_2)+অক্সিজেন (O_2)

গলিত সোডিয়াম ক্লোরাইড ($NaCl$)→সোডিয়াম (Na)+ক্লোরিন (Cl_2)

তড়িৎ-বিশ্লেষণের আয়নীয় ব্যাখ্যা : বিজ্ঞানী আরহেনিয়াসের তত্ত্ব অনুযায়ী দ্রবীভূত বা গলিত অবস্থায় তড়িৎ-বিশ্লেষ্য যৌগিক পদার্থ দুইটি তড়িৎবাহী খণ্ডে বিয়োজিত (dissociated) হইয়া যায়। এরূপ এক-একটি খণ্ডকে বলা হয় **আয়ন** (ion) বা **বাহক**। এরূপ এক খণ্ড আয়নে পজিটিভ বা ধনাত্মক তড়িৎ উৎপন্ন হয় এবং অপর খণ্ডে উৎপন্ন হয় সমপরিমাণে নেগেটিভ বা ঋণাত্মক তড়িৎ। তড়িৎ-বিশ্লেষ্যের বিয়োজিত অবস্থায় আয়নগুলি সমপরিমাণে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক তড়িৎ বহন করে বলিয়া দ্রবীভূত বা গলিত অবস্থায় তড়িৎ-বিশ্লেষ্যের মধ্যে তড়িৎ ধর্মের কোন বাহ্যিক প্রকাশ পায় না। যে-খণ্ডে পজিটিভ তড়িৎ বহন করে তাহাকে বলা হয় পজিটিভ বা

ধনাত্মক আয়ন বা **ক্যাটায়ন** এবং যে-খণ্ড নেগেটিভ তড়িৎ বহন করে তাহাকে বলা হয় নেগেটিভ বা **ঋণাত্মক আয়ন** বা **অ্যানায়ন**। যে মৌল বা মূলকের যোজন ক্ষমতার (valency) সংখ্যা যত, উহার আয়নে তত ইয়ুনিট তড়িৎ উৎপন্ন হয়। এই আয়নগুলিকে দ্রবণ বা গলিত অবস্থায় যৌগ হইতে বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ স্বতন্ত্রভাবে সংগ্রহ করা যায় না। তাই তড়িৎ বিশ্লেষ্যের বিয়োজনে উৎপন্ন বিপরীতধর্মী আয়ন সমূহের সমতা বিধান করা হয় '$\rightleftharpoons$' এরূপ চিহ্ন দ্বারা। এক যোজী আয়নে এক ইয়ুনিট এবং দুই যোজী আয়নে দুই ইয়ুনিট তড়িৎ উৎপন্ন হয়। তড়িৎ-বিশ্লেষ্যের আয়নরূপে বিয়োজনের পদ্ধতিকে বলা হয় **আয়নীয় বিয়োজন** (ionic dissociation)। তড়িৎ-বিয়োজনের কয়েকটি উদাহরণ :

তড়িৎ-বিশ্লেষ্য		**ক্যাটায়ন**	(+)	**অ্যানায়ন** (–)
HCl	$\rightleftharpoons$	H^+	+	Cl^-
NaCl	$\rightleftharpoons$	Na^+	+	Cl^-
HNO_3	$\rightleftharpoons$	H^+	+	NO_3^-
$CuSO_4$	$\rightleftharpoons$	Cu^{++}	+	SO_4^{--}
NaOH	$\rightleftharpoons$	Na^+	+	OH^-

তড়িৎ-বিশ্লেষ্যের মধ্যে তড়িৎ প্রবাহিত করিলে এই আয়নগুলি তড়িৎ বহনের কাজ করে। প্রবাহিত তড়িতে যে-টি পজিটিভ তড়িৎ-দ্বার সে-দিকে নেগেটিভ আয়ন বা অ্যানায়ন ধাবিত হয় এবং যেটি নেগেটিভ তড়িৎ দ্বার সে-দিকে পজিটিভ আয়ন বা ক্যাটায়ন ধাবিত হয়। পজিটিভ তড়িৎ-দ্বারে নেগেটিভ আয়ন বা অ্যানায়ন বিপরীতধর্মী তড়িৎ বা চার্জ বহনের জন্য পরস্পরকে প্রশমিত করে এবং নেগেটিভ আয়ন পরমাণুতে এবং সঙ্গে সঙ্গে অণুতে পরিণত হয়। [তড়িৎ প্রবাহের প্রবেশ ও নির্গমনের পথকে বলা হয় তড়িৎ-দ্বার] এইভাবে তড়িৎ-বিশ্লেষ্যের রাসায়নিক বিশ্লেষণ ঘটে। যথা : বিশুদ্ধ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl) প্রথমে H^+ এবং Cl^- আয়নে পরিণত হয়। এই বিয়োজিত আয়নের মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহের ফলে H^+ (আয়ন) নেগেটিভ তড়িৎ-দ্বারে এবং Cl^- (আয়ন) পজিটিভ তড়িৎ-দ্বারে প্রশমিত হইয়া H পরমাণু ও Cl পরমাণুতে পরিণত হয় এবং ইহারা সঙ্গে সঙ্গে আণবিক হাইড্রোজেন (H_2) ও ক্লোরিনে (Cl_2) পরিণত হয়।

4-4. **তড়িৎ-বিশ্লেষণ** (Electrolysis) : দ্রবীভূত বা গলিত অবস্থায় তড়িৎ-বিশ্লেষ্যের আয়নীয় বিয়োজনের ফলে যে বিপরীতধর্মী আয়ন গঠিত হয় তাহার মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহ চালাইলে যে পদ্ধতিতে তড়িৎ-দ্বারে আয়নগুলি প্রশমিত হইয়া তড়িৎ-বিশ্লেষ্য যৌগটির রাসায়নিক বিশ্লেষণ ঘটায় তাহাকে বলা হয় তড়িৎ-বিশ্লেষণ।

4-5. **তড়িৎ-বিশ্লেষণ পাত্র বা ভল্টামিটার** (Voltameter) : যে পাত্রে তড়িৎ বিশ্লেষণ করা হয় তাহাকে বলা হয় ভল্টামিটার বা তড়িৎ-বিশ্লেষণ পাত্র। এরূপ একটি পাত্রে রাখা হয় দ্রবীভূত বা গলিত তড়িৎ-বিশ্লেষ্য পদার্থ। এই পাত্রে দুইটি প্লাটিনাম, তামা ইত্যাদি ধাতু বা গ্রাফাইট জাতীয় অঙ্গারের দণ্ড বা পাত ঝুলাইয়া রাখা হয় এবং তড়িৎ-বিশ্লেষণ ক্রিয়া আরম্ভ করার জন্য এই ধাতব দণ্ডদ্বয় একটি ব্যাটারীর নেগেটিভ বা ঋণাত্মক ও পজিটিভ বা ধনাত্মক প্রান্তের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। যে ধাতব দণ্ড ব্যাটারীর ঋণাত্মক বা নেগেটিভ তড়িৎ প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত করা হয় তাহাকে বলা হয় নেগেটিভ বা **ঋণাত্মক তড়িৎ দ্বার বা ক্যাথোড** এবং যে ধাতব দণ্ডটি ব্যাটারীর পজিটিভ বা ধনাত্মক তড়িৎ প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত থাকে তাহাকে বলা হয় পজিটিভ বা **ধনাত্মক তড়িৎ-দ্বার বা অ্যানোড**।

দ্রবীভূত বা গলিত তড়িৎ-বিশ্লেষ্যের মধ্যে তড়িৎ-দ্বার দুইটি ডুবাইয়া যখনই তড়িৎ-দ্বার দুইটি ব্যাটারীর ঋণাত্মক ও ধনাত্মক প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত করা হয় তৎক্ষণাৎ ভল্টামিটারে তড়িৎ-বিশ্লেষণ ক্রিয়া শুরু হইয়া যায়। দ্রবণের বা গলিত পদার্থের বিয়োজিত আয়নগুলি তড়িৎ বহনের কাজ করে। ক্যাটায়ন
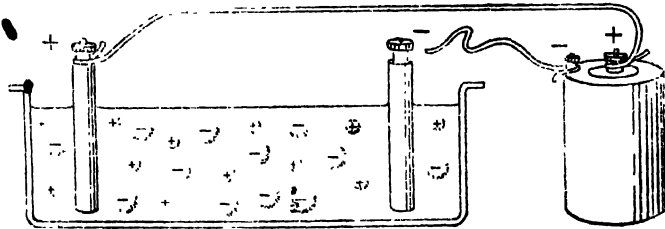
ব্যাটারী সংযোগের পর্বে দ্রবণে পজেটিভ ও নেগেটিভ আয়ন গঠন

বা ধনাত্মক আয়ন ঋণাত্মক তড়িৎ-দ্বার ক্যাথোডের দিকে ধাবিত হয় এবং তড়িৎ-দ্বারে ঋণাত্মক তড়িৎ প্রশমনে ক্যাটায়ন ক্যাথোড তড়িৎ-দ্বারে তড়িৎ-ধর্মহীন পদার্থের অণুরূপে নির্মুক্ত হয়। অনুরূপভাবে অ্যানায়ন বা ঋণাত্মক

আয়ন ধনাত্মক তড়িৎ-দ্বারে বা অ্যানোডের দিকে ধাবিত হয় এবং সেখানে
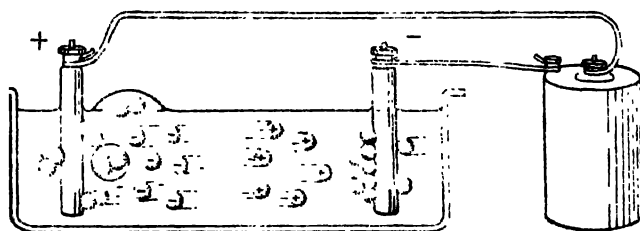
ব্যাটারী সংযোগের পরে তড়িৎ দ্বারের দিকে আয়নের আকর্ষণে তড়িৎ-বিশ্লেষণ প্রণালী

তড়িৎদ্বারের ধনাত্মক তড়িতের সঙ্গে অ্যানায়নের (ঋণাত্মক) তড়িত প্রশমিত হইয়া তড়িৎ নিরপেক্ষ পদার্থের অণুরূপে নির্গত হয়।

4·6. **জলের তড়িৎ বিশ্লেষণ :** জলের তড়িৎ বিশ্লেষণ করা হয় কাচের তৈরী বিশেষ ধরণে নির্মিত ভল্টামিটারে। এরূপ ভল্টামিটারের তলদেশে প্লাটিনাম ধাতুর তৈয়ারী দুইটি ধাতব পাত ফিট করা থাকে। সালফিউরিক অ্যাসিড মিশ্রিত জলে ভল্টামিটারের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ ভরা হয়। একটি প্লাটিনাম পাতের তড়িৎ-দ্বারের উপরে বসান থাকে আয়তন চিহ্ন রেখাঙ্কিত জল-ভরা ও উপুড়-করা অবস্থায় অপেক্ষাকৃত বড় ব্যাসের একটি কাচের নল (graduated tube) অপর তড়িৎ-দ্বারেও অনুরূপভাবে একটি জল ভরা কাচের নল উপুড় করা অবস্থায় বসান থাকে।

ভল্টামিটারে জলের তড়িৎ-বিশ্লেষণ

এইভাবে ভল্টামিটারের প্রাথমিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়া একটি তড়িৎ-দ্বার সংযুক্ত করা হয় ব্যাটারীর নেগেটিভ প্রান্তের সঙ্গে এবং অপর তড়িৎদ্বার পজিটিভ প্রান্তের সঙ্গে। যে তড়িৎ-দ্বার ব্যাটারীর নেগেটিভ প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত করা হয়, তাহা ক্যাথোড বা নেগেটিভ তড়িৎ-দ্বার এবং যে তড়িৎ-দ্বার পজিটিভ প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত করা হয় তাহা অ্যানোড বা পজিটিভ তড়িৎ-দ্বার। ব্যাটারীর দুইটি মুখের সঙ্গে ভল্টামিটারের দুইটি তড়িৎ-দ্বারের সংযোগের সঙ্গে সঙ্গে জলের তড়িৎ-বিশ্লেষণ শুরু হয়। ফলে ক্যাথোড তড়িৎ-দ্বারে হাইড্রোজেন নির্গত হয়, এবং কাচ-নলের জল
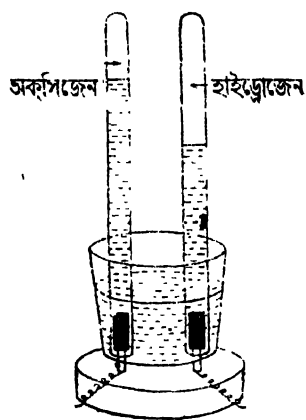
সরাইয়া ইহা নলের মধ্যে সঞ্চিত হয়। অ্যানোডের উপরে স্থাপিত কাচ-নলে অনুরূপভাবে সঞ্চিত হয় অক্সিজেন। হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয় অক্সিজেনের দ্বিগুণ আয়তনে।

জল অণুত্তম তড়িৎ পরিবাহী পদার্থ বলিয়া তড়িৎ-বিশ্লেষণের জন্য জলের সঙ্গে অল্প পরিমাণে সালফিউরিক অ্যাসিড মিশ্রিত করা হয়। ব্যাটারীর সঙ্গে তড়িৎ-দ্বার সংযোগের আগে ভল্টামিটারে জল ও সালফিউরিক অ্যাসিডের তড়িৎ-বিয়োজন ঘটে এই ভাবে :

তড়িৎ-বিশ্লেষণ		ক্যাটায়ন		অ্যানায়ন
H_2O	$\rightleftharpoons$	(H^+)	+	(OH^-)
H_2SO_4	$\rightleftharpoons$	$(H^+)+(H^+)$	+	$(SO_4^{=})$
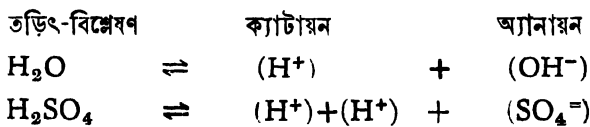
পজিটিভ তড়িৎবাহী হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) ক্যাথোডের নেগেটিভ তড়িতের সংস্পর্শে প্রশমিত হইয়া প্রথমে হাইড্রোজেন পরমাণু (H) এবং পরে দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু $(H+H)$ একটি হাইড্রোজেন অণু (H_2) গঠন করিয়া গ্যাসরূপে নির্গত হইয়া যায়। যথা : (i) $(H^+) \rightarrow H$; (ii) $H+H \rightarrow H_2$, জলীয় দ্রবণে অ্যানায়নরূপে হাইড্রোকসিল আয়ন (OH^-) ও সালফেট আয়ন $(SO_4^{=})$ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও হাইড্রোকসিল আয়নের তড়িৎ-ক্ষরণ ক্ষমতা বেশি বলিয়া ইহা পজিটিভ তড়িৎ-দ্বারের স্পর্শে হাইড্রকসিল মূলকে (OH) পরিণত হয় এবং এরূপ দুইটি মূলক পারস্পরিক সংযোগে প্রথমে একটি অক্সিজেন পরমাণু (O) এবং পরে অক্সিজেন অণু (O_2) গঠন করিয়া গ্যাসরূপে নির্গত হয়। সেই সঙ্গে গঠিত হয় একটি জল অণু। যথা :

$$2OH+2OH=2H_2O+O_2\uparrow$$
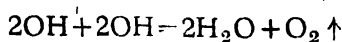
তড়িৎ-বিশ্লেষণের প্রয়োগ : তড়িৎ-বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে (i) সোডিয়াম পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি ধাতু নিষ্কাশন করা হয়। (ii) ক্লোরিন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, কষ্টিক সোডা ইত্যাদি উৎপন্ন করা হয়, (iii) ইলেকট্রোটাইপ তৈরী করা হয়, (iv) রূপা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি ধাতু পরিশোধন করা হয় এবং (v) ইলেকট্রোপ্লেটিং বা ধাতু তড়িৎ-লেপন করা হয়।

4-7. তড়িৎ-লেপন (electroplating) **:** জলবায়ুর প্রকোপ হইতে লোহা, তামা ইত্যাদি ধাতুর পাত, পাত্র ও যন্ত্রপাতি রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ইহাদের উপরে জিংক, টিন, নিকেল, ক্রোমিয়াম, রূপা ইত্যাদি ধাতুর প্রলেপ দেওয়ার

জন্য যে প্রণালীতে তড়িৎ-বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তাহাকে বলা হয় **তড়িৎ-লেপন**। লোহার পাত বা পাত্রের উপরে জিংকের আস্তরণ ফেলিয়া জলবায়ুর প্রকোপ হইতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ইলেকট্রোপ্লেটিং পদ্ধতিতে গ্যালভেনাইজড আয়রণ (galvanised iron) উৎপন্ন করা যায়।

তড়িৎ-লেপনের বা ইলেকট্রোপ্লেটিং-এর জন্য যে ধাতুর পাত্র বা পাতকে তড়িৎ-লেপিত করা হয় তাহাকে ক্যাথোড তড়িৎ-দ্বার, এবং যে ধাতুদ্বারা তড়িৎ লেপন করা হয় তাহাকে অ্যানোড তড়িৎ-দ্বার এবং যে ধাতুদ্বারা তড়িৎ-লেপন করা হয় তাহার দ্রবণীয় বা গলিত লবণকে তড়িৎ-বিশ্লেষ্য বা ইলেকট্রোলাইট-রূপে ব্যবহার করিয়া ভল্টামিটারের মধ্যে তড়িৎ-বিশ্লেষণ করা হয়।

তামা, টিন বা লোহার পাত্রের উপরে রূপার প্রলেপ দেওয়ার জন্য অ্যানোডরূপে রূপার পাত, তড়িৎ-বিশ্লেষ্যরূপে রূপার দ্রবণীয় লবণ সিলভার নাইট্রেট ($AgNO_3$) এবং ক্যাথোডরূপে ব্যবহার করা হয় তামা, টিন বা লোহার পাত্র। তামার বা অন্য কোন ধাতুর তৈরী অলংকার বা পাত্রের উপরে সোনার প্রলেপ দেওয়ার জন্য সোনার পাত অ্যানোডরূপে, তড়িৎ-বিশ্লেষ্যরূপে দ্রবণীয় বা গলিত গোল্ড ক্লোরাইড ($AuCl_3$) এবং ক্যাথোডরূপে তামা বা অন্য ধাতুর তৈরী অলংকার ব্যবহার করা হয়। লোহার পাত্রের উপরে তামার প্রলেপ দেওয়ার জন্য অ্যানোডরূপে তামার পাত, তড়িৎ-বিশ্লেষ্যরূপে তামার দ্রবণীয় লবণ কপার সালফেট ($CuSO_4$) এবং ক্যাথোডরূপে লোহার পাত্র ব্যবহার করা হয়।

প্রশ্নাবলী

1. উদাহরণ সহ তড়িৎ পরিবাহী ও তড়িৎ-অপরিবাহী পদার্থের সংজ্ঞা লেখ।

2. লোহা, জিংক, রবার, লবণ, কাচ, ক্যালসিয়াম-ক্লোরাইড, অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড ইত্যাদির কোনটি,—তড়িৎ-পরিবাহী, তড়িৎ-অপরিবাহী এবং তড়িৎ-বিশ্লেষ্য। তড়িৎ-বিশ্লেষণের সংজ্ঞা লেখ এবং তিনটি উদাহরণ দাও।

৪. কিভাবে তড়িৎ বিশ্লেষণ করা হয়? ভল্টামিটারের বর্ণনা দাও এবং জলের তড়িৎ-বিশ্লেষণ বিবৃত কর।

4. তড়িৎ লেপন কাহাকে বলে? লোহাকে তামা এবং তামাকে রূপা দ্বারা কিভাবে ইলেকট্রোপ্লেটিং করিবে? তড়িৎ-বিশ্লেষণের প্রয়োগ কি তাহা লেখ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অ্যাসিড, ক্ষারক, লবণ এবং প্রশমন

অজৈব যৌগগুলির মধ্যে তিনটি বিশেষ শ্রেণীর যৌগের নাম: (i) অ্যাসিড বা অম্ল (ii) বেস বা ক্ষারক এবং (iii) সল্ট বা লবণ।

5-1. **অ্যাসিড** (Acid): যে যৌগ স্বাদে অম্ল এবং যাহার অণুতে ধাতু বা ধাতুধর্মী মূলক দ্বারা প্রতিস্থাপন-যোগ্য হাইড্রোজেন বর্তমান সেই যৌগকে বলা হয় অ্যাসিড।

হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl), সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4) ও নাইট্রিক অ্যাসিড (HNO_3)—কয়েকটি প্রধান অ্যাসিডের উদাহরণ। কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস জলে দ্রবীভূত করিলে কার্বনিক অ্যাসিড (H_2CO_3) নামে একটি অস্থায়ী মৃদু অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। এই অ্যাসিড জলীয় দ্রবণ হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। সালফিউরেটেড হাইড্রোজেনও (H_2S) একটি মৃদু অ্যাসিড।

অ্যাসিডের ধর্ম: অ্যাসিডের সাধারণ ধর্ম বিশ্লেষণ করিয়া বলা যায় যে

(i) অ্যাসিড মাত্রেই স্বাদে অম্ল।

(ii) অ্যাসিডের অণুতে অবশ্যই হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে এবং এই হাইড্রোজেন পরমাণুকে ধাতু বা ধাতুধর্মী মূলক দ্বারা অপসারিত বা প্রতিস্থাপিত করা যায়। যথা:

$2HCl + Mg = MgCl_2$ (ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড) $+ H_2$

$H_2SO_4 + Zn = ZnSO_4$ (জিংক সালফেট) $+ H_2$
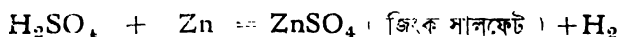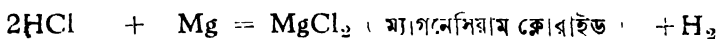
এই বিক্রিয়া দুইটিতে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের হাইড্রোজেন এবং সালফিউরিক অ্যাসিডের হাইড্রোজেন পরমাণু যথাক্রমে ম্যাগনেসিয়াম ও জিংক ধাতুর পরমাণু দ্বারা অপসারিত বা প্রতিস্থাপিত হয়।

(iii) ক্ষার বা অ্যালকালি জাতীয় পদার্থের সঙ্গে অ্যাসিড প্রবল বিক্রিয়া ঘটায় এবং **লবণ ও জল** গঠন করে। যথা:

$HCl + NaOH$ (অ্যালকালি) $= NaCl$ (লবণ) $+ H_2O$ (জল)
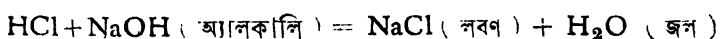
(iv) ধাতুর অক্সাইড বা ক্ষারকের সঙ্গে অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় জল ও লবণ (salt) নামে এক শ্রেণীর যৌগ উৎপন্ন হয়।

$2HCl + CaO = CaCl_2$ (ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড লবণ) $+ H_2O$

$H_2SO_4 + Ca(OH)_2 = CaSO_4$ (ক্যালসিয়াম সালফেট লবণ) $+ 2H_2O$
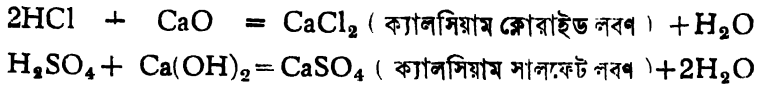
(v) অ্যাসিডের সংস্পর্শে নীল লিটমাস এবং মিথাইল-অরেঞ্জ দ্রবণ লাল হইয়া যায়।

(vi) অ্যাসিডের জলীয় দ্রবণে আয়নীয় বিয়োজনের ফলে পজিটিভ আয়নরূপে হাইড্রোজেন আয়ন থাকে। যথা: $HCl \rightleftharpoons H^+ + Cl^-$

5-2. **ক্ষারক** (Base): যে সমস্ত ধাতুর অক্সাইড বা হাইড্রক্সাইড যৌগ কোন অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়ায় লবণ ও জল গঠন করে তাহাকে বলা হয় ক্ষারক বা বেস। ক্ষারকের উদাহরণ:

কপার অক্সাইড—CuO ; কপার হাইড্রক্সাইড—$Cu(OH)_2$

জিংক অক্সাইড—ZnO ; জিংক হাইড্রক্সাইড—$Zn(OH)_2$

ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড—(MgO); ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রক্সাইড—$Mg(OH)_2$

ক্ষারকের ধর্ম: ক্ষারক জলে দ্রাব্য বা অদ্রাব্য দুই-ই হইতে পারে। কিন্তু সকল ক্ষারকই অ্যাসিডের সহিত বিক্রিয়ায় লবণ ও জল উৎপাদন করে।

ক্ষারক	+	**অ্যাসিড**	→	**লবণ**	+	**জল**
MgO	+	$2HCl$	=	$MgCl_2$	+	H_2O
ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড		হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড		ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড লবণ		জল
ZnO	+	H_2SO_4	=	$ZnSO_4$	+	H_2O
জিংক অক্সাইড		সালফিউরিক অ্যাসিড		জিংক সালফেট লবণ		জল
$NaOH$	+	HCl	=	$NaCl$	+	H_2O
সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড		হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড		সোডিয়াম ক্লোরাইড লবণ		জল

5-3. **ক্ষার বা অ্যালকালি** (Alkali): যে সমস্ত ধাতুর অক্সাইড জলে দ্রবীভূত হইয়া দ্রবণীয় ধাতব হাইড্রক্সাইড গঠন করে এবং অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়ায় লবণ ও জল উৎপন্ন করে সেই সমস্ত দ্রবণীয় ধাতব হাইড্রক্সাইডকে ক্ষার বা অ্যালকালি বলা হয়।

কষ্টিক সোডা (NaOH), **কষ্টিক** পটাশ (KOH) ইত্যাদি ক্ষারের উদাহরণ। ইহারা তীব্র ক্ষার। ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড [$Ca(OH)_2$] এবং অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড (NH_4OH) মৃদু ক্ষার উদাহরণ।

ধাতুর অক্সাইড ও হাইড্রক্সাইড,—উভয়েই ক্ষারক। কিন্তু যে ক্ষারক জলে দ্রবণীয় তাহাই ক্ষার বা অ্যালকালি। সেইহেতু বলা যাইতে পারে,— **সব ক্ষার বা অ্যালকালিই ক্ষারক কিন্তু সব ক্ষারক অ্যালকালি** নয়। শক্তির বিচারে ক্ষার তীব্র ও মৃদু হইতে পারে।

ক্ষারের ধর্ম ঃ (i) ক্ষার হাইড্রক্সাইড জাতীয় যৌগিক পদার্থ, (ii) ক্ষার জলে দ্রবণীয়, (iii) ক্ষারের জলীয় দ্রবণ স্পর্শে সাবানের মত পিচ্ছিল, (iv) ক্ষারের জলীয় দ্রবণে লাল লিটমাস কাগজ ডুবাইলে নীল হইয়া যায়, এবং ক্ষার মিথাইল অরেঞ্জ দ্রবণকে হলুদ বর্ণে পরিণত করে। (v) ক্ষার অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটাইয়া অ্যাসিডকে নিষ্ক্রিয় করিয়া দেয় এবং লবণ ও জল তৈরী করে, এবং (vi) ক্ষারের জলীয় দ্রবণে হাইড্রকসিল আয়ন (OH^-) থাকে।

$$NaOH \rightleftharpoons Na^+ + OH^- \; ; \; Ca(OH)_2 \rightleftharpoons Ca^{++} + 2(OH^-)$$

5-4. **লবণ বা সল্ট** (Salt) ঃ ধাতু, ক্ষারক বা ক্ষার অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়ায় অ্যাসিড অণুর হাইড্রোজেন সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে প্রতিস্থাপিত করিয়া হাইড্রোজেন বা জল অণু ছাড়া অন্য যে যৌগ গঠন করে তাহাকে বলা হয় লবণ (Salt)।

$Zn + 2HCl = H_2 + ZnCl_2$ (লবণ—জিংক ক্লোরাইড)

$MgO + H_2SO_4 = H_2O + MgSO_4$ (লবণ—ম্যাগনেসিয়াম সালফেট)

লবণের নামকরণ ও শ্রেণীভাগ

ধাতু, ক্ষারক বা ক্ষারের সঙ্গে অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় যে লবণ গঠিত হয় সেই লবণ, ধাতু ও অ্যাসিড মূলকের সংযুক্ত নামে পরিচিত হয় এবং অ্যাসিড মূলকের নাম অনুসারে লবণের শ্রেণীভাগ করা হয়। যথা ঃ

ধাতু	অ্যাসিড	লবণের শ্রেণী	লবণের নাম
Na	HCl	ক্লোরাইড (Cl^-) লবণ	NaCl (সোডিয়াম ক্লোরাইড)
K	HNO_3	নাইট্রেট (NO_3^-) লবণ	KNO_3 (পটাসিয়াম নাইট্রেট)
Zn	H_2SO_4	সালফেট ($SO_4^=$) লবণ	$ZnSO_4$ (জিংক সালফেট)
CaO	H_2CO_3	কার্বনেট ($CO_3^=$) লবণ	$CaCO_3$ (ক্যালসিয়াম কার্বনেট)

শমিত লবণ (Normal salt) : ধাতু, ক্ষারক বা ধাতব মূলক দ্বারা অ্যাসিডের হাইড্রোজেন সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হইলে যে লবণ গঠিত হয় তাহাকে বলা হয় শমিত লবণ। যথা :

$2Na+2HCl = 2NaCl + H_2$; $Zn+H_2SO_4=ZnSO_4+H_2$
$HCl+NH_4OH= NH_4Cl + H_2O$; এরূপ ক্ষেত্রে সোডিয়াম ক্লোরাইড ($NaCl$), জিংক সালফেট ($ZnSO_4$), এবং অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড (NH_4Cl) শমিত লবণ গঠনের উদাহরণ।

অ্যাসিড লবণ (Acid Salt) : যে অ্যাসিডে একাধিক হাইড্রোজেন পরমাণু বর্তমান সেরূপ অ্যাসিডের হাইড্রোজেন ধাতু দ্বারা আংশিকভাবে অপসারিত হইলে যে লবণ গঠিত হয় তাহাকে বলা হয় অ্যাসিড লবণ (Bi-salt) ; যথা :

$NaCl+H_2SO_4=NaHSO_4+HCl$; $NaHSO_4$ এই যৌগকে বলা হয় সোডিয়াম বাই-সালফেট।

$CaCl_2+2H_2CO_3=Ca(HCO_3)_2+2HCl$; $Ca(HCO_3)_2$ ইহাকে বলা হয় ক্যালসিয়াম বাই-কার্বনেট। $NaHCO_3$ অর্থাৎ সোডিয়াম বাই-কার্বনেটও একটি বাই-লবণ।

ক্ষারকীয় লবণ (Basic salt) : অ্যাসিড ও ক্ষারকের বিক্রিয়ায় অতিরিক্ত ক্ষারক ব্যবহারের ফলে লবণে যদি অতিরিক্ত ক্ষারক মূলক বর্তমান থাকে তবে সেই লবণকে ক্ষারকীয় লবণ বা বেসিক সল্ট বলা হয়।

$Pb(OH)_2 + HCl = Pb(OH)Cl + H_2O$
লেড হাইড্রোকসাইড ক্ষারক লেড ক্ষারকীয় লবণ

$CuCO_3\ Cu(OH)_2$ (বেসিক কপার কার্বনেট) আরেকটি ক্ষারকীয় লবণের উদাহরণ।

5-5. **প্রশমন** (Neutralisation) : যে প্রক্রিয়ায় অ্যাসিড ও ক্ষারের পারস্পরিক বিক্রিয়া সম্পূর্ণ হইবার ফলে অ্যাসিড বা ক্ষারের ধর্ম সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া লবণ ও জল উৎপন্ন হয় সেইরূপ ক্ষার ও অ্যাসিডের বিক্রিয়াকে বলা হয় প্রশমন-ক্রিয়া। যথা :

$NaOH$ (ক্ষার) $+ HCl$ (অ্যাসিড) $= NaCl$ (লবণ) $+ H_2O$ (জল)
$2KOH$ (ক্ষার) $+ H_2SO_4$ (অ্যাসিড) $= K_2SO_4$ (লবণ) $+ 2H_2O$ (জল)

রসায়নাগারে টাইট্রেশন (titration) পদ্ধতিতে অ্যাসিড দ্বারা ক্ষারের এবং

ক্ষার দ্বারা অ্যাসিডের প্রশমন নির্ণয় করা যায়। এক প্রকার জৈব যৌগের বর্ণ অ্যাসিডে এবং ক্ষারে বিভিন্ন হয়। টাইট্রেশনের সময় অ্যাসিড ও ক্ষারে এই যৌগ আপন বর্ণ পরিবর্তন করিয়া প্রশমন ক্রিয়ার সম্পূর্ণতা নির্দেশ করে। ইহাকে বলা হয় **নির্দেশক** (**indicator**), লিটমাস (**litmus**) দ্রবণ এরূপ একটি নির্দেশক। মিথাইল অরেঞ্জ অপর একটি নির্দেশক এবং ইহাদের বর্ণ পরিবর্তিত হয় নিম্নলিখিত ভাবে :

নির্দেশকের স্বাভাবিক (বর্ণ)	অ্যাসিড দ্রবণের সংস্পর্শে (বর্ণ)	ক্ষার দ্রবণের সংস্পর্শে (বর্ণ)	প্রশমিত দ্রবণের সংস্পর্শে (বর্ণ)
1. লিটমাস (বেগুনী)	লাল		বেগুনী
2. মিথাইল অরেঞ্জ (কমলা)	লাল বা লালাভ (Pink)		

প্রশমন ক্রিয়ার পরীক্ষা : একটি বীকারে অল্প পরিমাণে কষ্টিক সোডার দ্রবণ (ক্ষার) লও। এই দ্রবণে কয়েক ফোঁটা লিটমাস দ্রবণ মিশাও। কষ্টিক সোডার দ্রবণের বর্ণ হইবে নীল। একটি ব্যুরেটের মধ্যে লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বা সালফিউরিক অ্যাসিড ঢালিয়া ব্যুরেটটি অ্যাসিড দ্বারা পূর্ণ কর। ব্যুরেটের মুখ খুলিয়া ফোঁটা ফোঁটা আকারে ব্যুরেট হইতে বীকারের ক্ষার দ্রবণে অ্যাসিড ঢাল এবং একটি কাচের শলা দ্বারা বীকারের ক্ষার দ্রবণের সহিত অ্যাসিড মিশ্রিত কর। এইরূপে অ্যাসিড ক্ষারের সহিত মিশ্রিত হইতে হইতে একসময় দেখিবে এক ফোঁটা অ্যাসিডেই দ্রবণের নীল রং বেগুনী হইয়া গেল। অর্থাৎ অ্যাসিড ও ক্ষারের প্রশমন ঠিক সম্পন্ন হইয়া বীকারে শুধু লবণ ও জল রহিল।
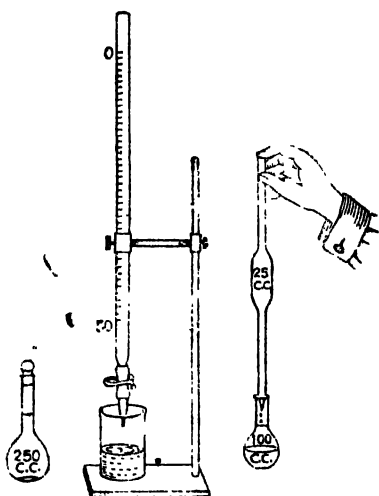
ক্ষার প্রশমনের পর

এখন বীকারের দ্রবণে এক ফোঁটা অতিরিক্ত অ্যাসিড ঢালিলে বীকারের তরলের বর্ণ লাল হইবে। কারণ, বীকারের দ্রবণে এক ফোঁটা অ্যাসিড বা H^+ অতিরিক্ত হইল। আবার

বীকারের দ্রবণে দু'তিন ফোঁটা ক্ষার দ্রবণ মিশ্রিত করিলে দ্রবণের বর্ণ নীল হইবে; কারণ, অতিরিক্ত অ্যাসিডের ফোঁটা প্রশমিত করিয়া দু'এক ফোঁটা ক্ষার বা OH^- দ্রবণের মধ্যে অতিরিক্ত হইল।

বস্তুতপক্ষে এই প্রশমন ক্রিয়া অ্যাসিডের H^+ ও ক্ষারের OH^- এর পারস্পরিক বিক্রিয়া মাত্র। কষ্টিক সোডা দ্রবণে Na^+ ও OH^- আছে। এখন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড অথবা H^+ ও Cl^- দিলে H^+ ও OH^- বিক্রিয়া করিয়া জল উৎপন্ন করিল। ইহাই প্রশমন ক্রিয়া। সোডিয়াম ক্লোরাইড লবণ Na^+ ও Cl^- হিসাবে দ্রবণে রহিয়া গেল।

প্রশ্নাবলী

1. অ্যাসিড, ক্ষারক ও লবণের সংজ্ঞা লেখ এবং উহাদের উদাহরণ দাও।

2. ক্ষার মাত্রেই ক্ষারক কিন্তু সকল ক্ষারক মাত্রই ক্ষার নহে—উদাহরণসহ ইহার তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

3. প্রশমন ক্রিয়ার সংজ্ঞা লেখ। নির্দেশক কাহাকে বলে? উদাহরণ দাও।

4. কষ্টিক সোডা, পটাসিয়াম নাইট্রেট, কার্বন ডাই-অক্সাইড, সোডিয়াম কার্বনেট, হাইড্রোজেন, সোডিয়াম সালফেট, লঘু-সালফিউরিক অ্যাসিড, অ্যামোনিয়া, সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড—ইত্যাদির দ্রবণে অ্যাসিড, ক্ষার অথবা লবণের লক্ষণ কি প্রকারে প্রকাশ পায় তাহা নির্দেশ কর।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

জারণ ও বিজারণ

লোহায় মরিচা পড়ার ফলে ধাতব লোহা লোহার অক্সাইডে পরিণত হয়। রাসায়নিক বিক্রিয়ার ভাষায় এরূপ রাসায়নিক পরিবর্তনকে বলা হয় জারণ ক্রিয়া। লোহার অক্সাইড আকরিক (ore) অঙ্গারের সঙ্গে উত্তপ্ত করিয়া এবং ইহার অক্সিজেন অপসারিত করিয়া লোহা প্রস্তুত করা হয়। ইহা লোহার যৌগের বিজারণের একটি উদাহরণ।

সাধারণভাবে বলা যায় যে **জারণের অর্থ অক্সিজেন সংযোজন অথবা হাইড্রোজেন অপসারণ**। বিজারণ ক্রিয়া জারণের বিপরীতধর্মী। তাই, **বিজারণের অর্থ অক্সিজেন অপসারণ অথবা হাইড্রোজেন সংযোজন**।

ব্যাপক অর্থে জারণ ও বিজারণের সংজ্ঞা নিম্নরূপ :

6-1. জারণ : (Oxidation) : যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কোন মৌল বা যৌগের সঙ্গে (i) অক্সিজেনের এবং (ii) অক্সিজেনের ন্যায় ঋণাত্মক বা নেগেটিভধর্মী অধাতুজাতীয় ক্লোরিন, ব্রোমিন ইত্যাদি মৌল বা মূলকের সংযোজন ঘটে, অথবা (iii) কোন যৌগ হইতে হাইড্রোজেন এবং (iv) হাইড্রোজেনের ন্যায় ধনাত্মক বা পজিটিভধর্মী সোডিয়াম, পটাসিয়াম ইত্যাদি ধাতুজাতীয় মৌল বা মূলক অপসারিত হয় সেইরূপ বিক্রিয়াকে বলা হয় জারণ। উদাহরণ :

(i) কোন মৌল বা যৌগের সঙ্গে অক্সিজেনের সংযোজন। যথা :

$Cu+O=CuO$; $C+O_2=CO_2$; $S+O_2=SO_2$

$2SO_2+O_2=2SO_3$;
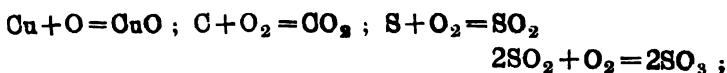
(ii) কোন্ মৌল বা যৌগের সঙ্গে অধাতু জাতীয় ঋণাত্মক বা নেগেটিভ-ধর্মী মৌলের বা মূলকের সংযোজন। যথা :

$2Na+Cl_2=2NaCl$; $2FeCl_2+Cl_2=2FeCl_3$ (ফেরিক ক্লোরাইড) ;

$Zn+H_2SO_4=ZnSO_4+H_2$ [জিংকের সঙ্গে সালফেট মূলকের (SO_4) সংযোজন।]
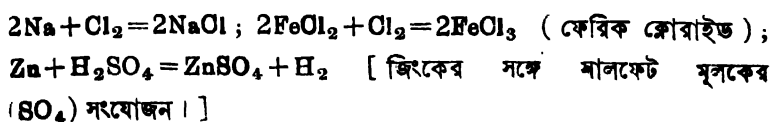
(iii) হাইড্রোজেন বা পজিটিভধর্মী ধাতুর অপসারণ। যথা :

$4HCl + MnO_2 = Cl_2 + MnCl_2 + 2H_2O$;
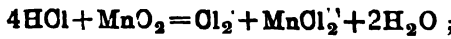
এরূপ বিক্রিয়ায় HCl জারিত হইয়া ক্লোরিন (Cl_2) উৎপন্ন করে।

6-2. **বিজারণ** (Reduction) : যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কোন মৌল বা যৌগের সঙ্গে (i) হাইড্রোজেন এবং (ii) হাইড্রোজেনের ন্যায় ধনাত্মক তথা পজিটিভধর্মী সোডিয়াম, পটাসিয়াম ইত্যাদি ধাতুজাতীয় মৌল বা মূলক সংযুক্ত হয় অথবা (iii) অক্সিজেন বা (iv) অক্সিজেনের ন্যায় ঋণাত্মক তথা নেগেটিভধর্মী অধাতু বা মূলক কোন যৌগ হইতে অপসারিত হয় সেইরূপ বিক্রিয়াকে বলা হয় বিজারণ। উদাহরণ :

(i) হাইড্রোজেন সংযোজন : যথা : $Cl_2 + H_2 = 2HCl$;

$Ca + H_2 = CaH_2$ (ক্যালসিয়াম হাইড্রাইড) ;

$N_2 + 3H_2 = 2NH_3$ (অ্যামোনিয়া)।
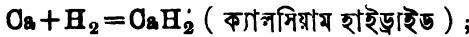
(ii) ধাতুজাতীয় পদার্থের সংযোজন : যথা : $Cl_2 + 2Na = 2NaCl$

(iii) অক্সিজেনের অপসারণ : যথা : $CuO + H_2 = Cu + H_2O$

(iv) অধাতুজাতীয় মৌলের অপসারণ : যথা :

$AlCl_3 + 3Na = Al + 3NaCl$;

অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড ($AlCl_3$) হইতে অধাতু ক্লোরিনের (Cl) অপসারণ।

জারণ ও বিজারণের যুগপৎ ক্রিয়া : জারণ ও বিজারণ বিক্রিয়াগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে জারণ ও বিজারণ ক্রিয়া ঘটে একই সঙ্গে অর্থাৎ যুগপৎ-ভাবে। ইহার অর্থ,—জারণ বা বিজারণ বিক্রিয়ায় যে পদার্থ জারিত হয় তাহা আবার একই সঙ্গে অন্য পদার্থকে বিজারিত করে। উদাহরণ :

(i) $2H_2 + O_2 = 2H_2O$; জল গঠনের এরূপ বিক্রিয়ায় অক্সিজেন হাইড্রোজেনকে জারিত করে, পক্ষান্তরে অক্সিজেন হাইড্রোজেন দ্বারা বিজারিত হয়।

(ii) $CuO + H_2 = Cu + H_2O$, এরূপ বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন কপার অক্সাইডকে বিজারিত করিয়া কপার গঠন করে কিন্তু হাইড্রোজেন অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হইয়া জারিত হয়।

জারক দ্রব্য (Oxidising Agent) : যে সকল পদার্থ বা দ্রব্য অন্য পদার্থকে অক্সিজেন বা অ-ধাতু সরবরাহ করে অথবা অন্য পদার্থ হইতে

হাইড্রোজেন বা ধাতু অপসারিত করে তাহাকে বলা হয় **জারক দ্রব্য** বা **জারক পদার্থ**। উদাহরণ : অক্সিজেন (O_2), হাইড্রোজেন পারক্সাইড (H_2O_2), নাইট্রিক অ্যাসিড (HNO_3), পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেট ($KMnO_4$) ইত্যাদি।

বিজারক দ্রব্য (Reducing Agent) : যে দ্রব্য অন্য কোন পদার্থকে হাইড্রোজেন বা ধাতু সরবরাহ করে অথবা অন্য পদার্থ হইতে **অক্সিজেন বা** অ-ধাতু অপসারণ করে তাহাকে বলা হয় **বিজারক দ্রব্য** বা **বিজারক পদার্থ**। উদাহরণ : হাইড্রোজেন (H_2), সোডিয়াম (Na), কার্বন (C), কার্বন মনক্সাইড (CO), সালফার ডাই-অক্সাইড (SO_2), হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S) ইত্যাদি।

প্রশ্নাবলী

1. উদাহরণসহ জারণ ও বিজারণের সংজ্ঞা সাধারণ ও ব্যাপক অর্থে লেখ।
2. $H_2S + Cl_2 = 2HCl + S$; $2Na + Cl_2 = 2NaCl$.

   $C + O_2 = CO_2$, $CuO + CO = Cu + CO_2$:

এই বিক্রিয়ায় জারক ও বিজারক দ্রব্য নির্দিষ্ট কর এবং দুইটি বিক্রিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখাও যে জারণ ও বিজারণ ক্রিয়া যুগপৎ ঘটে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

তরল বায়ু এবং কার্বন ও নাইট্রোজেন চক্র এবং বায়ুস্থ দুষ্প্রাপ্য গ্যাস

বায়ুর অস্তিত্বের জন্যই পৃথিবীর প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনধারণ সম্ভব হইতেছে। বায়ুর অভাবে পৃথিবী জনপ্রাণীহীন মরুভূমিতে পরিণত হইত। চন্দ্রে বায়ু নাই বলিয়া এই উপগ্রহটি প্রাণী ও উদ্ভিদহীন জড়পদার্থের গোলক পিণ্ডমাত্র।

বায়ুর উপাদান			শতাংশিক আয়তন
1. অক্সিজেন (O_2) : মৌল	...	...	20·60
2. নাইট্রোজেন (N_2) : মৌল	...	...	77·16
3. কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) : যৌগ		...	0·03
4. দুষ্প্রাপ্য গ্যাস : হিলিয়াম, নিয়ন, আরগন, ক্রিপটন ও জিনন			0·80

5. জলীয় বাষ্প : বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ নির্দিষ্ট নহে, পৃথিবীর জলভাগে ও স্থলভাগে বিভিন্ন স্থানে উহার প্রভূত তারতম্য ঘটে।

7-1. **তরল বায়ু** (Liquid air): জলীয় বাষ্প শীতল হইয়া তরল আকারে জলে পরিণত হয়। সেইরূপ বায়ুকে অতিমাত্রায় শীতল করিলে গ্যাসীয় বায়ুকে তরল অবস্থায় পরিণত করা যায়। কিন্তু বায়ুকে তরল করা খুব কষ্টসাধ্য; কারণ বায়ুকে তরল করার জন্য ইহাকে বরফের শীতলতার (0°C) চাইতেও প্রায় দুইশতগুণ বেশী শীতল করা প্রয়োজন।

আবদ্ধ পাত্রে-ভরা বায়ুর উপরে চাপ দিলে বায়ুর আয়তন হ্রাস পায়। বায়ুর উপরে চাপ দ্বিগুণ করিলে আয়তন অর্ধেক পরিমাণে হ্রাস পায়। এইভাবে বায়ুর উপর প্রবল চাপ দিয়া বায়ুর আয়তন বিশেষভাবে হ্রাস করিয়া বায়ুর ঘনত্ব বৃদ্ধি করা হয়। এই চাপ-ঘন বায়ুকে সরু রন্ধ্র পথ দিয়া হঠাৎ চাপ-মুক্ত করিলে,—আকস্মিকভাবে বায়ুর অণুগুলি দ্রুত গতিতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। তাহার ফলে বায়ুর তাপমাত্রা হ্রাস পায়। এই শীতল বায়ুকে আরও প্রবল চাপ দিয়া ঘন করিয়া পুনরায় রন্ধ্রপথে আকস্মিক চাপ-মুক্ত করিয়া অপর একটি বায়ু-শূন্য পাত্রের মধ্যে প্রবল বেগে ছড়াইয়া পড়িতে দেওয়া হয়। দ্বিতীয়

বারে চাপ-মুক্ত বায়ুর তাপমাত্রা আরও হ্রাস পায়। এই ভাবে বায়ুকে চাপ-ঘন ও চাপ-মুক্ত করার পদ্ধতি বারংবার প্রয়োগ করিবার ফলে ঘন বায়ুর উষ্ণতা যখন −200°C তাপমাত্রায় নামিয়া যায় তখন অতি শীতল বায়ু তরল আকার লাভ করে এবং এই তরল বায়ু থার্মোফ্লাস্কের ন্যায় কঠিন ধাতু নির্মিত শীতল পাত্রের মধ্যে ভর্তি করিয়া রাখা হয়।

গ্যাসীয় অক্সিজেন −183°C তাপমাত্রায় এবং নাইট্রোজেন −195°C তাপমাত্রায় ঘনীভূত হইয়া তরলাকার লাভ করে। সুতরাং বায়ুকে তরল করার সময়ে প্রথমে অক্সিজেন এবং পরে নাইট্রোজেন তরল অবস্থায় পরিণত হয়। সেজন্য স্বাভাবিক বায়ুর মধ্যে অক্সিজেনের অনুপাত ওজন হিসাবে 23 শতাংশ হইলেও, তরল বায়ুর মধ্যে অক্সিজেন পাওয়া যায় প্রায় 50 শতাংশ। তরল বায়ু মুমূর্ষু রোগীর শ্বাস প্রশ্বাসের সুবিধার জন্য এবং অন্য পদার্থকে শীতল করার জন্যও ব্যবহৃত হয়।

কার্বন-চক্র (Carbon cycle) : বায়ুর মধ্যে আয়তন হিসাবে পাওয়া

কার্বন চক্র

যায় প্রায় 21 শতাংশ অক্সিজেন এবং 0·03 শতাংশ কার্বন ডাই-অক্সাইড; উদ্ভিদের দেহের মূল উপাদান কার্বন। উদ্ভিদ এই উপাদান আহরণ করে বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইড হইতে। সমুদ্র জল এবং খনিজ পদার্থও সর্বদা বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে। পক্ষান্তরে প্রাণীর নিঃশ্বাস, জৈব

পদার্থের দহন ও পচনের ফলে বায়ু আবার এই হৃত কার্বন ডাই-অক্সাইড পুনঃলাভ করে। কার্বন ডাই-অক্সাইডের এরূপ আদান প্রদানের ফলে বায়ুর মধ্যে ইহার মোট পরিমাণ অক্ষুণ্ণ থাকে। যে প্রণালীতে বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ সমভাবে হ্রাস-বৃদ্ধি হয় এবং ইহার মোট পরিমাণ অক্ষুণ্ণ বা সংরক্ষিত থাকে, তাহাকে বলা হয় কার্বন-চক্র।

কার্বন ডাই-অক্সাইড আহরণ বা শোষণ-এর পদ্ধতি: (ক) দিনের বেলায় প্রায় সকল উদ্ভিদই বায়ু হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও মাটি হইতে জল আহরণ করে। উদ্ভিদের পাতায় সবুজ পদার্থ ক্লোরোফিলের মাধ্যমে সূর্যালোক হইতে প্রাপ্ত আলোক শক্তি এই কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলের একটি জটিল রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায়। এই বিক্রিয়ার ফলেই শক্তিবাহী যৌগ কার্বোহাইড্রেটের উৎপত্তি।

$$6CO_2 + 12H_2O \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{আলোকশক্তি}} \underset{\text{কার্বোহাইড্রেড}}{C_6H_{12}O_6} + 6H_2O + 6O_2$$
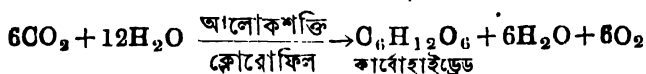
এই পদ্ধতিকে বলা হয় **আলোক-সংশ্লেষ** বা **ফটোসিনথেসিস**।

(খ) সমুদ্র জলে সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ধাতুর লবণ দ্রবীভূত থাকে। এরূপ লবণাক্ত জল বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করিয়া ধাতুর বাই-কার্বনেট যৌগ গঠন করে। [সাধারণ জলও অল্প পরিমাণে কার্বন ডাই-অক্সাইড দ্রবীভূত করে। ঝিনুক, শঙ্খ প্রভৃতি তৈরী হয় জলে দ্রবীভূত বাই-কার্বনেট যৌগ হইতে।]

(গ) ধাতুর অক্সাইড, হাইড্রক্সাইড জাতীয় খনিজ পদার্থ সর্বদা বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করিয়া ধাতুর কার্বনেট যৌগ (চুনা পাথর; চক ইত্যাদি) গঠন করে।

প্রধানত এই তিন কারণে বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ হ্রাস পায়।

কার্বন ডাই-অক্সাইড অর্জন বা উৎপাদন: (ক) প্রাণী সর্বদা নিঃশ্বাসের সঙ্গে কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে। শ্বাসরূপে প্রাণী 21 শতাংশ অক্সিজেন এবং 0·03 শতাংশ কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে। কিন্তু নিঃশ্বাসরূপে বর্জন করে 15 শতাংশ অক্সিজেন এবং 5 শতাংশ কার্বন ডাই-অক্সাইড।

(খ) উদ্ভিদ দিনের বেলায় কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে এবং

অক্সিজেন বর্জন করে। কিন্তু রাত্রিবেলা প্রাণীর ন্যায় কার্বন ডাই-অক্সাইড বর্জন করে। [এজন্য রাত্রিবেলা গাছের তলায় বা গাছের সন্নিধ্যে নিদ্রা যাওয়া অনুচিত।]

(গ) বায়ুমণ্ডলের চাপ হ্রাস পাইলে সমুদ্রজলে দ্রবীভূত কার্বন ডাই-অক্সাইডের কিছু অংশ আবার বায়ুতে ফিরিয়া আসে। সমুদ্র জলে দ্রবীভূত ক্যালসিয়াম কার্বনেট হইতে ঝিনুক, শঙ্খ ইত্যাদির খোলের (shell) প্রস্তুতির সময়ও কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত হয়।

(ঘ) জীবদেহ, বিশেষ করিয়া প্রাণীদেহ মলমূত্র ইত্যাদি যেসব বর্জনীয় পদার্থ (waste products) ত্যাগ করে তাহা প্রধানত কার্বন যৌগ। এই পদার্থ ব্যাকটিরিয়া দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ও তখন এই কার্বন কার্বন-ডাই-অক্সাইডরূপে নির্গত হয়। মৃত জীবদেহ ব্যাকটিরিয়ার সাহায্যে পচনের কালেও শরীরের অন্তর্বর্তী সকল কার্বন যৌগ কার্বন ডাই-অক্সাইডরূপে বায়ুর সহিত মিশিয়া যায়।

(ঙ) কাঠ, কয়লা, তেল প্রভৃতি জ্বালানী জৈব পদার্থ হইতে সৃষ্ট। এইগুলি দহনকালে কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়।

বায়ু মূলত এরূপ পাঁচ উপায়ে উৎপন্ন বা প্রাপ্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড অর্জন করে।

নাইট্রোজেন চক্র (Nitrogen Cycle): নাইট্রোজেন জীবদেহের একটি অপরিহার্য উপাদান। কিন্তু মৌল নাইট্রোজেন রাসায়নিক প্রকৃতিতে নিষ্ক্রিয় বলিয়া বায়ুতে প্রায় 78 শতাংশ নাইট্রোজেন থাকা সত্ত্বেও উদ্ভিদ বা প্রাণী প্রত্যক্ষভাবে বায়ুর নাইট্রোজেন আহরণ করিতে পারে না। উদ্ভিদ প্রধানত: নাইট্রোজেন আহরণ করে মাটিতে মিশ্রিত সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম ইত্যাদির নাইট্রেট লবণ হইতে। উদ্ভিদ এরূপ নাইট্রেট লবণ আহরণ করিয়া নিজের দেহে **অ্যামিনো অ্যাসিড তথা প্রোটিন** নামের জৈব যৌগ তৈরী করে। প্রাণী এরূপ উদ্ভিদ-দেহজাত প্রোটিন খাদ্যরূপে গ্রহণ করিয়া প্রাণীজ প্রোটিন তৈরী করে। মাটিতে অবস্থিত অনেক ব্যাকটেরিয়াও মাটির নাইট্রেট লবণ ভাঙ্গিয়া দেয়। তাহার ফলে মুক্ত নাইট্রোজেন সৃষ্টি হয় এবং ইহা বায়ুর সঙ্গে মিশিয়া যায়। উদ্ভিদ কর্তৃক নাইট্রেট লবণ আহরণ এবং ব্যাকটেরিয়া কর্তৃক নাইট্রেট লবণ ভাঙ্গিয়া মুক্ত-নাইট্রোজেন সৃষ্টি, মূলত এরূপ দুই প্রকার প্রক্রিয়ায় মাটিতে মিশ্রিত নাইট্রেট লবণের পরিমাণ সর্বদা হ্রাস পায়।

পক্ষান্তরে, বায়ুমণ্ডলে বিদ্যুৎ-ক্ষরণের ফলে বিভিন্ন বিক্রিয়ার পরিণামে বায়ুর নাইট্রোজেন নাইট্রিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। এই নাইট্রিক অ্যাসিড বৃষ্টির সঙ্গে ভূপতিত হইয়া মাটিতে মিশ্রিত ক্ষার জাতীয় যৌগের লবণের সঙ্গে বিক্রিয়ায় ক্ষারীয় নাইট্রেট লবণ উৎপন্ন করিয়া মাটিকে নাইট্রেট লবণ দ্বারা সমৃদ্ধ করে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃতদেহের প্রোটিন পচনের ফলেও নাইট্রেট লবণ তৈরী হয় এবং ইহা মাটির সঙ্গে মিশিয়া যায়। [মাটিতে অবস্থিত ব্যাকটেরিয়া উক্ত প্রোটিনের কিছু অংশকে মুক্ত নাইট্রোজেনেও পরিণত করে।]

একদিকে উদ্ভিদ কর্তৃক মাটির নাইট্রেট লবণের আহরণ এবং অন্যদিকে বায়ুর নাইট্রোজেনের নাইট্রেট লবণে রূপান্তর,—নাইট্রোজেনের এরূপ আদান-

নাইট্রোজেন চক্র
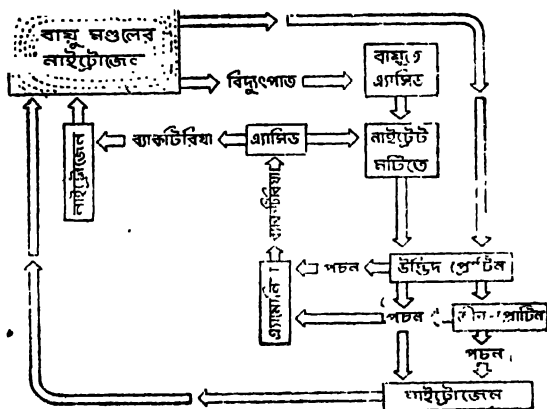
নাইট্রোজেন-চক্র

প্রদানের ফলে নাইট্রোজেনের সামগ্রিক পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে। প্রাকৃতিক নাইট্রোজেনের এরূপ আদান-প্রদানের চক্রকে বলা হয় **নাইট্রোজেন-চক্র** বা **নাইট্রোজেন সাইকল** (Nitrogen cycle)।

(ক) **মাটি কর্তৃক নাইট্রোজেন আহরণ :** মাটি বিভিন্ন উপায়ে বায়ুর নাইট্রোজেন আহরণ করে।

(i) **তড়িৎ-ক্ষরণ :** বায়ুমণ্ডলে প্রায়ই তড়িৎ ক্ষরণ ঘটে। এরূপ তড়িৎ-স্পর্শে বায়ুর নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন প্রথমে নাইট্রিক অক্সাইড (NO) যৌগে পরিণত হয়। ইহা বায়ুর অতিরিক্ত অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়ায় নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড (NO_2) উৎপন্ন করে। বায়ুমণ্ডলের জলীয়

বাষ্পের সঙ্গে বিক্রিয়ায় এই নাইট্রোজেন ডাই-অকসাইড নাইট্রিক অ্যাসিডে পরিণত হয় [$NO_2 + H_2O \rightarrow HNO_3$]। বায়ুমণ্ডলের এই নাইট্রিক অ্যাসিড বৃষ্টির সঙ্গে মাটিতে পড়ে এবং সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি ক্ষারজাতীয় মৌলের যৌগের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটাইয়া মাটির মধ্যে ঐ সকল ক্ষারীয় মৌলের নাইট্রেট লবণ গঠন করে। প্রধানত এরূপ ক্ষারীয় নাইট্রেট লবণই উদ্ভিদ সর্বদা সাররূপে মাটি হইতে দেহবৃদ্ধির জন্য গ্রহণ করে।

(ii) **রাসায়নিক পদ্ধতি :** রাসায়নিক শিল্পাগারে হাইড্রোজেনের সঙ্গে বায়ুর নাইট্রোজেনের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটাইয়া বিপুল পরিমাণে ইযুরিয়া, এবং অ্যামোনিয়াম লবণ নামে কৃত্রিম সার তৈরী করা হয়। এই নাইট্রোজেনের সার খাদ্য-শস্য এবং ফল ইত্যাদি উৎপাদনের জন্য ব্যাপকভাবে বর্তমানে ব্যবহার করা হয়।

(iii) **প্রাকৃতিক নাইট্রিকরণ** (Nitrification) : প্রাণীর মল-মূত্র, উদ্ভিদের পরিত্যক্ত লতা-পাতা এবং প্রাণী ও উদ্ভিদের মৃতদেহের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন যৌগ থাকে। কোন কোন বিশেষ ধরণের ব্যাকটেরিয়া ও ছাতকের সাহায্যে বিভিন্ন পর্যায়ের প্রক্রিয়ার পরিণামে এরূপ জৈব নাইট্রোজেন-যৌগ-লবণে পরিণত হয় এবং মাটির সঙ্গে মিশিয়া যায়।

(iv) **নাইট্রোজেন-বন্ধন** (Nitrogen fixation) : সিম, মটর ইত্যাদি উদ্ভিদের মূলে এক প্রকার ব্যাকটেরিয়া থাকে এবং ইহারা প্রত্যক্ষভাবে বায়ুর মুক্ত নাইট্রোজেন হইতে নাইট্রোজেনের যৌগরূপে অ্যামিনো-অ্যাসিড নামে জৈব যৌগ তৈরী করে। উদ্ভিদ এই অ্যামিনো-অ্যাসিড খাদ্যরূপে গ্রহণ করিয়া নিজেদের দেহে উদ্ভিদ-প্রোটিন তৈরী করে। এরূপ ব্যাকটেরিয়া উদ্ভিদের দেহ হইতে উদ্ভিদ-দেহের কর্বোহাইড্রেড নামে জৈব যৌগ গ্রহণ করে এবং পক্ষান্তরে, উদ্ভিদকে এই অ্যামিনো-অ্যাসিড প্রদান করে।

বায়ুমণ্ডলে তড়িৎ ক্ষরণের ফলে যে নাইট্রিক অ্যাসিড তৈরী হয় এবং রাসায়নিক শিল্পে যে কৃত্রিম সাররূপে নাইট্রোজেনের যৌগ উৎপন্ন হয় তাহাও **নাইট্রোজেন বন্ধনের** অপর দুইটি উদাহরণ।

সুতরাং দেখা যায় যে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন হইতে নাইট্রিক অ্যাসিড সৃষ্টি, কৃত্রিম নাইট্রোজেন-সার উৎপাদন, উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের বর্জনীয় উপাদান হইতে নাইট্রিকরণ পদ্ধতিতে নাইট্রেট লবণ তৈরী এবং কোন কোন

উদ্ভিদের-মূল-সংলগ্ন বিশেষ ব্যাকটেরিয়ার প্রক্রিয়ায় নাইট্রোজেন হইতে প্রত্যক্ষভাবে অ্যামিনো অ্যাসিড গঠন,—মূলত এরূপ চারিটি পদ্ধতিতে উৎপন্ন নাইট্রোজেন যৌগ হইতে উদ্ভিদ প্রাকৃতিক নাইট্রোজেন আহরণ করে।

(খ) **মাটি হইতে নাইট্রোজেন অপসারণ :** মাটি হইতে নাইট্রেট লবণ অপসারিত হয় নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে :

(i) উদ্ভিদ মাটি হইতে প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম সাররূপে মিশ্রিত নাইট্রেট লবণ গ্রহণ করে। উদ্ভিদ কোন কোন ক্ষেত্রে আয়নরূপে (ion) অ্যামোনিয়াম (NH_4) হইতে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে। এই নাইট্রেট লবণ ও অ্যামোনিয়াম আয়ন হইতে উদ্ভিদ দেহ বর্ধন ও দেহ পুষ্টির জন্য নিজের দেহে উদ্ভিজ্জ প্রোটিন গঠন করে।

(ii) কোন কোন ব্যাকটেরিয়া মাটিতে প্রাপ্ত নাইট্রেট লবণকে ভাঙ্গিয়া মুক্ত নাইট্রোজেনে পরিণত করে। ইহা বায়ুর সঙ্গে মিশিয়া যায়।

(iii) মাটির কিছু পরিমাণ নাইট্রেট লবণ জলে দ্রবীভূত হইয়া মাটির নিচে গভীর স্তরে প্রবেশ করে। তাই উদ্ভিদ এরূপ নাইট্রেট লবণ হইতে বঞ্চিত হয়।

এই তিন পদ্ধতিতে মাটিতে সঞ্চিত নাইট্রেট লবণের পরিমাণ সর্বদা হ্রাস পায় তথা অপসারিত হয়।

মূলত এই চার পদ্ধতিতে নাইট্রোজেনের আহরণ এবং তিন পদ্ধতিতে নাইট্রোজেনের অপসারণের অবিচ্ছিন্ন ক্রিয়ার ফলে প্রাকৃতিক নাইট্রোজেনের মোট পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে।

7·4. বায়ুতে দুষ্প্রাপ্য গ্যাসীয় মৌল (Raro gases in air) : বায়ু প্রধানত নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের মৌলদ্বয়ের মিশ্রণ হইলেও, ইহাতে অতি স্বল্প পরিমাণে আরও পাঁচটি গ্যাসীয় মৌল বর্তমান থাকে। ইহাদের নাম হিলিয়াম (He), নিয়ন (Ne), আর্গন (A), ক্রিপটন (Kr) ও জেনন (Xe)। বায়ুতে ইহাদের শতাংশিক আয়তনের পরিমাণ—

হিলিয়াম	নিয়ন	আর্গন	ক্রিপটন	জেনন
0·005	0·0015	0·093	0·0001	0·0001

প্রকৃতিতে ইহারা স্বল্প পরিমাণে বর্তমান আছে বলিয়া ইহাদের 'দুষ্প্রাপ্য গ্যাস' বলা হয়। ইহারা অত্যন্ত নিষ্ক্রিয়, সহজে অন্য কোন মৌলের সহিত ইহাদের কোন বিক্রিয়া ঘটে না। সেইজন্য সর্বদাই পারমাণবিক অবস্থায় ইহাদের পাওয়া যায়। তাই ইহাদের আর এক নাম 'সম্ভ্রান্ত গ্যাস' (noble gases)। ইহাদের নিষ্ক্রিয় গ্যাসও (inert gases) বলা হয়।

তরল বায়ু বিভিন্ন তাপমাত্রায় পাতিত করিয়া এই নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মিশ্রণ পাওয়া যায়। আরও জটিল পদ্ধতিতে এই মিশ্রণ হইতে পাঁচটি মৌলকে আলাদা করা যায়।

হিলিয়াম : হিলিয়ামের প্রধান উৎস মোনাজাইট নামক তেজস্ক্রিয় বালি ও কয়েকটি উষ্ণ প্রস্রবণ। হাইড্রোজেনের পরে ইহা সর্বাপেক্ষা হালকা, অথচ ইহা সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। এজন্য বেলুন ও বায়ুজান পূর্ণ করিতে ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রে নিষ্ক্রিয় পরিবেশ সৃষ্টিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। গ্যাস থার্মোমিটার হিলিয়াম দ্বারা পূর্ণ থাকে। হিলিয়াম দ্বারা সর্বাপেক্ষা নিম্নতাপ সৃষ্টি করা যায়।

নিয়ন : নিম্নচাপে বদ্ধ কাচের নলে নিয়ন ভরিয়া তড়িৎ-প্রবাহ পাঠাইলে উজ্জ্বল লালবর্ণের আলোকে নলটি উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে। তাই বিজ্ঞাপনের আলোকবাতিতে বা নানাপ্রকার সংকেত বাতিতে নিয়নের বহুল ব্যবহার আছে।

আর্গন : আর্গনের প্রধান ব্যবহার ধাতুনিষ্কাশনের সময় সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় পরিবেশ সৃষ্টি করিতে। বৈদ্যুতিক বাতি পূর্ণ করিতেও কখন কখন নাইট্রোজেনের বদলে আর্গন ব্যবহৃত হয়।

ক্রিপটন ও জেনন : এই গ্যাস দুইটি এত কম পরিমাণে বর্তমান এবং বিশুদ্ধ অবস্থায় ইহাদের পাওয়া এত কষ্টসাধ্য যে ইহাদের ব্যবহার খুবই কম। সিনেমা প্রজেকটারের আর্কবাতি পূর্ণ করিতে ইহারা ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্নাবলী

1. তরল বায়ু তৈরী করার পদ্ধতির মূল প্রণালী বর্ণনা কর।
2. কার্বন-চক্রের সংজ্ঞা লেখ।
3. সমুদ্র-জল কিভাবে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ ও বর্জন করে।
4. বায়ুর নাইট্রোজেন হইতে কিভাবে সার তৈরী হয়?
5. নাইট্রোজেন-চক্র বলিতে কি বোঝ? ইহার উপকারিতা কি?
6. কোন্‌টি ঠিক '√' এরূপ চিহ্নদ্বারা নির্দেশ কর :
   (i) বায়ু তরল করার সময়ে আগে তরল হয় অক্সিজেন / নাইট্রোজেন।
   (ii) উদ্ভিদ রাত্রিবেলা / দিনের বেলা অক্সিজেন গ্রহণ করে।
   (iii) সমুদ্র-জল কার্বন ডাই-অক্সাইড বর্জন করে বায়ুর চাপ কমিলে / বৃদ্ধি পাইলে।
   (iv) নাইট্রোজেনের পরিমাণ পচন ও দহনের ফলে হ্রাস পায় / বৃদ্ধি পায়।
   (v) জৈব পদার্থ দহনের ক্ষেত্রে কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয় / গৃহীত হয়।
7. দুষ্প্রাপ্য গ্যাসকে নিষ্ক্রিয় মৌল বলা হয় কেন? দুষ্প্রাপ্য গ্যাসের ব্যবহার সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

তিনটি প্রধান মৌল ঃ অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন

8-1. মৌলিক পদার্থ অক্সিজেন (Oxygen) ঃ

অক্সিজেনের প্রতীক চিহ্ন—O ; ইহার ফর্মুলা—O_2।

মৌলিক পদার্থ-সমূহের মধ্যে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় অক্সিজেন। ভূ-পৃষ্ঠের বস্তুরাশির প্রায় শতকরা পঞ্চাশভাগ অক্সিজেন। বায়ুর আয়তনের পাঁচভাগের মধ্যে একভাগ অক্সিজেন। ওজন হিসাবে জল প্রায় শতকরা 89 ভাগ অক্সিজেন দ্বারা গঠিত।

প্রস্তুতি (Preparation) ঃ পটাসিয়াম ক্লোরেট ($KClO_3$) উচ্চ তাপে (610°C) উত্তপ্ত করিলে অক্সিজেন উৎপন্ন হয়। কিন্তু রসায়নাগারে ইহার সঙ্গে ম্যাঙ্গানীজ ডাই-অক্সাইড (MnO_2) মিশ্রিত করিয়া উত্তপ্ত করিলে নিম্নতর তাপমাত্রায় (200°C—240°C) পটাসিয়াম ক্লোরেট বিশ্লিষ্ট হইয়া অক্সিজেন উৎপন্ন করে। যথা ঃ $2KClO_3 + [MnO_2] = 3O_2\uparrow + 2KCl + [MnO_2]$

যে পদার্থ নিজে কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ না করিয়া সেই বিক্রিয়া ঘটাইতে অথবা বিক্রিয়াটি দ্রুততর বা মন্থর করিতে সাহায্য করে সেই পদার্থটিকে বলা হয় **অণুঘটক** (catalyst) এবং বিক্রিয়াকে বলা হয় **অণুঘটন** (catalysis)। অক্সিজেন প্রস্তুতির বিক্রিয়া ম্যাঙ্গানীজ ডাই-অক্সাইডের সাহায্যে ত্বরান্বিত হয়, কিন্তু ম্যাঙ্গানীজ ডাই-অক্সাইড বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে না। এই বিক্রিয়ায় ম্যাঙ্গানীজ ডাই-অক্সাইডকে বলা হয় অণুঘ

রসায়নাগারে প্রস্তুতি (Laboratory preparation) ঃ ওজনে চার ভাগ পরিমাণ পটাসিয়াম ক্লোরেটের সঙ্গে এক ভাগ পরিমাণ ম্যাঙ্গানীজ ডাই-অক্সাইড উত্তমরূপে মিশাইয়া মিশ্রণ দ্বারা একটি শক্ত ও মোটা পরীক্ষা-নলের অর্ধেকটা ভরা হয়। পরীক্ষা-নলের মুখটি একটি ছিদ্র করা কর্ক দ্বারা আটকানো থাকে এবং ছিদ্র পথে একটি দীর্ঘ নির্গম-নল ফিট করা হয়। নির্গম-নলের অপর প্রান্তের বাঁকানো উর্ধ্বমুখী মুখটি একটি জল-ভরা দ্রোণীতে ডুবাইয়া রাখা হয়।

পটাসিয়াম ক্লোরেট ও ম্যাঙ্গানীজ ডাই-অক্সাইডের মিশ্রণ-ভরা পরীক্ষা-নলটি লোহার আংটা (ক্ল্যাম্প) দিয়া সংবদ্ধ এবং সামনের দিকে একটু নিচু করিয়া ধারকের সাহায্যে ফিট করা হয়। এখন মিশ্রণ-ভরা পরীক্ষা-নলটি বুন্‌সেন দীপ দ্বারা প্রথমে সামনের দিক হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত নলটি সমভাবে ধীরে ধীরে উত্তপ্ত করিলে অক্‌সিজেন গ্যাস নির্গত হইতে শুরু করে। কিছুটা গ্যাস প্রথমে দ্রোণীর জলের ভিতর দিয়া বুদ্বুদের আকারে বাহির করিয়া দেওয়া হয়। পরীক্ষা-নলের ফাঁকা অংশে যে বায়ু থাকে প্রথমে তাহা এই ভাবে বাহির হইয়া যায়। পরে গ্যাস প্রবল বেগে নির্গত হইতে আরম্ভ করিলে বুনসেন দীপ মাঝে মাঝে সরাইয়া তাপ নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়।
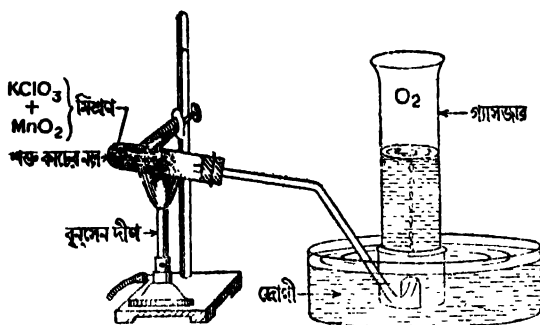
অক্‌সিজেন প্রস্তুতির যান্ত্রিক কাঠামো

এরূপ প্রাথমিক পর্যায়ের পরে একটি গ্যাসজারে জল ভরিয়া নির্গম-নলের মুখে উপুড় করিয়া দ্রোণীর মধ্যে রাখা হয়। পরীক্ষা-নল হইতে অক্‌সিজেন গ্যাস নির্গম-নলের মাধ্যমে বুদ্বুদের আকারে বাহির হইয়া গ্যাসজারের জল সরাইয়া জারটি পূর্ণ করে। গ্যাস-ভরা জারের মুখটি একটি ঢাকনি অর্থাৎ কাচের চাকতি দিয়া বন্ধ করিয়া অক্‌সিজেন গ্যাস সংগ্রহ করা হয়।

সতর্কতা : (i) পটাসিয়াম ক্লোরেটের সঙ্গে মিশ্রণের জন্য অঙ্গার-মুক্ত বিশুদ্ধ ম্যাঙ্গানীজ-ডাই-অক্সাইড ব্যবহার করা প্রয়োজন,—অন্যথায় উত্তাপের প্রভাবে অঙ্গার বিস্ফোরণ ঘটায়। (ii) পরীক্ষা-নলের মিশ্রণ প্রথমে মুখের দিক হইতে আরম্ভ করিয়া ধীরে ধীরে উত্তপ্ত করিতে হয়,—পিছনের দিকে আগে উত্তপ্ত করিলে গ্যাসের চাপ-পুষ্ট মিশ্রণ পরীক্ষা-নল বিদীর্ণ করিতে পারে, (iii) নির্গম-নলের মুখটি দ্রোণীর জলের উপরে রাখা প্রয়োজন,—অন্যথায়,

নির্গম-নলের মাধ্যমে পরীক্ষা-নলে জল ঢুকিয়া বিস্ফোরণ ঘটাইতে পারে। (iii) গ্যাস নির্গম সহজ করার জন্য বিকারক-মিশ্রণ পূর্ণ পরীক্ষা-নলটি কিছুটা নিম্নাভিমুখী করিয়া ফিট করা হয়,।

অক্সিজেনের ধর্ম (Properties of oxygen) :

ভৌত ধর্ম : (i) অক্সিজেন বর্ণহীন, গন্ধহীন এবং স্বাদহীন একটি স্বচ্ছ গ্যাস। (ii) অক্সিজেন বায়ুর চেয়ে অল্প ভারী। (iii) অক্সিজেন জলে স্বল্প পরিমাণে দ্রবীভূত হয়। মৎস্য ইত্যাদি জলচর প্রাণী জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন হইতে কানকোর সাহায্যে শ্বাস লইয়া বাঁচিয়া থাকে।

রাসায়নিক ধর্ম : (i) **প্রাণবায়ু :** অক্সিজেন দেহে তাপ সরবরাহ এবং রক্ত পরিশ্রুত করে। তাই অক্সিজেনে শ্বাস লইয়া প্রাণীর পক্ষে বাঁচিয়া থাকা সম্ভব হয়।

(ii) **অগ্নি প্রজ্বলনের কারণ :** আগুন জ্বলিবার মূল কারণ অক্সিজেন। কোন পদার্থ যখন জ্বলিয়া উঠে তখন তাহার রাসায়নিক অর্থ দাঁড়ায় এই যে, এই পদার্থটির সঙ্গে অক্সিজেনের সংযোগ ঘটিতেছে এবং সেই সংযোগের বিক্রিয়াই আগুনরূপে প্রকাশ পাইতেছে। অক্সিজেন নিজে জ্বলে না কিন্তু অন্য পদার্থকে জ্বলিতে সাহায্য করে। এজন্য অক্সিজেনকে বলা হয় **দহন-সহায়ক** পদার্থ (supporter of combustion)।

(ii) **অতি সক্রিয়তা :** অক্সিজেন একটি অতি সক্রিয় মৌলিক পদার্থ। প্ল্যাটিনাম ও সোনা ছাড়া সমুদয় ধাতু এবং অ-ধাতু ও অনেক গ্যাসীয় অ-ধাতুজাতীয় মৌল অক্সিজেনের মধ্যে উত্তপ্ত করিলে অক্সাইড যৌগ গঠিত হয়।

(iv) **বিশেষ বিক্রিয়ায়** অক্সিজেন **ওজোন** নামে ঘনতর অক্সিজেন গঠন করে। ওজোন অণু তিনটি অক্সিজেন পরমাণু দ্বারা গঠিত (O_3)। ওজোন তীব্র জারক দ্রব্য ও কীটনাশক পদার্থ।

(v) **অক্সাইড যৌগ :** অক্সিজেন ধাতু ও অ-ধাতুজাতীয় মৌলিক পদার্থের সঙ্গে প্রধানত তিন শ্রেণীর অক্সাইড গঠন করে। যথা :

(ক) **অ্যাসিডিক বা অম্লিক অক্সাইড :** অক্সিজেন অ-ধাতুজাতীয় মৌলিক পদার্থ কার্বন (C), সালফার (S), নাইট্রোজেনের (N_2) সঙ্গে যুক্ত হইয়া অক্সাইড যৌগ গঠন করে। উহারা জলের সঙ্গে বিক্রিয়ায় অ্যাসিড গঠন করে। যথা :

$C+O_2=CO_2$; $CO_2+H_2O=H_2CO_3$ (কার্বনিক অ্যাসিড)

$S+O_2=SO_2$; $SO_2+H_2O=H_2SO_3$ (সালফিউরাস অ্যাসিড)
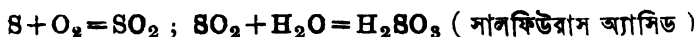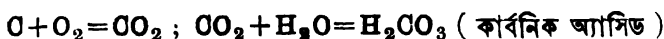
(খ) **ক্ষারীয় অক্সাইড :** সোডিয়াম (Na), পটাসিয়াম (K), ক্যালসিয়াম (Ca) ইত্যাদি ক্ষারীয় ধাতুগুলি অক্সিজেনের সঙ্গে যে অক্সাইড গঠন করে তাহা জলের সঙ্গে বিক্রিয়ায় **ক্ষার** গঠন করে। যথা :

$4Na+O_2=2Na_2O$; $Na_2O+H_2O=2NaOH$ (কষ্টিক সোডা ক্ষার)

$4K+O_2+2K_2O$; $K_2O+H_2O=2KOH$ (কষ্টিক পটাস ক্ষার)

$2Ca+O_2=2CaO$; $CaO+H_2O=Ca(OH)_2$ (চুন জলের ক্ষার)
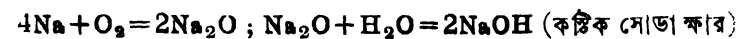
মার্কারি (Hg), লোহা (Fe), কপার (Cu), জিংক (Zn) ইত্যাদি ধাতু তাপের প্রভাবে ক্ষারীয় অক্সাইড গঠন করে। যথা :

$2Hg+O_2=2HgO$; $2Fe+O_2=2FeO$ (মরিচা)
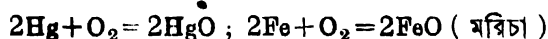
(গ) **প্রশম বা নিরপেক্ষ অক্সাইড :** কোন কোন অ-ধাতব অক্সাইডের জলীয় মিশ্রণের মধ্যে অ্যাসিড বা ক্ষারের কোন ধর্মই প্রকাশ পায় না বলিয়া ইহাদের প্রশম অক্সাইড বলা হয়। ইহারা জলের মধ্যে দ্রবীভূত হয় না বা জলের সঙ্গে ইহাদের কোন বিক্রিয়া ঘটে না। কার্বন মনক্সাইড (CO), নাইট্রিক অক্সাইড (NO) ইত্যাদি এরূপ প্রশম অকসাইড। জলও (H_2O) একটি প্রশম অক্সাইড।

8-2. মৌলিক পদার্থ হাইড্রোজেন (Hydrogen)

হাইড্রোজেনের প্রতীক চিহ্ন —H ; ইহার ফর্মুলা—H_2

ভূপৃষ্ঠে অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন মৌলত্রয় বিপুল পরিমাণে পাওয়া যায় এবং ইহারা সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় যৌগ গঠন করে। প্রতি জৈব যৌগে হাইড্রোজেন বর্তমান।

হাইড্রোজেন সামান্য পরিমাণে অন্যান্য গ্যাসের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় পেট্রোলিয়ামের খনিতে বা আগ্নেয়গিরির গ্যাসের মধ্যে পাওয়া যায়। জল হাইড্রোজেনের প্রধান ভাণ্ডার। গাছ, পাতা, জীব-জন্তু, পেট্রোলিয়াম অর্থাৎ যে-কোন জৈব পদার্থের মধ্যে যৌগ অবস্থায় কার্বনের সঙ্গে হাইড্রোজেন পাওয়া যায়। অ্যাসিড ও ক্ষারের মধ্যেও হাইড্রোজেন পাওয়া যায়।

রসায়নাগারে প্রস্তুতি (Laboratory preparation) : দুইটি মুখ-বিশিষ্ট একটি উলফ্ বোতলের (woulf's bottle) মধ্যে কিছু **অশুদ্ধ দস্তা বা জিংক**

দানা রাখিয়া ইহার এক তৃতীয়াংশ জলে ভর্তি করা হয়। এই বোতলের একটি মুখে সছিদ্র কর্কের সাহায্যে একটি দীর্ঘ-নল ফানেল (thistle funnel)
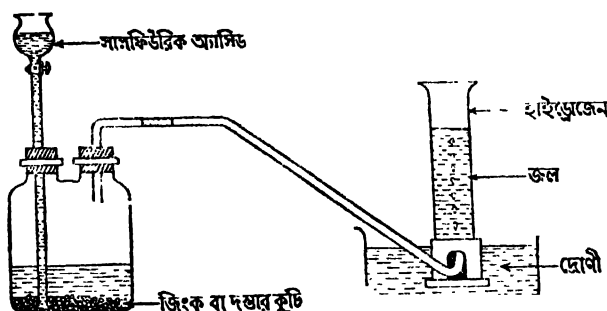
হাইড্রোজেন প্রস্তুতির যন্ত্রসজ্জার চিত্র

এবং অপর মুখেও কর্কের ভিতর দিয়া একটি বাঁকানো নির্গম-নল ফিট করা হয়। দীর্ঘ-নল ফানেলের নিম্নমুখ জলের মধ্যে ডুবাইয়া রাখা হয় কিন্তু নির্গম নলের মুখটি থাকে জলের অনেকটা উপরে। এইভাবে যন্ত্র সাজাইবার পরে নির্গম-নলে মুখ লাগাইয়া ফুঁ দিলে দীর্ঘ-নলের মধ্যে জল উঠিবে। আঙ্গুলের চাপ দিয়া নির্গম-নলের মুখ বন্ধ করিলে দীর্ঘ-নলের অ্যাসিডের স্তর যদি স্থির থাকে তবে বোঝা যাইবে যে উলফ্ বোতল বায়ু নিরুদ্ধ ভাবে (air tight) ফিট করা হইয়াছে।
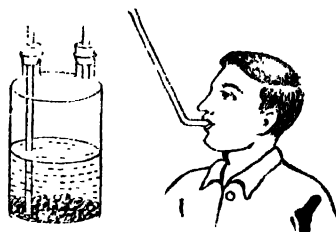
বায়ু-নিরুদ্ধ পরীক্ষা

এখন দীর্ঘ-নলের মাধ্যমে উলফ্ বোতলে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড ঢালিলে জিংকের সঙ্গে অ্যাসিডের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হইবে। কিছুক্ষণ পর্যন্ত নির্গম-নল দিয়া এই গ্যাস নির্গত হইলে বোতলের বায়ুও হাইড্রোজেনের সঙ্গে বাহির হইয়া যায়।

সতর্কতা : হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মিশ্রণ বিস্ফোরক বলিয়া উলফ্ বোতল বায়ু-নিরুদ্ধ করিয়া বোতলের বায়ু বাহির করিয়া দিয়া তাহার পরে হাইড্রোজেন সংগ্রহ করা হয়। বিশুদ্ধ জিংকের উপরে জিংক সালফেটের

আস্তরণ পড়িয়া বিক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায় বলিয়া অশুদ্ধ জিংক দানা ব্যবহার করা হয়।

এইভাবে সতর্কতার ব্যবস্থা করিয়া একটি জল ভরা দ্রোণীতে (trough) নির্গম-নলটি স্থাপন করিয়া ইহার মুখে একটি জল-ভরা গ্যাস জার উপুড় করিয়া বসানো হয় এবং জারের জল সরাইয়া পরীক্ষার জন্য কয়েকটি গ্যাসজার হাইড্রোজেন গ্যাসে ভর্তি করা হয়। কাচের চাকতি দিয়া জারের মুখ ঢাকিয়া গ্যাস-ভর্তি জার পরীক্ষার জন্য উপুড় করিয়া রাখা হয়।

হাইড্রোজেনের ধর্ম (**Properties of hydrogen**) :

ভৌত ধর্ম : (i) হাইড্রোজেন একটি বর্ণহীন, গন্ধহীন ও স্বাদহীন স্বচ্ছ গ্যাস। (ii) হাইড্রোজেন সবচেয়ে হালকা পদার্থ। বায়ু হাইড্রোজেন অপেক্ষা 14·4 গুণ ভারী। বায়ুর চেয়ে হাল্কা বলিয়া হাইড্রোজেন গ্যাস-ভরা বেলুন বায়ুতে ভাসিতে পারে।

রাসায়নিক ধর্ম : (i) হাইড্রোজেন একটি দাহ্য গ্যাস বলিয়া আগুনের সংস্পর্শে এই গ্যাস নীলাভ শিখায় জ্বলিয়া ওঠে। একটি হাইড্রোজেন গ্যাস ভরা জারে একটি জ্বলন্ত শলাকা ঢুকাইলে এই গ্যাস জ্বলিয়া ওঠে কিন্তু শলাকাটি নিভিয়া যায়; কারণ, হাইড্রোজেন দহনের সহায়ক নয়, নিজেই একটি দাহ্য পদার্থ (combustible)।

হাইড্রোজেন দহনে জল উৎপাদন
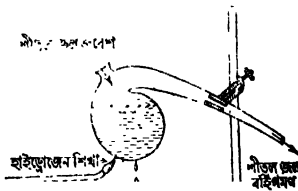
(ii) হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের গ্যাস-মিশ্রণ অত্যন্ত বিস্ফোরক। একটি সোডার বোতলে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস ভরিয়া বোতলটি তোয়ালে জড়াইয়া বোতলের মুখ খুলিয়া একটি জ্বলন্ত শলাকা ধরিলে গ্যাস মিশ্রণের মধ্যে প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে এবং বিক্রিয়ায় জল প্রস্তুত হয়।

(iii) বায়ুর মধ্যে হাইড্রোজেন দহনে বায়ুর অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়ায় জল উৎপন্ন হয়। হাইড্রোজেনের জ্বলন্ত শিখা একটি জল-ভরা পোরসেলিন পাত্রের তলায় ধরিলে ফোঁটা ফোঁটা জল উৎপাদন হয়। (চিত্র দেখ)

(iv) হাইড্রোজেন বিজারক পদার্থ বলিয়া ধাতুর অক্সাইড বিজারিত হইয়া ধাতু নিষ্কাশিত হয়। যথা : $CuO+H_2=Cu+H_2O$

(v) হাইড্রোজেন ও ক্লোরিনের মিশ্রণে আলোকপাত করিলে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড বা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। যথা :

$$H_2+Cl_2=2HCl.$$
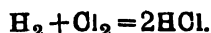
(vi) প্যালাডিয়াম, লোহা ইত্যাদি ধাতু বহু পরিমাণে হাইড্রোজেন গ্যাস শোষণ করিতে পারে। গ্যাস শোষণ করিবার পর ঐ ধাতুকে উত্তপ্ত করিলে পুনরায় গ্যাস নির্গত হয়। ধাতু কর্তৃক এইপ্রকার হাইড্রোজেন গ্যাস শোষণ করার গুণকে **অন্তর্ধৃতি** (occlusion) বলা হয়।

(vii) লৌহচুর অণুঘটকের উপস্থিতিতে, উচ্চ চাপে ও তাপে তিনভাগ আয়তনের হাইড্রোজেনের সহিত একভাগ আয়তনের নাইট্রোজেনের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অ্যামোনিয়া (NH_3) উৎপন্ন হয়। যথা : $3H_2+N_2=2NH_3$

(viii) গলিত (fused) সালফারের উপর হাইড্রোজেন গ্যাস প্রবাহিত করিলে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়। যথা : $H_2+S=H_2S$

জায়মান হাইড্রোজেন : (Nascent hydrogen) সদ্যজাত হাইড্রোজেনকে বলা হয় জায়মান হাইড্রোজেন। এরূপ হাইড্রোজেন পারমাণবিক (H) অবস্থায় থাকে বলিয়া অত্যন্ত সক্রিয়। এই সদ্যজাত জায়মান হাইড্রোজেন পরে আণবিক হাইড্রোজেনে পরিণত হয় বলিয়া আণবিক হাইড্রোজেনের মধ্যে সেরূপ সক্রিয়তা থাকে না [$H+H\rightarrow H_2$]।

উদাহরণ : একটি পরীক্ষা নলে বেগুনী বর্ণের পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেট লইয়া ইহার মধ্যে হাইড্রোজেন গ্যাস চালাইলে দ্রবণের বর্ণ অক্ষুণ্ণ থাকিবে কিন্তু এই পরীক্ষা-নলে কয়েকটি জিংক দানা ফেলিয়া কিছু লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড মিশানো হইলে জায়মান (সদ্যজাত) হাইড্রোজেন প্রস্তুত হয় এবং ইহার সঙ্গে বিক্রিয়ায় দ্রবণের বেগুনী রঙ বর্ণহীন হইয়া যায়।

8.3. মৌলিক পদার্থ নাইট্রোজেন (Nitrogen)

নাইট্রোজেনের প্রতীক চিহ্ন—N, ইহার ফর্মুলা—N_2

মুক্ত অবস্থায় পাঁচ ভাগ আয়তনের বায়ুর মধ্যে চার ভাগ আয়তন নাইট্রোজেন বর্তমান। যৌগ অবস্থায় জৈব ও উদ্ভিদের প্রোটিন নাইট্রোজেনের প্রধান ভাণ্ডার।

প্রস্তুতি : কোন পাত্রে আবদ্ধ বায়ুর মধ্যে পারদ, অঙ্গার, গন্ধক বা ফসফরাস পোড়াইলে বায়ুর অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়ায় অক্সাইড গঠনের ফলে পাত্রে অবশিষ্ট থাকে চার ভাগ আয়তনের নাইট্রোজেন।

পরীক্ষা : একটি জল-ভরা বড় বাটিতে একটি ছোট পোরসেলিনের বাটি ভাসমান অবস্থায় রাখ। এই বাটির মধ্যে এক টুকরা জলন্ত ফসফরাস অথবা গন্ধক (sulphur) রাখ। এখন এই পোরসেলিন বাটিটি একটি মুখ-বন্ধ বেল-জার দিয়া ঢাকিয়া দাও। এই বেল-জারটির আয়তন পাঁচটি সম-আয়তনের অংশে চিহ্নিত করিয়া রাখা হয়। ফসফরাস অথবা গন্ধক বেল-জারে আবদ্ধ অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটাইয়া ফসফরাস পেণ্টক্সাইড অথবা সালফার ডাই-অক্সাইডের ধোঁয়া সৃষ্টি করিয়া জারটি পূর্ণ করিবে। বেল-জারে আবদ্ধ অক্সিজেন নিঃশেষ হইলে বিক্রিয়া বন্ধ হইবে। এরূপ অবস্থায় দেখা যাইবে যে বেল জারের এক-আয়তন অংশ বাটির জলে পূর্ণ হইয়াছে। বেল-জারের আয়তনের বাকী চার অংশে অবশিষ্ট রহিয়াছে নাইট্রোজেন।
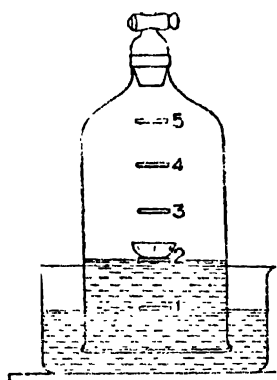
বায়ুতে নাইট্রোজেন পরিমাণের পরীক্ষা

এই পরীক্ষায় বায়ুর নাইট্রোজেন পৃথক করার সঙ্গে ইহাও প্রমাণিত হয় যে, বায়ু একভাগ অক্সিজেন এবং চারভাগ নাইট্রোজেনের মিশ্র পদার্থরূপে গঠিত। বিক্রিয়া :

$$4P + (5O_2 + 20N_2) = 2P_2O_5 + 20N_2$$

ফসফরাস + বায়ু = ফসফরাস পেণ্টক্সাইড + নাইট্রোজেন

$$S + (O_2 + N_2) = SO_2 + N_2$$

সালফার + বায়ু = সালফার ডাই-অক্সাইড + নাইট্রোজেন
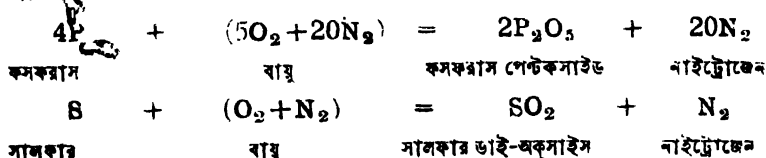
রসায়নাগারে প্রস্তুতি (Laboratory preparation) : অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট (NH_4NO_2) উত্তপ্ত করিলে বিশুদ্ধ নাইট্রোজেন উৎপন্ন হয়। এই বিক্রিয়া অত্যন্ত দ্রুতগতিতে হয় বলিয়া বিস্ফোরণ ঘটিতে পারে। তাই এই প্রক্রিয়ার পরিবর্তে সম-পরিমাণ (ওজনে) অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ও সোডিয়াম নাইট্রাইটের ঘন দ্রবণের মিশ্রণ উত্তপ্ত করিয়া নাইট্রোজেন উৎপন্ন করা হয়।

এইরূপ মিশ্রণ একটি কাচের ফ্লাস্কে ধীরে ধীরে উত্তপ্ত করা হয়। দুইটি সচ্ছিদ্র কর্কের মাধ্যমে এই ফ্লাস্কে ফিট করা থাকে একটি দীর্ঘ-নল ফানেল ও একটি বাঁকানো নির্গম-নল। নির্গম নলের অপর মুখটি গ্যাস-দ্রোণীর জলের নীচে ডুবাইয়া রাখা হয়। ফ্লাস্কের বায়ু নির্গত হওয়ার পরে জল-ভরা দ্রোণীতে নির্গম নলের মুখে স্থাপিত উপুড়-করা জল-পূর্ণ গ্যাসজারের জল সরাইয়া নাইট্রোজেন সংগ্রহ করা হয়।

নাইট্রোজেন পদ্ধতির যান্ত্রিক কাঠামো
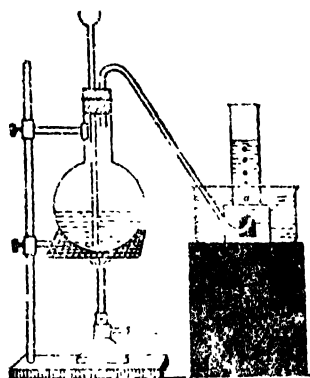
ফ্লাস্কের মধ্যে গ্যাসের চাপ বৃদ্ধি পাইলে দীর্ঘ-নল ফানেলের ভিতর দিয়া ফ্লাস্কের তরল ফানেলের মধ্যে উঠিতে আরম্ভ করিলে তৎক্ষণাৎ বুনসেন দীপ সরাইয়া নওয়া হয়। বিস্ফোরণ নিবারণের জন্য এইভাবে বিক্রিয়ার তাপ নিয়ন্ত্রণ করা হয়. গ্যাসের চাপ কমিয়া গেলে ফ্লাস্ক আবার ধীরে ধীরে উত্তপ্ত করা হয়। বিক্রিয়া ঘটে দুই পর্যায়ে ; যথা।

(i) NH_4Cl	+ $NaNO_2$	= NH_4NO_2	+ $NaCl$
অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড	সোডিয়াম নাইট্রাইট	অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট	সোডিয়াম ক্লোরাইড

(ii) NH_4NO_2 (তাপের প্রভাব) $= N_2\uparrow + 2H_2O$
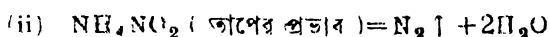
নাইট্রোজেনের ধর্ম (Properties of nitrogen) :

ভৌত ধর্ম : নাইট্রোজেন বায়ুর চেয়ে অল্প হাল্কা। ইহা একটি স্বাদহীন, বর্ণহীন ও গন্ধহীন গ্যাসীয় পদার্থ। ইহা জলে অতি সামান্য দ্রবণীয়।

রাসায়নিক ধর্ম : (i) নাইট্রোজেন গ্যাস নিজেও জ্বলে না, বা অন্য পদার্থকে জ্বলিতেও সাহায্য করে না বলিয়া দাহ্য বা দাহক পদার্থ নয়।

(ii) নাইট্রোজেন খুব নিষ্ক্রিয় পদার্থ বলিয়া সহজে অন্য মৌলের সঙ্গে যোগ গঠনে অক্ষম।

(iii) বায়ুর মধ্যে বা অক্‌সিজেন ও নাইট্রোজেনের মিশ্রণের মধ্যে তড়িৎ প্রবাহিত করিলে নাইট্রোজেন ও অক্‌সিজেন যুক্ত হইয়া অক্সাইড যৌগ গঠন করে। যথা : $N_2 + O_2 = 2NO$ (নাইট্রিক অক্সাইড)। অতিরিক্ত

বায়ুর সঙ্গে বিক্রিয়ায় ইহা নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড (NO_2) গঠন করে। $2NO+O_2=2NO_2$।

(iv) লৌহচূর্ণ বা অন্য ধাতুরূপে অনুঘটকের উপস্থিতিতে 200 বায়ুমণ্ডলের চাপ ও 550°C তাপমাত্রার প্রভাবে নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনের যৌগ অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হয়। যথা: $N_2+3H_2=2NH_3$ (অ্যামোনিয়া)

(v) নাইট্রোজেন ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং অ্যালুমিনিয়ামের সঙ্গে যৌগ গঠন করে। যথা:

$3Ca+N_2=Ca_3N_2$ (ক্যালসিয়াম নাইট্রাইড)

$3Mg+N_2=Mg_3N_2$ (ম্যাগনেসিয়াম নাইট্রাইড)

$2Al+N_2=2AlN$ (অ্যালুমিনিয়াম নাইট্রাইড)
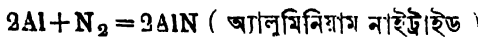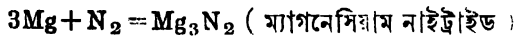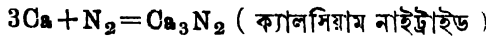
প্রশ্নাবলী

1. পটাসিয়াম ক্লোরেট উত্তপ্ত করিলে কি বিক্রিয়া ঘটে? কিভাবে ইহা ব্যবহার করিয়া রসায়নাগারে অক্সিজেন প্রস্তুত করা হয়?
2. অক্সিজেন প্রস্তুত করার জন্য কি কি সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন? অক্সিজেন উৎপাদনে ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অকসাইডের ভূমিকা কি?
3. রসায়নাগারে হাইড্রোজেন প্রস্তুতির পদ্ধতি বর্ণনা কর। এরূপ পরীক্ষার জন্য কি কি সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন?
4. রসায়নাগারে নাইট্রোজেন উৎপাদনের পদ্ধতি বর্ণনা কর।
5. পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ কর যে, বায়ু একভাগ আয়তনের অক্সিজেন এবং চার ভাগ আয়তনের নাইট্রোজেন দ্বারা গঠিত।
6. জায়মান হাইড্রোজেন কাহাকে বলে? অন্তর্ধৃতি বলিতে কি বোঝ? পটাসিয়াম ক্লোরেট এবং অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট উত্তপ্ত করিলে কি হয়?
7. হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন কোনটি দাহ্য, দাহক বা নিষ্ক্রিয় পদার্থ। [illegible] বিশ্লেষণ করিয়া ইহাদের প্রকৃতি বুঝাও।
8. অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেনের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম বর্ণনা কর। ইহারা জারক না বিজারক পদার্থ।
9. কোন্‌টি সঠিক (√) চিহ্ন দ্বারা নির্দেশ কর:—
   (i) হাইড্রোজেন দাহ্য / দাহক / নিষ্ক্রিয় পদার্থ।
   (ii) অকসিজেন জারক / বিজারক পদার্থ।
   (iii) জায়মান হাইড্রোজেন নিষ্ক্রিয় / সক্রিয় এবং ইহার গঠন পারমাণবিক / আণবিক।
   (iv) তপ্ত পারদের সঙ্গে অক্সিজেন / হাইড্রোজেন / নাইট্রোজেন বিক্রিয়া ঘটায়।

নবম পরিচ্ছেদ

কয়েকটি অজৈব যৌগ

অ্যামোনিয়া (Ammonia)—NH_3.

মল, মূত্রাগার বা ড্রেন হইতে উত্থিত যে ঝাঁঝাল গ্যাসের গন্ধে চোখে জল আসে সেই গ্যাসটি নাইট্রোজেনের যৌগ অ্যামোনিয়া।

অ্যামোনিয়ার বিভিন্ন যৌগে অ্যামোনিয়ার যে যৌগ মূলক পাওয়া যায় তাহাকে বলা হয় **অ্যামোনিয়াম** (NH_4^+); এই অ্যামোনিয়াম-মূলক স্বাধীন অবস্থায় সংগ্রহ করা যায় না এবং ইহা ধাতুধর্মী মূলক ও ইহার যোজ্যতা এক।

প্রস্তুতি (Preparation): (i) অ্যামোনিয়ার যে-কোন লবণের সঙ্গে যে-কোন ক্ষার বা অ্যালকালির মিশ্রণ উত্তপ্ত করিলে অ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপন্ন করা যায়। যথা :

NH_4NO_3	+	$NaOH$	=	NH_3	+	$NaNO_3$	+	H_2O
অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট		কষ্টিক সোডা		অ্যামোনিয়া		সোডিয়াম নাইট্রেট		জল
$(NH_4)_2SO_4$	+	$2NaOH$	=	$2NH_3$	+	Na_2SO_4	+	$2H_2O$
অ্যামোনিয়াম সালফেট		কষ্টিক সোডা		অ্যামোনিয়া		সোডিয়াম সালফেট		জল
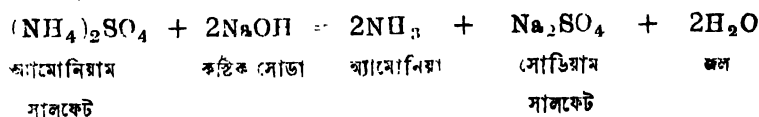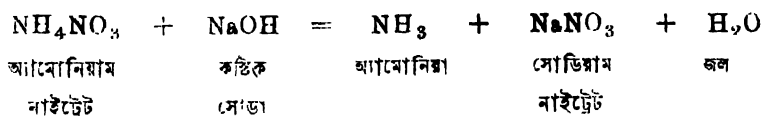
রসায়নাগারে প্রস্তুতি (Laboratory preparation): এক ভাগ অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের (NH_4Cl) সঙ্গে প্রায় তিন ভাগ পরিমাণ শুষ্ক কলিচুন [$Ca(OH)_2$] বা পোড়া চুন (CaO) মিশ্রিত করিয়া মিশ্রণকে একটি কাচের ফ্লাস্কে রাখিয়া উত্তপ্ত করা হয়। এই ফ্লাস্কের সঙ্গে ফিট করা থাকে একটি বাঁকানো নির্গম নল। এই নির্গম-নলটির অপর মুখ একটি পোড়া চুনপূর্ণ (CaO) গ্যাসস্তম্ভের নীচে যুক্ত করা হয় এবং এই গ্যাসস্তম্ভের উপরিভাগে লাগানো থাকে অপর একটি নির্গম-নল। ফ্লাস্কটি তার জালের উপর রাখিয়া বুনসেন দীপের সাহায্যে উত্তপ্ত করা হয়। বিক্রিয়ায় আর্দ্র
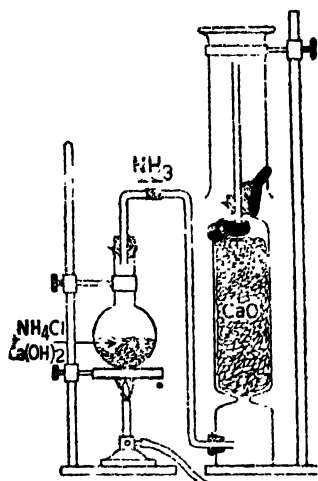
অ্যামোনিয়া-প্রস্তুতি

অ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং ইহা নির্গম-নল দিয়া গ্যাসস্তম্ভে প্রবেশ

করিলে পোড়া-চুন অ্যামোনিয়াতে মিশ্রিত জলীয় বাষ্প শোষণ করিয়া শুষ্ক অ্যামোনিয়া উৎপন্ন করে। এই শুষ্ক অ্যামোনিয়া গ্যাসস্তম্ভের উপরের নির্গম-নল দিয়া বাহির হইয়া যায় এবং ইহার মুখে উপুড়-করা গ্যাস জারের বায়ু নীচের দিকে সরাইয়া অ্যামোনিয়া সংগ্রহ করা হয়। বিক্রিয়া :

$2NH_4Cl$	+	$Ca(OH)_2$	=	$CaCl_2$	+	$2H_2O$	+	$2NH_3\uparrow$
অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড		কলিচুন		ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড		জল		অ্যামোনিয়া
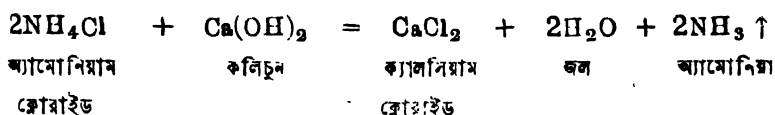
জলে এবং অ্যাসিডে অ্যামোনিয়ার দ্রবণীয়তা খুব বেশি। কিন্তু অ্যামোনিয়া বায়ুর চেয়ে হালকা বলিয়া গ্যাস জারের ভিতরের বায়ু নিম্নাভিমুখে সরাইয়া অ্যামোনিয়া গ্যাস-জারে সংগ্রহ করা হয়।

অ্যামোনিয়ার ভৌত ধর্ম : (i) অ্যামোনিয়া তীব্র ঝাঁঝাল-গন্ধের একটি বর্ণহীন গ্যাস; (ii) ইহা জলে খুব বেশী পরিমাণে দ্রবণীয়; (iii) ইহা বায়ু অপেক্ষা অনেক হাল্‌কা এবং ইহাকে সহজেই তরলে পরিণত করা যায়। (iv) যে 0·88 আপেক্ষিক গুরুত্বে সম্পৃক্ত অ্যামোনিয়া দ্রবণে 35% অ্যামোনিয়া থাকে তাহাকে **লাইকার অ্যামোনিয়া** (Liquor ammonia) বলা হয়। এই অ্যামোনিয়ার বোতল বরফে ঠাণ্ডা করিয়া খুলিতে হয়,—অন্যথায় বিস্ফোরণ ঘটিতে পারে।

অ্যামোনিয়ার রাসায়নিক ধর্ম : (i) অ্যামোনিয়া দাহ্য বা দাহক পদার্থ নয়। কিন্তু অক্সিজেনের মধ্যে জ্বালাইয়া দিলে অ্যামোনিয়ার প্রজ্বলিত দহনে নাইট্রোজেন ও জল তৈরী হয়। যথা :

$$4NH_3+3O_2=2N_2+6H_2O$$

(ii) স্বাভাবিক অবস্থায় অ্যামোনিয়া একটি স্থায়ী যৌগ হইলেও 1000°C তাপমাত্রায় ইহা বিয়োজিত হইয়া নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনে পরিণত হয়। যথা : $2NH_3=N_2+3H_2$
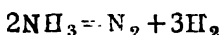
(iii) অ্যামোনিয়া ক্ষারধর্মী বলিয়া জলীয় দ্রবণে মৃদু ক্ষাররূপে অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড (NH_4OH) গঠন করে। যথা :

$$NH_3+H_2O=NH_4OH$$
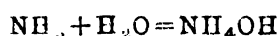
(iv) হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়ায় অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড (NH_4Cl), নাইট্রিক অ্যাসিডের সঙ্গে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট (NH_4NH_3),

সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে অ্যামোনিয়াম সালফেট [$(NH_4)_2SO_4$], ইত্যাদি লবণ উৎপন্ন হয়। যথা: $NH_3+HCl=NH_4Cl$;

$NH_3+HNO_3=NH_4NO_3$; $2NH_3+H_2SO_4=(NH_4)_2SO_4$
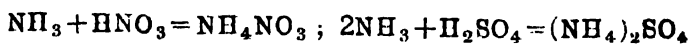
(v) উত্তপ্ত কপার অক্সাইডকে (CuO) অ্যামোনিয়া কপার ধাতুরূপে বিজারিত করে। যথা: $2NH_3+CuO=N_2+3H_2O+Cu$

কার্বন ডাই-অক্সাইড (Carbon-dioxide)—CO_2

কার্বনের যে কোন জৈব যৌগ বা কাঠ, কয়লা, তেল, পেট্রল, মোম, খড়, পাটকাঠি, শুষ্ক উদ্ভিদ, কাগজ ইত্যাদি পোড়াইলে কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়। কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুর একটি উপাদান।

প্রস্তুতি (Preparation): ক্যালসিয়াম কার্বনেট (চুনা পাথর, মার্বল, চক) এবং লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের (HCl) বিক্রিয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়। বিক্রিয়া:

$CaCO_3+2HCl=CO_2\uparrow+H_2O+CaCl_2$
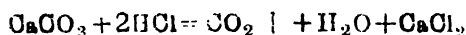
রসায়নাগারে প্রস্তুতি (Laboratory preparation): একটি উল্ফ বোতলের দুইটি মুখে যথাক্রমে একটি দীর্ঘ-নল ফানেল ও একটি বাঁকানো নির্গম-নল ফিট করা হয়। বোতলের মধ্যে কিছু পরিমাণ জল ও মার্বল কুচি রাখা হয়। দীর্ঘ-নল ফানেলের তলার মুখটি যেন বোতলের জলের মধ্যে ডুবানো থাকে। বোতলে জল ও মার্বল পাথরের কুচির মধ্যে দীর্ঘ-নল ফানেলের মাধ্যমে লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ঢালিলে অ্যাসিডের সঙ্গে মার্বলের সংস্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্বুদ সহকারে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস নির্গত হয়।

কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রস্তুতি

কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ু হইতে ভারী; তাই গ্যাসজারের বায়ু ঊর্ধ্বমুখে সরাইয়া এই গ্যাস সংগ্রহ করা হয়।
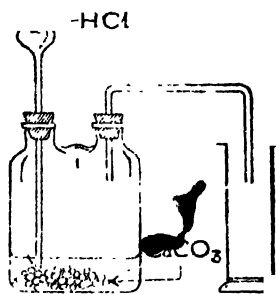
ভৌত ধর্ম: (i) কার্বন ডাই-অক্সাইড একটি বর্ণহীন গ্যাস কিন্তু এই গ্যাসের মধ্যে একটি হাল্কা অম্ল স্বাদ পাওয়া যায়। (ii) ইহা বিষাক্ত না হইলেও কার্বন ডাই-অক্সাইডে শ্বাস গ্রহণ করা যায় না, ইহাতে আগুনও

জ্বালানো যায় না। (iii) ইহা বায়ুর চেয়ে দেড়গুণ ভারী। (iv) আগুন নিভাইবার জন্য এই গ্যাসকে বিভিন্ন কারখানা, অফিস ভবন, সিনেমা হল ইত্যাদি স্থানে অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্রের সাহায্যে ব্যবহার করা হয়।

রাসায়নিক ধর্ম : (i) কার্বন ডাই-অক্সাইড দাহ্য বা দাহক পদার্থ নয়। (ii) কার্বন ডাই-অক্সাইড অ্যাসিডধর্মী অ-ধাতুর অক্সাইড বলিয়া ইহার জলীয় দ্রবণ একটি মৃদু অস্থায়ী অ্যাসিড [$CO_2+H_2O=H_2CO_3$]। এই অ্যাসিড স্বতন্ত্রভাবে সংগ্রহ করা যায় না। কিন্তু এই অ্যাসিডের লবণ স্থায়ী ($CaCO_3$, $MgCO_3$, $FeCO_3$ ইত্যাদি)। (iii) ক্ষারের সঙ্গে বিক্রিয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইড ক্ষারীয় কার্বনেট লবণ গঠন করে। যথা : $2NaOH+CO_2=Na_2CO_3+H_2O$। কার্বন ডাই-অক্সাইড চুন-জলে [$Ca(OH)_2$] ক্যালসিয়াম কার্বনেট ($CaCO_3$) গঠন করিয়া দ্রবণ ঘোলা করিয়া দেয়। যথা : $Ca(OH)_2+CO_2=CaCO_3+H_2O$; ইহার মধ্যে অতিরিক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রবাহিত করিলে জলে দ্রবণীয় ক্যালসিয়াম বাই-কার্বনেট [$Ca(HCO_3)_2$] গঠন করিয়া দ্রবণ পুনরায় স্বচ্ছ হইয়া যায়।

সোডা ওয়াটার এবং **লিমোনেড** (Soda water and lemonade) : সোডা ওয়াটার কার্বন ডাই-অক্সাইড জলীয় দ্রবণ। বোতলের মুখবন্ধ অবস্থায় বর্ধিত চাপের ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড বেশী পরিমাণে জলে দ্রবীভূত থাকে। কিন্তু বোতলের মুখ খুলিয়া দিলে চাপ হ্রাস পায় এবং তার ফলে জলীয় দ্রবণ হইতে ভুর ভুর করিয়া গ্যাস নির্গত হইতে আরম্ভ করে। লিমোনেডে কার্বন ডাই-অক্সাইড ছাড়াও চিনি মিশ্রিত থাকে।

$$[CO_2+\text{জল}] \xrightarrow{\text{চাপ}} \text{সোডা ওয়াটার}$$

$$CO_2+\text{জল}+\text{চিনি}] \xrightarrow{\text{চাপ}} \text{লিমোনেড}$$
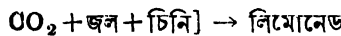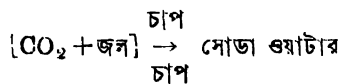
শুষ্ক বরফ (Dry ice) : শূন্য ডিগ্রী (0°C) তাপাংকে এবং চল্লিশ বায়ুচাপে (40 atmospheric pressure) কার্বন ডাই-অক্সাইডকে তরল করা যায়। লোহার সিলিণ্ডারে এই তরল গ্যাস ভরিয়া রাখা হয়। সিলিণ্ডারের মুখে একটি ফ্লানেলের থলে বা ব্যাগ বাঁধিয়া দিয়া ব্যাগের মধ্যে যদি তরল কার্বন ডাই-অক্সাইডকে বাষ্পায়িত করিতে দেওয়া যায় তবে তরল কার্বন ডাই-অক্সাইড তুষারের আকারে থলের মধ্যে জমিয়া ওঠে। এরূপ জমানো কার্বন ডাই-অক্সাইডকে বলা হয় **শুষ্ক বরফ**।

সালফার ডাই অক্সাইড (Sulphur dioxide)—SO_2

গন্ধক বা ধূপকাঠি পোড়াইলে যে ধোঁয়া উৎপন্ন হয় তাহা সালফার ডাই-অক্সাইড। বিক্রিয়া ঘটে এইভাবে : $S+O_2$ (বায়ু)$=SO_2\uparrow$

রসায়নাগারে প্রস্তুতি : একটি গোলাকার ফ্লাস্কের মুখে একটি দীর্ঘ-নল ফানেল ও একটি বাঁকানো নির্গম-নল ফিট করা হয়। দীর্ঘ-নলটির নীচের মুখ যেন ফ্লাস্কের তলদেশ পর্যন্ত প্রবেশ করে। ফ্লাস্কের মধ্যে কিছুটা তামার কুচি (Cu) রাখিয়া দীর্ঘ নল ফানেলের মাধ্যমে তামার কুচির সঙ্গে ঘন সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4) মিশ্রিত করিয়া ফ্লাস্কটি বুনসেন দীপে উত্তপ্ত করিলে সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হইতে আরম্ভ করে। গ্যাস উৎপাদন শুরু হইলে বুনসেন দীপ সরাইয়া লওয়া হয়। নির্গম-নলের ভিতর দিয়া যে সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাস নির্গত হয় তাহা বায়ুর চেয়ে ভারী বলিয়া গ্যাস-জারের বায়ু ঊর্ধ্বমুখে সরাইয়া এই গ্যাস সংগ্রহ করা হয়।
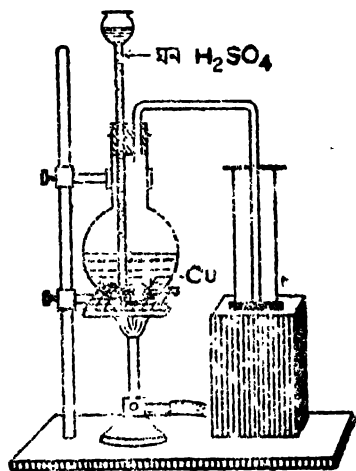
সালফার ডাই-অক্সাইড প্রস্তুতি

$Cu+2H_2SO_4$ (ঘন)$=CuSO_4$ (কপার সালফেট)$+2H_2O+SO_2\uparrow$
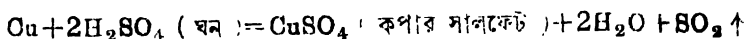
ভৌত ধর্ম : সালফার ডাই-অক্সাইড (i) পোড়া-গন্ধকের গন্ধযুক্ত শ্বাসরোধক একটি বিষাক্ত গ্যাস ; (ii) বায়ুর চেয়ে দ্বিগুণ ভারী ; (iii) হিমমিশ্রণে (বরফ+লবণ) ঠাণ্ডা করিলে ($-10^{\circ}C$ তাপমাত্রায়) এই গ্যাস তরলে পরিণত হয়। (iv) ইহা জলে দ্রবণীয়।

রাসায়নিক ধর্ম : (i) সালফার ডাই-অক্সাইড দাহক বা দহনশীল নয় ; (ii) জলীয় দ্রবণে মৃদু সালফিউরাস অ্যাসিড (H_2SO_3) উৎপন্ন করে এবং ইহা নীল লিটমাসকে লাল বর্ণে রূপান্তরিত করে। জলীয় দ্রবণ উত্তপ্ত করিলে আবার সালফার ডাই-অক্সাইড নির্গত হয়।

(iii) ক্ষারের সঙ্গে বিক্রিয়ায় এই অ্যাসিডধর্মী গ্যাস অতিরিক্ত কষ্টিক সোডার সঙ্গে সোডিয়াম সালফাইট (Na_2SO_3) লবণ গঠন করে। যথা :

$$SO_2 + 2NaOH = Na_2SO_3 + H_2O$$
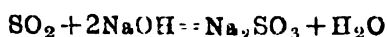
(iv) সালফার ডাই-অক্সাইড একটি প্রবল বিজারক পদার্থ বলিয়া বেগুনী বর্ণের পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেট ($KMnO_4$) দ্রবণকে বর্ণহীন, কমলা রঙের পটাসিয়াম ডাই-ক্রোমেট ($K_2Cr_2O_7$) দ্রবণকে সবুজ বর্ণ এবং হলুদ বর্ণের ফেরিক ক্লোরাইড দ্রবণকে বর্ণহীন করিয়া দেয়।

(v) সালফার ডাই-অক্সাইডের বিরঞ্জন ক্ষমতার (bleaching power) জন্য ইহা জৈব রঙকে বিজারিত করিতে পারে। সেজন্য উল, সিল্ক, খড় ইত্যাদি বিরঞ্জনের জন্য এই গ্যাস ব্যবহার করা হয়। সালফার ডাই-অক্সাইডের বিরঞ্জন ক্রিয়ার জন্য জলের সংস্পর্শ প্রয়োজন। সালফার ডাই-অক্সাইড ও জলের বিক্রিয়ায় যে সদ্যজাত জায়মান হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয় তাহার জন্যই বিরঞ্জন ক্রিয়া সম্ভব হয়। যথা :

$$SO_2 + 2H_2O = (2H) \text{(জায়মান হাইড্রোজেন)} + H_2SO_4$$
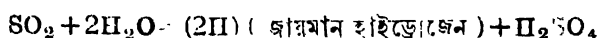
উদাহরণ : একটি সালফার ডাই অক্সাইড পূর্ণ গ্যাস জারের মধ্যে কয়েকটি শুষ্ক রঙিন ফুল রাখিলে ফুলের বর্ণ অপরিবর্তিত থাকিবে। গ্যাস ভরা জারে এখন কয়েকটি জলসিক্ত ফুল রাখিলে কিছুক্ষণের মধ্যে ফুলের বর্ণ ফিকা হইয়া যাইবে।

(vi) সালফার ডাই-অক্সাইড হালকা সবুজ বর্ণের ফেরাস ক্লোরাইডকে ($FeCl_2$) হলুদ বর্ণের ফেরিক ক্লোরাইডরূপে জারিত করে। যথা :

$$4FeCl_2 + 4HCl \text{(ঘন)} + SO_2 = 4FeCl_3 + 2H_2O + S$$
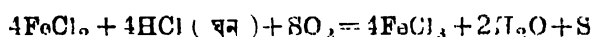
(vii) সালফার ডাই-অক্সাইড 450°C তাপমাত্রায় প্লাটিনাম জাতীয় অনুঘটকের সংস্পর্শে অক্সিজেনের সংযোগে সালফার ট্রাই-অক্সাইডে (SO_3) পরিণত হয়। এই সালফার ট্রাই-অক্সাইড জলে দ্রবীভূত করিলে ইহা সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে। যথা :

$$2SO_2 + O_2 + \text{(অনুঘটক)} = 2SO_3 \; ; \; 2SO_3 + 2H_2O = 2H_2SO_4$$
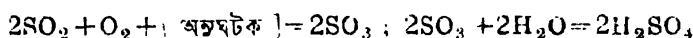
সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন – ফর্মুলা : H_2S

পচা ডিমের দুর্গন্ধময় গ্যাসীয় পদার্থটির নাম সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন বা **হাইড্রোজেন সালফাইড**। প্রস্রবণের জলেও এই গ্যাসটি মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়। ইহা বস্তুতপক্ষে হাইড্রোজেন ও সালফারের যৌগ (H_2S)। এই দুর্গন্ধময় গ্যাসটি গবেষণাগারের পরীক্ষার জন্য একটি অতি মূল্যবান বিকারক পদার্থ।

প্রস্তুতি : (i) ফুটন্ত বা উত্তপ্ত সালফার ও ঝামা-পাথর ভরা পোরসেলিন নলে হাইড্রোজেন চালাইলে প্রত্যক্ষ সংযোগে ধীরে ধীরে হাইড্রোজেন সালফাইড বা সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরী হয়। যথা : $H_2+S=H_2S\uparrow$
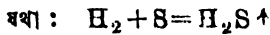
রসায়নাগারে প্রস্তুতি (Laboratory preparation) **:** দীর্ঘ-নল ফানেল ও নির্গম নল ফিট করা একটি উল্‌ফ বোতল লও। বাঁকানো নির্গম-নলের মুখটি একটি ঊর্ধ্ব মুখ গ্যাসজারের মধ্যে রাখ। উল্‌ফ বোতলের মধ্যে কিছু ফেরাস সালফাইড দানা (FeS) লও এবং ইহার মধ্যে দীর্ঘ নলের মাধ্যমে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড ঢাল। লক্ষ্য রাখ যে দীর্ঘ-নলটি যেন বোতলের প্রায় তলদেশ পর্যন্ত প্রবেশ করে। অ্যাসিড ও ফেরাস সালফাইডের বিক্রিয়ায় সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়।
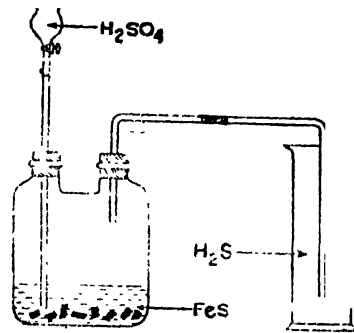
হাইড্রোজেন সালফাইড প্রস্তুতি

বায়ু অপেক্ষা ভারী বলিয়া গ্যাসজারের বায়ু ঊর্ধ্বমুখে সরাইয়া সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন গ্যাস সংগ্রহ করা হয়। গ্যাসের দুর্গন্ধেই ইহার অস্তিত্ব-প্রমাণিত হয়। বিক্রিয়া :

$FeS+H_2SO_4=H_2S+FeSO_4$ (ফেরাস সালফেট)
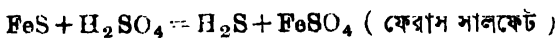
লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডও এই গ্যাস প্রস্তুত করার জন্য ব্যবহার করা যায়। যথা : $FeS+2HCl=H_2S\uparrow+FeCl_2$

ভৌত ধর্ম : সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন বা হাইড্রোজেন সালফাইড—(i) পচা ডিমের দুর্গন্ধযুক্ত একটি বর্ণহীন গ্যাস (ii) ঠাণ্ডা জলে দ্রবণীয় কিন্তু গরম জলে অদ্রবণীয়, (iii) বায়ুর চেয়ে ভারী, (iv) চাপ ও শৈত্যে ইহাকে তরল করা যায় এবং (v) ইহা একটি বিষাক্ত গ্যাস বলিয়া এই গ্যাসের মধ্যে অতিরিক্ত শ্বাস গ্রহণে মাথা ধরে, এমন কি শ্বাসগ্রহণকারী অজ্ঞান হইয়া পড়িতে পারে।

রাসায়নিক ধর্ম : হাইড্রোজেনের ন্যায় অগ্নিস্পর্শে ইহা নীলাভ শিখায়

জ্বলিয়া উঠে। পর্যাপ্ত বায়ুতে এরূপ প্রজ্বলনে জল ও সালফার ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয় এবং অপর্যাপ্ত বায়ুতে জলীয় বাষ্প ও সালফার উৎপন্ন হয়। যথা :

$$2H_2S+3O_2=2H_2O+2SO_2\uparrow\ ;\ 2H_2S+O_2=2H_2O+2S$$
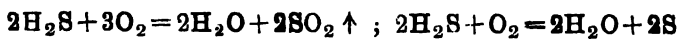
(ii) হাইড্রোজেন সালফাইড একটি বিজারক পদার্থ বলিয়া ইহা হলুদ বর্ণের অ্যাসিড মিশ্রিত ফেরিক ক্লোরাইড দ্রবণকে বর্ণহীন ফেরাস ক্লোরাইড দ্রবণে এবং অ্যাসিড মিশ্রিত পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ($KMnO_4$) দ্রবণের বেগুনী বর্ণকে বর্ণহীন করিয়া দেয় এবং অনুরূপভাবে অ্যাসিড মিশ্রিত পটাসিয়াম ডাইক্রোমেটের ($K_2Cr_2O_7$) কমলা রঙের দ্রবণ সবুজ বর্ণে রূপান্তরিত করে।

(iii) হাইড্রোজেন সালফাইডের জলীয় দ্রবণ মৃদু অ্যাসিড-ধর্মী বলিয়া ইহার সংস্পর্শে নীল লিটমাস লালবর্ণে রূপান্তরিত হয়।

(iv) কার্বনিক অ্যাসিড একটি মৃদু অ্যাসিড কিন্তু ইহার কার্বনেট যৌগগুলি স্থায়ী। সেইরূপ মৃদু হাইড্রোজেন সালফাইড অ্যাসিডও ধাতুর স্থায়ী সালফাইড যৌগ গঠন করে। ইহাদের ধাতব সালফাইড যৌগগুলির বিশিষ্ট বর্ণ দেখা যায়। ক্ষারীয় ধাতু সোডিয়াম ও পটাসিয়ামের সালফাইড যৌগ, জল, অ্যাসিড ও ক্ষারে দ্রবণীয়। লোহা ও জিংক সালফাইড ক্ষারে অদ্রবণীয় কিন্তু অ্যাসিডে দ্রবণীয়। তামা ও সীসার সালফাইড লঘু আসিডে অদ্রবণীয়। সালফাইড যৌগের ফর্মুলা : Na_2S, K_2S (সাদা), FeS, CuS, PbS (কালো), ZnS (সাদা) ইত্যাদি।

$$H_2S+2NaOH=Na_2S\ (\text{সাদা})+2H_2O$$

$$H_2S+CuSO_4=CuS\ (\text{কালো})+H_2SO_4$$
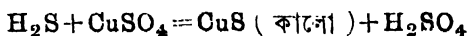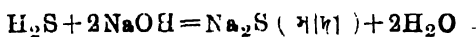
দ্রবণীয়তা এবং ইহাদের বর্ণ লক্ষ্য করিয়া ধাতব মৌল সনাক্ত করার জন্য সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন অতি মূল্যবান বিকারকরূপে রসায়নাগারে পরীক্ষার ... ব্যবহৃত হয়।

কিপ-যন্ত্রে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস প্রস্তুতি (Preparation of H_2S in Kipp's apparatus) : রসায়নাগারের পরীক্ষায় হাইড্রোজেন সালফাইডকে একটি অতি মূল্যবান বিকারকরূপে ব্যবহার করা হয়। সেইহেতু প্রয়োজন অনুযায়ী সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবহার করার সুযোগ রাখার জন্য কিপ-যন্ত্রের সাহায্যে হাইড্রোজেন সালফাইড তৈরী করা হয়।

কিপ-যন্ত্র একটি ত্রি-গোলক কাচের যন্ত্র। দ্বিতীয় ও তৃতীয় গোলকটি পরস্পরে সংযুক্ত কিন্তু প্রথম গোলকটি স্বতন্ত্র এবং গোলকটির তলদেশে একটি

দীর্ঘ-নল বর্তমান। দ্বিতীয় গোলকে একটি ছিপি ও নির্গম-নল ফিট করা থাকে। এই গোলকে ভরা হয় ফেরাস সালফাইড।

দীর্ঘ-নল ফানেলযুক্ত প্রথম গোলকের ভিতর দিয়া তৃতীয় গোলকে লঘু সালফিউরিক বা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ঢালিতে হয়। এই অ্যাসিড তৃতীয় গোলক পূর্ণ করিয়া দ্বিতীয় গোলকে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে অ্যাসিডের সঙ্গে ফেরাস সালফাইডের সংযোগের ফলে বিক্রিয়া ঘটে এবং হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়।
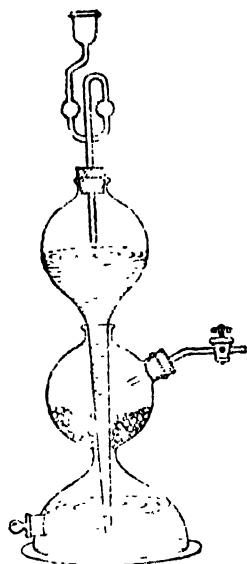
কিপ-যন্ত্র

সদ্য উৎপন্ন এই গ্যাস ছিপির ভিতর দিয়া নির্গম-নলের মাধ্যমে নির্গত হইয়া যায় এবং এই গ্যাস রসায়নাগারের পরীক্ষাদির কাজে ব্যবহার করা হয়। মধ্যম গোলকের ছিপি বন্ধ করিলে গ্যাস নির্গমন বন্ধ হওয়ার ফলে সঞ্চিত গ্যাস দ্বিতীয় গোলকের অ্যাসিডের উপরে চাপ দেয়। ফলে অ্যাসিড তৃতীয় গোলকে নামিয়া যায় এবং দীর্ঘ-নলের ভিতর দিয়া উপরে উঠিয়া ইহা প্রথম গোলকেও আংশিকভাবে সঞ্চিত হয়। দ্বিতীয় গোলকে ফেরাস সালফাইড ও অ্যাসিডের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য গ্যাস উৎপাদনও সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হইয়া যায়।

আবার মধ্যম গোলকের ছিপি খুলিয়া দিলে সঞ্চিত গ্যাস নির্গত হইয়া যায় এবং গ্যাসের চাপ হ্রাস হওয়ার ফলে তৃতীয় গোলক হইতে অ্যাসিড মধ্যম গোলকে উঠিয়া ফেরাস সালফাইডের সঙ্গে পুনঃ সংযোগ স্থাপন করে এবং পুনরায় গ্যাস উৎপাদন বিক্রিয়া শুরু হয়।

এইভাবে কিপ-যন্ত্রে মধ্যম গোলকের ছিপি খুলিয়া প্রয়োজনে গ্যাস প্রস্তুত করা যায় এবং অপ্রয়োজনে ছিপি বন্ধ করিয়া গ্যাস উৎপাদন বন্ধ করা যায়।

[রসায়নাগারের ব্যবহারের জন্য কিপ-যন্ত্রে হাইড্রোজেন গ্যাস ও কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসও প্রস্তুত করা যায়।]

প্রশ্নাবলী

1. চিত্রসহ রসায়নাগারে অ্যামোনিয়া প্রস্তুতির বিবরণ ও বিক্রিয়া বর্ণনা কর
2. অ্যামোনিয়া জল অপসারিত করিয়া সংগ্রহ করা যায় না কেন ?
3. অ্যামোনিয়ার ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম বিবৃত কর।
4. কি প্রকারে রসায়নাগারে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস প্রস্তুত করা হয় ?
5. কার্বন ডাই-অক্সাইডের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম সম্বন্ধে যাহা জান লেখ।
6. কিভাবে সালফার ডাই অক্সাইড প্রস্তুত করিবে ? বিক্রিয়া লেখ।
7. সালফার ডাই-অক্সাইডের বিরঞ্জন ক্ষমতার কারণ উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
8. রসায়নাগারে সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন কি প্রকারে তৈরী করা যায় তাহা বিবৃত কর।
9. হাইড্রোজেন সালফাইডের অ্যাসিড ধর্ম বর্ণনা কর।
10. কিপ-যন্ত্রে কেন হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস তৈরী করা হয় ?
11. সংক্ষেপে কিপ-যন্ত্রের বিবরণ দাও।
12. **নিম্নলিখিত বিষয়মুখী প্রশ্নগুলির উত্তর লিখ :**

    (i) অ্যামোনিয়া গ্যাস কি অ্যাসিডধর্মী না ক্ষারধর্মী ?

    (ii) ছোটখাট অগ্নিকাণ্ড নিভাইতে কোন্ গ্যাস ব্যবহৃত হয় এবং কি প্রকারে আগুন নিভানো যায় ?

    (iii) হাইড্রোজেন সালফাইড যে অ্যাসিডধর্মী তাহা কি প্রকারে প্রমাণ করা যায় ?

    (iv) চুন-জলে কার্বন ডাই অক্সাইড প্রবাহিত করিলে কি কি পরিবর্তন ঘটে এবং কেন ঘটে ?

    (v) সালফার ডাই-অক্সাইড জারক না বিজারক দ্রব্য ?

    (vi) ক্ষারের সঙ্গে কার্বন-ডাই-অকসাইড ও সালফার ডাই-অক্সাইড কি বিক্রিয়া ঘটায় ?

    (vii) অ্যামোনিয়া, কার্বন ডাই-অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড ও হাইড্রোজেন সালফাইড় গ্যাসের মধ্যে জ্বলন্ত পাটকাঠি ঢুকাইলে কি হইবে ?

    (viii) সোডাওয়াটার, লিমনেড ও শুষ্ক বরফ কি ?